

এসো তাকওয়া অর্জন করি

১ম খণ্ড

মুফতী মনসুরুল হক

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

“Islami Jindegi” এ্যাপ ইন্সটল করুন

ভূমিকা

হযরত আদম আ.

হযরত নূহ আ.

হযরত হুদ আ.

হযরত ইবরাহীম আ.

হযরত লূত আ.

হযরত সালেহ আ.

হযরত ইউসুফ আ.

হযরত শূআইব আ.

হযরত মূসা আ.

www.darsemansoor.com



www.islamijindegi.com



ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা‘আলার এবং তাসবীহ পাঠ করছি তাঁর, যিনি আমাদেরকে ঈমানের মতো মূল্যবান দৌলত দান করেছেন। দুরূদ ও সালাম পাঠ করছি তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি এই পরম দৌলত রাসুল ‘আলামীনের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিহায় মুমিন বান্দাদেরকে আল্লাহর কাছে সরল পথের তাউফীক প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আহলে ইলমের কাছে এ কথা অজানা নয় যে, “সরল পথ” বলতে এখানে নির্দিষ্ট কোন আমল উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো নবী, রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের আমল ও কর্মপন্থা।

সুতরাং সরলপথ প্রাপ্ত হতে হলে আমাদের করণীয় হচ্ছে, আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং আখেরী নবী কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত পূর্ববর্তী আশ্বিয়া আ. এর আদর্শ সহ সাহাবায়ে কিরাম, সিদ্দীকীন ও সালাহীনের পথ ও পন্থা অনুসরণ করা। সেই সাথে নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম ও তাদের উম্মতের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জন করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করছেন, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ “নিশ্চয়ই তাদের ঘটনাবলীতে রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা”। সূরা ইউসুফ; আয়াত:১১১।

বিষয়টি অনুধাবনের জন্য আমরা যদি কুরআনে কারীমের দিকে লক্ষ করি, তাহলে দেখব, নিছক কোন কিসসা কাহিনীর কিতাব না হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী অনেক নবী রাসূল আলাইহিমুস সালাম এবং তাঁদের উম্মতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে সেসব আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালাম কত নিষ্ঠা ও পরিপূর্ণতার সাথে আসমানী বাণী স্বীয় উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন! সেই সাথে আলোচনা করা

হয়েছে সেসব ভাগ্যবান মানুষের কথা, যারা নবীর ডাকে সাড়া দিয়ে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে দুনিয়া আখেরাতের কামিয়াবী অর্জন করেছেন।

আরেকটি লক্ষ করার মতো বিষয় হলো, শুধু নেককারদের পথ বাতলে দিয়েই কুরআনে কারীম ক্ষান্ত থাকেনি। বরং যারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ তা‘আলাকে অস্বীকার করেছে, আখেরাতের নির্ধারিত আযাবের সাথে সাথে দুনিয়াতেই যে তারা বিভিন্ন প্রকার লোমহর্ষক আযাব, গযব ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে; সে বর্ণনাও কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী রয়েছে।

তবে এসব ঘটনাবলীর পরিপূর্ণ বিবরণ কুরআনে নেই। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে সৎকর্মশীলদের পুরস্কার প্রাপ্তি ও অসৎকর্মীদের অশুভ পরিণতির মূল ঘটনাগুলোর অংশ বিশেষ পেশ করা হয়েছে। পরিপূর্ণ ঘটনা জানতে হলে হাদীস তাফসীর ও তারিখের কিতাবাদীর শরণাপন্ন হতে হয়।

কিন্তু হাদীস তাফসীর ও তারিখের কোন কোন গ্রন্থে এসব বিষয়ে বিভিন্ন ভিত্তিহীন বর্ণনা ও ইসরাঈলী রেওয়াতে পাওয়া যায়। মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের নিকট যেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। তাই কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের অবস্থা ও পাপীদের উপর নেমে আসা শাস্তির ঘটনাবলী তাফসীর ও হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদীর আলোকে সবার সামনে পেশ করা ছিলো সময়ের দাবী।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা‘আলার অশেষ মেহেরবানীতে দীর্ঘদিন যাবৎ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী থেকে এসকল ঘটনা একত্র করে প্রত্যেক ঘটনার সাথে শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনা সহ “মাসিক আদর্শ নারীতে” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছিলো। সেই লেখাগুলোই এখন বাংলা কিতাব আকারে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে।

এসব ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, আল্লাহর অবাধ্যতা এবং ফলশ্রুতিতে শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার মূল কারণ ছিলো “তাকওয়াহীনতা ও খোদাভীতির অনুপস্থিতি”। সুতরাং এসব ঘটনা থেকে আমাদের অর্জন করার মূল বিষয় হলো, তাকওয়া ও খোদাভীতি। সে বিবেচনা থেকেই এ কিতাবের নাম রাখা হয়েছে “এসো, তাকওয়া অর্জন করি”।

দু’খণ্ডে প্রকাশিত এ কিতাবের প্রথম খণ্ডে পাঠক হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের পূর্বের নবীগণের বর্ণনা পাবেন। দ্বিতীয় খণ্ডের শুরু দিকে পাবেন যাকারিয়া আলাইহিস সালামের যুগের বর্ণনা। শেষ অংশে থাকবে সাইয়িদুনা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের বিবরণ।

সর্বোপরি পাঠকবৃন্দের কাছে নিবেদন, কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আশা করি আমাদের জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ শুধরে নেয়া হবে।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে মিনতি, তিনি যেন আমাদের এ মেহনতটুকু কবুল করে নেন এবং আস্থিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালামের এসকল ঘটনাবলী পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির দিকগুলো বুঝার এবং অন্তরে তাকওয়া তথা খোদাভীতি অর্জনের তাউফীক দান করেন! সেই সাথে এ কিতাবকে আখেরাতে আমাদের নাজাতের উসিলা বানান। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মনসূরুল হক,

বিশিষ্ট খলীফা, হযরতওয়ালা শাহ আবরারুল হক রহ.

প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস,

জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (রাহমানিয়া মাদরাসা), ঢাকা।

নায়েবে আমীর,

মজলিসে দা‘ওয়াতুল হক, বাংলাদেশ।



প্রথম মানব
হযরত আদম 'আলাইহিস সালাম
এর সৃষ্টিবৃত্তান্ত
মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com



সূচীপত্র

আদম আ. এর সৃষ্টি

আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাগণের অভিমত

ফেরেশতার উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব

আদম ‘আলাইহিস সালামকে সিঁজদার নির্দেশ এবং ইবলীসের অবাধ্যতা

হাওয়া ‘আলাইহিস সালামের সৃষ্টির বর্ণনা

আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালামের তাওবা

আদম-হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালামের তাওবা কবুল হয়েছে

আলোচিত ঘটনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আলোচিত বর্ণনা থেকে শিক্ষা

باسمہ تعالیٰ

আদম আ. এর সৃষ্টি

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبٍ مَسْنُونٍ ۝ وَالْجَبَّارِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَبٍ مَّسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝

অর্থঃ নিশ্চয় আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত শুকনো ঠনঠনা মাটি থেকে এবং এর আগে জিন সৃষ্টি করেছি গরম আগুন থেকে। সুরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি গন্ধযুক্ত কাঁদার শুকনো ঠনঠনা মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি। অতঃপর যখন আমি তাকে ঠিকঠাকমতো গঠন করলাম এবং তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করে দিলাম, তখন ফেরেশতাগণ তার প্রতি সিজদাবনত হলো। তখন ফেরেশতাগণ সকলেই একত্রে সিজদা করলো; কিন্তু ইবলীস ছাড়া, সে সিজদাকারীদের দলে शामिल থেকে অস্বীকার করলো। (সূরা হিজর, আয়াত: ২৬-৩১)

আল্লাহ তা‘আলা হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তার খামির প্রস্তুত হওয়ার আগেই আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদের জানালেন, মাটি দিয়ে এক মাখলুক পয়দা করবেন, যার নাম হবে “বাসার” (মানুষ) এবং সে মাখলুক পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার সম্মান লাভ করবে।



এ প্রসঙ্গে আল্লামা বাগাবী রহ. বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা‘আলা প্রথমে আসমান-যমিন, ফেরেশতা ও জিনদের সৃষ্টি করেন। আর ফেরেশতাদের আসমানে এবং জিনদের যমিনে বসবাস করার নির্দেশ দেন। তখন জিনরা এক লম্বা সময় ধরে পৃথিবীতে বসবাস করে।

এরপর তাদের মধ্যে আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে, হিংসা-বিদ্বেষ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। তারা পরস্পরে মারামারি-কাটাকাটি ও খুন-খারাবী চালাতে থাকে।

তখন আল্লাহ তা‘আলা, ঐসব দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারী থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য ফেরেশতাদের একটি দলকে পৃথিবীতে পাঠান। ঐসকল ফেরেশতাকেও অনেকের মতে জিন বলা হতো। তারা ছিলেন জান্নাতের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাদের নাম ছিল জিন। তাদের নেতা ছিল ইবলীস। সে ছিল তাদের সরদার ও সবার চেয়ে বড় জ্ঞানী।

আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে সেই ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে আসলেন এবং জিনদেরকে পাহাড়-জঙ্গলে তাড়িয়ে দিলেন আর নিজেরা পৃথিবীতে বসবাস শুরু করলেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর আল্লাহর ইবাদত হালকা করে দিলেন।

আল্লাহ তা‘আলা ইবলীসকে পৃথিবী ও এর নিকটবর্তী আসমানের রাজত্ব এবং জান্নাতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। তাই সে কখনো যমিনে, কখনো আসমানে এবং কখনো জান্নাতে দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর ইবাদত করতো।

এই উচ্চপদমর্যাদার দরগুন ইবলীসের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হলো। সে মনে মনে বললো, আমাকে আল্লাহ তা‘আলা এই

রাজত্ব ও মর্যাদা দান করার কারণ হলো, আমি সমস্ত ফেরেশতার সরদার ও গুরু।

প্রথম মানব আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তা‘আলা সেই সকল ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেন,

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

অর্থাৎ, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।

আল্লামা বাগাবী রহ. এর উক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, ইবলীস ছিল ফেরেশতা। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ

অর্থঃ ফেরেশতাগণ সকলে একসঙ্গে সিজদা করলো ইবলীস ছাড়া।

এ আয়াতের ইসতিসনা (استِثْنَاء) থেকেও এটাই বুঝা যায়। কেননা, তাদের দলে शामिल না হলে তাদের থেকে ইসতিসনা (পৃথকীকরণ) করা হলো কেন?

তবে হযরত হাসান বসরী রহ. সহীহ সনদের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছেন, ইবলীস ছিল মূলত জিনদের অন্তর্ভুক্ত। ফেরেশতাদের সুহবাতে সে বড় আবেদ বনে গিয়েছিল এবং ফেরেশতাদের সাথেই সে মিলে-মিশে থাকতো। এজন্য হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে সিজদা করার হুকুম তার উপরও আরোপিত হয়েছিল। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের অপর এক আয়াত ও বিভিন্ন সহীহ হাদীস দিয়ে হযরত হাসান বসরীর মতটিই মজবুত বলে প্রমাণিত হয়।



আল্লাহ তা‘আলা যখন ইবলীস ও ফেরেশতাগণকে আদম ‘আলাইহিস সালামকে সিজদা করার আদেশ দিলেন, তখন ইবলীস অহংকারবশত তা করতে অস্বীকার করলো।

আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাগণের অভিমত

আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতির সৃষ্টির সূচনায় হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার বিষয়টি ফেরেশতাগণের সামনে উপস্থাপনের ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

অর্থঃ স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা তো আপনার গুণ-কীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনা করেই চলছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমিই জানি, যা তোমরা জান না। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩০)

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাগণ থেকে পরীক্ষা নেয়ার জন্য স্বীয় এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, আমি আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে বিশ্বে তার

খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এতে ইংগিত ছিল যে, তারা যেন এ ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

কাজেই ফেরেশতাগণ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মানব জাতির মাঝে অনেক লোক হবে, যারা শুধু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। সুতরাং মানুষের উপর খিলাফত ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব দেয়ার কারণ ফেরেশতাদের পুরোপুরি বুঝে আসে নাই।

বরং এর পরিবর্তে এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফেরেশতাগণ নিজেদেরই যোগ্যতম বলে মনে করলেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদের সৃষ্টিই করেছেন এমনভাবে যে, নেক আমল আর সৎ কাজ করাই তাদের স্বভাবজাত গুণ। তাদের দিয়ে পাপ ও অন্যায় কাজ আদৌ সম্ভব নয়। তারা সবসময়ই আল্লাহর অনুগত। তাই এ পৃথিবীতে শাসনকার্য পরিচালনা ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজও তারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

তাদের এ ধারণা যে ভুল ও অমূলক, তা আল্লাহ তা‘আলা শাসকোচিত ভঙ্গিতে বর্ণনা করে বলেন, **إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ**

অর্থঃ নিঃসন্দেহে আমিই জানি, যা তোমরা জান না।

অর্থাৎ বিশ্ব খিলাফতের প্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমরা মোটেই ওয়াকিফহাল নও। তা কেবল আমি পরিপূর্ণভাবে জানি।

আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাগণের সাথে উপরোক্ত কথাবার্তা বলার পর হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে **اديم زمين** অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ

থেকে সৃষ্টি করলেন। এক্ষেত্রে যমিন থেকে সব রঙের মাটি নিয়ে তা বিভিন্ন পানি দিয়ে খামির করলেন। তারপর তিনি তা সুবিন্যস্ত করে বাতাসে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ঠনঠনা বানিয়ে তাতে রুহ ফুঁকে দিলেন। তাতে পয়দা হয়ে গেলেন মনুষ্য শরীরে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম।

এই প্রসঙ্গে হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ فَبَضَّهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ.

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস সালামকে এমন এক মুষ্টি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আর এ কারণেই আদম-সন্তানদের মধ্যে কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ এর মাঝামাঝি। আবার কেউ কোমল, কেউ ককর্শ, কেউ অনাচারী ও কেউ সদাচারী হয়।

এক্ষেত্রে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে মাটি সংগ্রহ করার রহস্য হচ্ছে, সব ধরনের যোগ্যতা তাতে সন্নিবেশিত করা। (তাফসীরে মাযহারী)

ফেরেশতার উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব

ইমাম বাগাবী রহ. বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা‘আলা যখন বলেন, আমি যমিনে খলীফা বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন যা ইচ্ছা সৃষ্টি করবেন, কিন্তু নিশ্চয় আমাদের চেয়ে উত্তম কোন মাখলুক সৃষ্টি করবেন না। আর যদি কোন মাখলুক আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিও করেন, তবু জ্ঞানের দিক দিয়ে আমরা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ থাকবো

নিশ্চয়। কেননা, প্রথমত আমরা তাদের আগে সৃষ্টি হয়েছি এবং দ্বিতীয়ত আমরা এমন সব আশ্চর্য ঘটনা দেখেছি, যা তারা দেখেনি।

তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থা সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَادُمْ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۚ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস সালামকে যাবতীয় (বস্তুর) নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর সেগুলোকে ফেরেশতাগণের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, তোমরা এসবের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি অতি পবিত্র, আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই। নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত জ্ঞানবান ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, হে আদম, তাদের এগুলোর নাম বলে দাও। সঙ্গে সঙ্গে যখন আদম ‘আলাইহিস সালাম তাদের সেগুলোর নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান ও যমিনের যাবতীয় অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ, আমি সবই জানি? (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩১- ৩৩)

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা‘আলা কোন কোন বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন, এব্যাপারে তাফসীরকারদের থেকে

কয়েকটি মত বর্ণিত আছে। অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, সারাবিশ্বের সমস্ত মাখলুকের নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., মুজাহিদ ও কাতাদা রহ. বলেন, যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। এমনকি বড় পেয়ালা ও ছোট পেয়ালার নামও শিখিয়েছিলেন।

অনুরূপ কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীতে যা আগে হয়েছে এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত হবে, সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হযরত রবী ইবনে আনাস রহ. বলেন, তাকে ফেরেশতাগণের নাম শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, তার সন্তানসন্ততির নাম শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

আবার কেউ কেউ এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, আদম ‘আলাইহিস সালামকে সকল বস্তুর নাম ও গুণাবলী শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

তেমনিভাবে কারো কারো অভিমত হলো, আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস সালামকে সমস্ত ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। একারণেই আদমসন্তানরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। (তাফসীরে মাযহারী)

সারকথা, আল্লাহ তা‘আলা এভাবে ফেরেশতাদের সামনে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অনন্য মর্যাদার বিষয়টি চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত করলেন এবং বললেন, বিশ্ব খিলাফতের জন্য পৃথিবীতে যতো সৃষ্ট জিনিস রয়েছে এর নাম, গুণাবলী, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যিক। বস্তুত তোমাদের মধ্যে এধরনের যোগ্যতা ও গুণাবলী নেই। কিন্তু আদমের মধ্যে সেই গুণাবলী আছে।

আল্লামা বাগাবী রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের আত্মাহীন দেহ মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে রাখা ছিল। তখন ইবলীস সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিল, একে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? এরপর সে তার সঙ্গী ফেরেশতাদের বললো, যদি তাকে তোমাদের চেয়ে উত্তম বানানো হয় এবং তোমাদের তার আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে তোমরা কী করবে? ফেরেশতাগণ সবাই এক স্বরে বললেন, আমরা আমাদের রবের হুকুম মেনে নিব। ইবলীস তখন মনে মনে বললো, আল্লাহর কসম, আমাকে যদি তার উপর ক্ষমতাবান করা হয়, তবে আমি তাকে ধ্বংস করে ছাড়বো। আর তাকে যদি আমার উপর ক্ষমতাবান করা হয়, তা হলে অবশ্যই আমি তাকে অমান্য করবো।

এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের পর ফেরেশতাদের বলেন,

وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

অর্থঃ এবং আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ করছো এবং যা তোমরা লুকিয়েছিলে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৩)

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ যে আমার আনুগত্য প্রকাশ করেছে তা আমি জানি। আর শয়তান যে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা তার মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, সে সম্পর্কেও আমি অবগত।

আদম ‘আলাইহিস সালামকে সিজদার নির্দেশ এবং ইবলীসের অবাধ্যতা

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের মাঝে যেহেতু ফেরেশতা ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছিল, সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ পদমর্যাদা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ছিল। এখন আল্লাহ তা‘আলা এ বিষয়টি কার্যকরভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন যে, ফেরেশতা ও জিনদের দিয়ে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের প্রতি এমন বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করানো হোক, যদ্বারা কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি তাদের উভয়ের চাইতে উত্তম ও পূর্ণতর। এজন্য তাদের হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক সিজদা করার আদেশ দিলেন।

তখন আল্লাহ তা‘আলার হুকুম পাওয়ামাত্র সকল ফেরেশতা একসঙ্গে সিজদা করলেন। কিন্তু ইবলীস সিজদা করলো না। সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে সিজদা করতে অস্বীকার করলো। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

অর্থঃ যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো। তখন তারা সবাই সিজদা করলো ইবলীস ছাড়া। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করলো এবং অহংকার প্রদর্শন করলো। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৪)

সুজুদ (سجود) বা সিজদা (سجدة) শব্দের আভিধানিক অর্থ বিনয় ও হীনতা প্রকাশ করা। আর শরী‘আতের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে ইবাদতের উদ্দেশ্যে যমিনের উপর কপাল রাখা।

ফেরেশতাগণের প্রতি যে সিজদার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল, এর দিয়ে শর‘ঈ সিজদা বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে সিজদা

গণ্য হবে আল্লাহ তা‘আলারই জন্য। কেননা, এর নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। সেই সাথে এর দিয়ে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের প্রতি অনন্য সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য। এতে করে প্রথমপর্যায়ে ফেরেশতাগণ আদম ‘আলাইহিস সালামের মর্যাদা যে অস্বীকার করেছিল, তা অসার প্রমাণিত হবে এবং এর বিপরীতে তাদের দিয়ে আদম ‘আলাইহিস সালামের সুউচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি প্রমাণিত হবে। এ হিসেবে বলা যায়, আল্লাহর জন্য সিজদার ক্ষেত্রে আদম ‘আলাইহিস সালামকে কিবলা বানানো হয়েছিল। হাদীস শরীফে এমনটিই বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদম-সন্তান যখন (পবিত্র কুরআনের) সিজদার আয়াত পাঠ করে এবং সিজদা করে, তখন শয়তান কোনায় গিয়ে কান্না করে এবং বলতে থাকে, আফসোস, আদম-সন্তানকে সিজদার হুকুম করা হয়েছে, আর সে সিজদা করে জান্নাতের অধিকারী হয়েছে। অপরদিকে আমাকে সিজদার হুকুম করা হয়েছিল, কিন্তু আমি তা অমান্য করেছি, তাই আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম!

এই ব্যাখ্যা অনুসারে اسْجُدْ (অর্থ সিজদা) -এর ل (অর্থ জন্য) শব্দটি ل (অর্থ দিকে) -এর অর্থ দিবে। এতে অর্থ হবে আদমের দিকে ফিরে আমাকে (আল্লাহকে) সিজদা করো।

অথবা আয়াতটির তাবীর এভাবেও করা যায় যে, ফেরেশতাদের তরফ থেকে যেহেতু বাহ্যত আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার জন্য আপত্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তাই তাওবা হিসাবে তাদের উপর

একটি সিজদা ওয়াজিব হয়েছে। আর ওই সিজদার মূল কারণ আদম ‘আলাইহিস সালাম হওয়ার দরুন ﴿٥١﴾ বলা হয়েছে।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে আদমের কারণে আমাকে সিজদা করো। তখন ﴿٥١﴾-এর ٥ হরফটি কারণমূলক অব্যয় হবে।

কিংবা এখানে সিজদার আদেশ দিয়ে সিজদা শব্দের আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য বলেও তাবীর করা যায়। অর্থাৎ আদমের সামনে সম্মানসূচক বিনয় ও নীচতা প্রকাশ করো। যেসকল হযরত ইউসুফ ‘আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাকে সম্মানসূচক সিজদা করেছিল। (তাফসীরে মাযহারী)

ইবলীস হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে সিজদা না করার সময় দুটি কথা বলেছিল, প্রথমত সে বলেছিল, আদম মাটির তৈরী এবং আমি আগুনের। আপনি মাটির আদমকে আমি-আগুনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন?

এই প্রশ্নটি আল্লাহ তা‘আলার আদেশের বিপরীতে সেই নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই।

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই, একথা বলাইবাহুল্য। কারণ, দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এই অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোন কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে মালিককে প্রশ্ন করবে, এর রহস্য কী? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে কুরআন মজীদে তার স্পষ্ট কোন উত্তর দেওয়া হয়নি।

তবে বাহ্যিক উত্তর হলো, এক বস্তু অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সেই সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তা-ই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কারো কোনরূপ আপত্তি তোলার কোন অধিকার নেই।

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি কিছু মুখলিস বান্দা ছাড়া আদমের গোটা বংশধরকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো।

আল্লাহ তা‘আলা এর উত্তরে বলেছেন, আমার খাঁটি বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না, যদিও তোর গোটা বাহিনীর সর্বশক্তি এই কাজে নিয়োজিত হয়। আর অবশিষ্ট অখাঁটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে, তাদের দুর্দশা তা-ই হবে, যা তোর জন্য নির্ধারিত। অর্থাৎ জাহান্নামের আযাবে তাদের সবাই নিপতিত হবে।

কুরআন মজীদে একথাই বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ۚ
 قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا
 ۝ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ۝

অর্থঃ স্মরণ করুন, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো। সে বললো, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করবো, যাকে আপনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? সে বললো, আচ্ছা বলুন তো, এ ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন

(তার মধ্যে মর্যাদার কী আছে?) , আপনি যদি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, তা হলে আমি স্বল্পসংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদের আমার বশীভূত করে ফেলব। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, যাও, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই হবে তোমাদের সকলের যথার্থ শাস্তি। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৬১-৬৩)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র উক্ত বিষয়টি এভাবে বিবৃত করা হয়েছে,
 قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اُمِرْتُكَ ۚ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলা বললেন, কোন বিষয়টি তোমাকে সিজদা করতে বারণ করলো যখন আমি তোমাকে আদেশ করেছি? ইবলীস উত্তরে বললো, আমি আদমের চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১২)

অর্থাৎ শয়তানের বক্তব্য ছিল, আমি আদমের চেয়ে অধিক সম্মানিত। কেননা, আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং আগুন উর্ধ্বগামী আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা নিম্নমুখী। আগুনের সৃষ্টির সাথে মাটির সৃষ্টির তুলনা হতে পারে না। অতএব আমি কেন আদমকে সিজদা করবো?

আল্লাহ তা‘আলা অন্তর্যামী, মনের গুণবিষয়ও তিনি জানেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নিকট সমান। ইবলীসের মনের অবস্থা তিনি সবই জানতেন। তবু তিনি পরীক্ষার জন্য এবং সর্বসমক্ষে তার জবাব প্রকাশ করানোর জন্য ইবলীস-শয়তানকে উক্ত প্রশ্ন করেছেন।

হতভাগা ইবলীস নিজের গর্ব ও অহংকারের দরুন একথা ভুলে গেল যে, যখন সে এবং আদম উভয়ে আল্লাহ তা‘আলারই সৃষ্ট, তখন সৃষ্টজীবের মূল তথ্য, স্রষ্টার চেয়ে বেশী সৃষ্টজীব নিজেও জানতে পারে না। শয়তান নিজের আত্মগরিমা ও অহংকারের কারণে এই কথাটি বুঝতেই পারলো না যে, ইজ্জত-সম্মান কখনো ঐ জিনিসের উপর নির্ভর করে না, যা দিয়ে সে তৈরী বরং ইজ্জত-সম্মান নির্ভর করে ঐ সমস্ত গুণের উপর, যা বানানেওয়ালা বানানোর পর ঐ জিনিসের মধ্যে দিয়েছেন।

শয়তানের জবাব যেহেতু অহংকার ও গর্বের মূর্খতাপ্রসূত ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল, তাই আল্লাহ তা‘আলা তাকে স্পষ্ট বলে দিলেন, মূর্খতাজনিত গর্ব ও অহংকার তোকে এত অন্ধ করে দিয়েছে যে, তুই নিজের স্রষ্টার হকও ভুলে গিয়েছিস। সে কারণে আমার নির্দেশে আপত্তি উত্থাপন করেছিস, যা এই কথা প্রমাণ করছে যে, আমি (আল্লাহ) তোকে যে আদেশ করেছি তা আমার (আল্লাহর) অন্যায় হয়েছে। আমাকে (আল্লাহকে) দোষী প্রমাণ করার মতো বেআদবী আর দুঃসাহস তোর দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। একথা বুঝতে পারলি না যে, তোর মূর্খতা তোকে আসল তথ্য বুঝতে অক্ষম ও অপারগ বানিয়ে দিয়েছে। অতএব, তুই এখন এ অবাধ্যচরণের জন্য চিরস্থায়ী ধ্বংসের উপযুক্ত হয়েছিস এবং এটাই তোর কাজের উপযুক্ত বিনিময়। সুতরাং তুই এই জান্নাত থেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় বের হয়ে যা এবং তোর নিজের ও তোর অনুসারীদের পরিণতি হিসাবে চিরস্থায়ী অভিশাপ ও জাহান্নামের অপেক্ষায় থাক।

পবিত্র কুরআনে এ বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলা বললেন, তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে থেকে তুই অহংকার করবি, তা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যা; তুই নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিস। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৩)

ইবলীস যখন দেখলো, বিশ্বপালনকর্তার আদেশ অমান্য করা, গর্ব ও অহংকার করা এবং আল্লাহ তা‘আলার প্রতি অন্যায় আদেশদানের দোষ আরোপ করার মতো অপরাধগুলো তাকে আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীনের রহমতের দরবার থেকে বিতাড়িত এবং বেহেশত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে, তখন সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে তাওবা-ইসতিগফার করার পরিবর্তে দুঃসাহস দেখিয়ে আল্লাহ তা‘আলার নিকট এই দাবি জানালো যে, “কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে (আমার শয়তানি কার্যক্রম চালানোর জন্য) অবকাশ দান করুন। এই লম্বা সময়টুকুর জন্য আমার আয়ু লম্বা করে দিন।” আল্লাহ তা‘আলার হেকমতের চাহিদাও ছিল এটাই। সুতরাং তিনি ইবলীসের দাবি মন্যুর করলেন।

এ পর্যায়ে সে আরেকবার নিজের শয়তানি স্বভাব জাহির করে বললো, আপনি যখন আমাকে আপনার দরবার থেকে বিতাড়িতই করে দিলেন তখন যেই আদমের কারণে এই অপমান ও লাঞ্ছনা আমার ভাগ্যে জুটল, আমি তার সন্তানদের পথভ্রষ্ট করবো, তাদের পিছনে, সামনে, আশপাশে তথা চারদিক থেকে তাদের গোমরাহ করবো এবং তাদের অধিকাংশকে আপনার অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান বানিয়ে ছাড়বো। অবশ্য আপনার খাঁটি বান্দাদের পথভ্রষ্ট করতে আক্রমণ করেও কাবু করতে পারব না। তারা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকবে।



আল্লাহ তা‘আলা বললেন, তাতে আমার কোন পরোয়া নেই। আমার সৃষ্টির বিধান, “যেমন কর্ম তেমন ফল” অটল থাকবে। সুতরাং যে যেমন কাজ করবে, সে তেমনই ফল ভোগ করবে। তাই যেই আদম-সন্তান আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তোর রাস্তা অনুসরণ করবে, সে তোরই সাথে জাহান্নামে আযাবের ভাগী হবে। পবিত্র কুরআনে এই বিষয়টি এভাবে বিবৃত হয়েছে,

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۖ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا يَخْلِفُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَدْحُورًا ۖ لَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلَنَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْعَلِينَ ۝

অর্থঃ শয়তান বললো, আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, ঠিক আছে, তুই অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। সে বললো, যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ সাব্যস্ত করেছেন, তাই আমি অবশ্যই বনী আদমের জন্য আপনার সরল-সঠিক পথে ওত পেতে বসে থাকবো। তারপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসব তাদের সামনে, পিছে এবং ডান ও বাম দিক দিয়ে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে শোকরগুয়ার পাবেন না। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, এখান থেকে বেরিয়ে যা, লাঞ্ছিত ও অপমান অবস্থায়। তাদের মধ্য থেকে যে-কেউ তোর অনুসরণ করবে, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৪-১৮)

ফেরেশতাগণ যখন হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে তার সামনে সিজদা করলেন আর ইবলীস আত্মগরিমা ও হঠকারিতার দরুন কাফের হয়ে জান্নাত থেকে বেরিয়ে গেল, তখন

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম এবং তার সহধর্মিণী হাওয়া ‘আলাইহিস সালাম এই নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন যে, তোমরা জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং সেখানকার নিয়ামতসমূহ তৃপ্তিভরে ভোগ করতে থাকো। আর একটি নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হলো, এর কাছে-ধারেও যাবে না। অর্থাৎ সেটির ফল খাবে না। কুরআনে কারীমে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ আর আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার বেগম জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং সেখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাকো। কিন্তু এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। তা না হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৫)

হাওয়া ‘আলাইহিস সালামের সৃষ্টির বর্ণনা

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম লম্বাসময় যাবত একাকী জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু নিজের জীবনযাপনে এবং সুখ-শান্তিতে একপ্রকার নির্জনতা ও শূন্যতা অনুভব করছিলেন। তাই আল্লাহ তা‘আলা হযরত হাওয়া ‘আলাইহিস সালামকে পয়দা করলেন।

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম নিজের জীবনসঙ্গিনীকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং অন্তরে শান্তি অনুভব করলেন।

উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিস সালামের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে বেহেশতের যেকোনো স্থানে বসবাস করার অনুমতি ছিল এবং যেকোনো বস্তু

ব্যবহার ও খাওয়ার অনুমতি ছিল। তবে নির্দিষ্ট একটি গাছ সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, তা ফল খাবে না, এমনকি তার কাছেও যাবে না।

এই পর্যায়ে ইবলীস এর সুযোগ গ্রহণ করলো। নিজের সুরত বদল করে, সে হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমােস সালামকে এই কুপরামর্শ দিল যে, এই গাছটি “অমর গাছ”। এই গাছের ফল খেলে অত্যন্ত আরাম ও শান্তির সাথে চিরকাল বসবাস করা এবং আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভ করা অবধারিত হয়ে যাবে। তদুপরি সে নানান উপায়ে শপথ করে তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জমিয়ে দিল যে, সে তাদের একান্ত হিতাকাংক্ষী, তাদের শত্রু নয়।

আল্লাহর নামের কসম শুনে হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমােস সালাম চিন্তাও করতে পারলেন না যে, কেউ আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা বলতে পারে। তাই ইবলীসের নসীহত শুনে আদম ‘আলাইহিস সালাম বিষয়টি বেমালাম ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন যে, আল্লাহ এটি করতে নিষেধ করেছিলেন। আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে কোন কাজ করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি, চিরকাল বেহেশতে থাকা এবং আল্লাহর নৈকট্যে থাকার বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো। ফলে তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলেন।

সেই ফল খাওয়ার সাথে সাথেই অবধারিত পরিণতি দেখা গেল। তাঁরা দেখতে পেলেন, তাঁরা উভয়েই বস্ত্রহীন এবং বেহেশতী পোশাক থেকে বঞ্চিত। তখন তাড়াতাড়ি আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমােস সালাম দুজনেই জান্নাতের গাছের পাতা জড়িয়ে নিজ নিজ আবরণযোগ্য স্থান আবৃত করলেন। বিষয়টি যেন মানবসভ্যতার প্রকাশ ছিল; দেহ আবৃত করার জন্য সর্বপ্রথম তারা দুজন গাছের পাতা ব্যবহার করলেন।

এ পর্যায়ে আল্লাহ তা‘আলার তিরস্কার নাযিল হলো এবং আদম ও হাওয়ার নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করা হলো, নিষেধ সত্ত্বেও নির্দেশ কেন লঙ্ঘন করলে?

আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিস সালামের তাওবা

আদম ‘আলাইহিস সালাম তো আদমই ছিলেন, আল্লাহ তা‘আলার প্রিয় বান্দা আর হাওয়া ‘আলাইহিস সালামও তারই মতো আল্লাহর অনুগত বান্দী ছিলেন। সুতরাং তারা শয়তানের মতো বিতর্ক করলেন না বা নিজেদের ভুল অপব্যখ্যার আবরণে ঢাকতে চেষ্টা করলেন না। বরং অনুতাপ ও লজ্জার সাথে স্বীকার করলেন, ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর কারণ অবাধ্যতা নয়; বরং মানবিক স্বভাবগত ভুলই এর কারণ। তবু তা ভুলই বটে, তাই তাওবা করে তার অনুশোচনা ও রোনাঝারির সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, আয় আল্লাহ, এই মুহূর্তে আপনি আমাদের না ক্ষমা করলে এবং দয়া না করলে, আমাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এই ওয়র কবুল করলেন এবং তাদের ক্ষমা করে দিলেন।

কিন্তু পৃথিবীতে আল্লাহ তা‘আলার প্রতিনিধিত্ব করার সময়, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের এসে গিয়েছিল তাই আল্লাহ তা‘আলার হেকমতের চাহিদা অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গেই এই নির্দেশ শুনানো হলো যে, হে আদম, তোমাকে এবং তোমার সন্তানদের এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে এবং তোমার শত্রু ইবলীসও তার শত্রুতার যাবতীয় উপকরণ নিয়ে সেখানে অবস্থান করবে। তাই তোমাকে ফেরেশতাসুলভ ও অবাধ্যতামূলক বিপরীত শক্তির মাঝখানে থেকে ঈমান ও সৎকাজের সাথে জীবনযাপন করতে হবে। এমতাবস্থায় তুমি এবং তোমার সন্তানগণ যদি খাঁটি বান্দা ও

সত্যিকার ফরমাবরদার বলে সাব্যস্ত হও, তবে তোমার আসল বাসস্থান বেহেশত অনন্তকালের জন্য তোমার ও তোমার সন্তানদের মালিকানায় দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তোমরা জান্নাতের অধিকারী হবে।

অতএব, আপাতত তুমি ও তোমার বেগম দুনিয়াতে চলে যাও, আমার যমিনে গিয়ে বসবাস করতে থাকো এবং নিজের নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বন্দেগীর হক আদায় করতে থাক।

তখন মানবজাতির আদি পিতা এবং আল্লাহ তা‘আলার খলীফা হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম নিজের জীবনসঙ্গিনী হযরত হাওয়া ‘আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে যমিনে আগমন করলেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর বর্ণনায় মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ○ فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ○ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ○ فَدَلَّهُمَا بِعُرْوَةٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وُرْقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ○ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ○ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ○

অর্থঃ হে আদম, তুমি ও তোমার বেগম জান্নাতে বসবাস করো। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও। তবে এই গাছের কাছে যেয়ো না। তা না হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। তারপর

শয়তান তাদের উভয়কে প্ররোচিত করলো, যাতে প্রকাশ করে দেয় তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের কাছে গোপন ছিল এবং বললো, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের এই গাছ থেকে শুধু এজন্য নিষেধ করেছেন, যেন তোমরা ফেরেশতা হয়ে না যাও কিংবা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে না যাও। আর সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বললো, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী একজন। এভাবে সে তাদের ধোকা দিয়ে বিভ্রান্ত করলো। তারপর যখন তারা সেই গাছের ফল খেলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা নিজেদের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগলেন। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের বললেন, আমি কি তোমাদের এই গাছ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তারা উভয়ে বললেন, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, তোমরা নেমে যাও! তোমরা একে অপরের শত্রু। আর পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকার ব্যবস্থা রইল। তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবনযাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৯-২৫)

আদম-হাওয়া ‘আলাইহিমা সালামের তাওবা কবুল হয়েছে
হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমা সালাম আল্লাহ তা‘আলার
দরবারে তাওবা করার পরে আল্লাহ তা‘আলা তাদের তাওবা কবুল

করলেন। কুরআন মজীদে তাদের এই তাওবার কথা বিবৃত হয়েছে।
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

অর্থঃ অতঃপর হযরত আদম তার পালনকর্তার কাছ থেকে কিছু বাণী শিখে নিলেন। তারপর আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৭)

এই আয়াতে শুধু হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের তাওবা কবুল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, হাওয়া ‘আলাইহিস সালাম হুকুমের দিক থেকে আদম ‘আলাইহিস সালামের অধীনস্থ ছিলেন। আর এ কারণেই কুরআন ও সুন্নাহর অধিকাংশ স্থানে নারীদের কথা সরাসরিভাবে উল্লেখ করা হয়নি। (বরং পুরুষদের কথা উল্লেখের মধ্যে অধীন হিসাবে নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে)।
(তাফসীরে মাযহারী- ১ম খণ্ড)

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ঘোষণার পরেও হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার দরবারে কী পরিমাণ অনুতপ্ত ছিলেন, নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়াতটি দিয়ে তা দিবা লোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালাম দুইশত বছর কান্না করেন এবং চল্লিশদিন পর্যন্ত কোন কিছু না খেয়ে অনুশোচনা করতে থাকেন। তেমনিভাবে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে একশত বছর পর্যন্ত হাওয়া ‘আলাইহিস সালামের নিকটেও আসেননি।

হযরত শাহর ইবনে হাউশাব রহ. বলেন, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয়ে তিনশত বছর পর্যন্ত মাথা ওঠাননি।

আলোচিত ঘটনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১. আদম ‘আলাইহিস সালামকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা যে আদেশ দান করেছিলেন, তা ফেরেশতাদের করেছিলেন, আর ইবলীস তো জিনজাতির সদস্য, ফেরেশতাজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়; তা হলে ইবলীসকে কেন অবাধ্য সাব্যস্ত করা হলো এবং তার উপর কেন আল্লাহ তা‘আলার তিরস্কার ও অভিশাপ বর্ষিত হলো?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো, ইবলীস যে ফেরেশতাদের থেকে নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, কুরআন মজীদে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে,

كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

অর্থঃ ইবলীস জিনজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারপর সে তার প্রতিপালকের নাফরমানী করলো। (সূরা কাহাফ, আয়াত: ৫০)

কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা যখন হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে সিজদা করার নির্দেশ প্রদান করেন, তখন ইবলীস সেই মজলিসের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং লম্বা সময় পর্যন্ত সে ফেরেশতাদের সাথে তাসবীহ-তাহলীল পাঠে মশগুল ছিল। এ কারণে সেও এই আদেশে আদিষ্ট ছিল এবং সে নিজেও নিজেকে এই আদেশে আদিষ্ট বলে মনে করেছিল। এই কারণেই যখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন “তুমি সিজদা করলে না কেন” তখন সে এই উত্তর দেয়নি যে, “আমি ফেরেশতা নই, তাই এ আদেশে আদিষ্টই ছিলাম না,

যার দরুন সিজদা করিনি।” বরং সে অহংকারের সাথে বলেছিল, “আমি আদমের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ, কাজেই সিজদা থেকে বিরত রয়েছি।”

২. ইবলীস বিতাড়িত হয়ে বেহেশত থেকে বহিস্কৃত হলো আর হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম বেহেশতেই ছিলেন। সুতরাং ইবলীসের পক্ষে হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমা স সালামকে বিভ্রান্ত করা কীভাবে সম্ভব হলো?

আলেমগণ এই প্রশ্নের দ্বিবিধ উত্তর প্রদান করেছেন এবং উভয় উত্তর কোন লম্বা ব্যাখ্যা ছাড়াই বোধগম্য।

ক. যদিও ইবলীসকে বেহেশত থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল, তবু এক গুনাহগার ও নিকৃষ্ট মাখলুক হিসাবে বেহেশতে দাখিল হওয়া তার বিতাড়িত হওয়ার বিরোধী নয়। সুতরাং এরূপেই সে বেহেশতে প্রবেশ করে হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমা স সালামের সাথে এরূপ কথোপকথন করেছিল এবং তাদের ধোঁকায় ফেলেছিল।

এক্ষেত্রে এই আয়াত **اٰھْبِطُوۡا مِنْہَا جَبِيًۡٔا** “সকলে এখান থেকে নেমে যাও” এটা এরই সমর্থন করছে যে, গুনাহগার মাখলুকরূপে তখন পর্যন্ত বেহেশতে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়নি।

খ. যেভাবে একটি শব্দ টেলিফোন কিংবা রেডিওর সাহায্যে বহুদূরে যেতে পারে এবং যেভাবে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে শুধু শব্দতরঙ্গের সাহায্যে একটি পয়গাম হাজার মাইল পর্যন্ত পৌঁছানো যেতে পারে, অনুরূপভাবে এটা কেন সম্ভব হবে না যে, নিকট ও মুখোমুখি হয়ে সম্বোধন করা ছাড়াই শয়তানের কুমন্ত্রণা মানুষের অন্তরে পৌঁছে যাবে এবং তাতে প্রতিক্রিয়া হবে? সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে কুমন্ত্রণা

প্রদানের অবস্থা এরূপ হবে যে, শয়তান বেহেশতের বাইরে থেকেই হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিস সালামের অন্তরে এই কুমন্ত্রণা দিয়েছিল।

এ সম্পর্কিত বর্ণনা **فَوَسَّوْا لَهُمُ الشَّيْطَانُ** (শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল) আয়াতটি থেকে এটাই প্রকাশ পায়।

৩. কেউ প্রশ্ন করতে পারে, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম একজন পয়গামবর হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে আল্লাহ তা‘আলার হুকুমের খেলাফ কাজ করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছেন?

কুরআন মজীদে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝

অর্থঃ আর আমি এর আগে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল, আমি তাকে ইচ্ছাপূর্বক অন্যায়কারী পাইনি। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১১৫)

এখানে **عَهِدْنَا** শব্দটি **وَصَّيْنَا** অথবা **أَمَرْنَا** শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উদ্দেশ্য হলো, আপনার বহু আগে আদম ‘আলাইহিস সালামকে তাকিদ দিয়ে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কে বলেছিলাম, এই গাছের ফল খেও না। এমনকি এর নিকটেও যেয়ো না। এ ছাড়া জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও নিয়ামত তোমাদের জন্য উন্মুক্ত। আরও বলেছিলাম, ইবলীস তোমাদের শত্রু। তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম ‘আলাইহিস সালাম এসব কথা ভুলে গেলেন। তবে আমি তার মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক নাফরমানী পাইনি।

এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, نَسِيَانٌ اعْزَمُ ও نَسِيَانٌ শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়া এবং عَزَمَ শব্দের অর্থ কোন কাজের জন্য সংকল্পকে দৃঢ় করা অর্থাৎ পাক্কা ইরাদা করা। এই শব্দ দুটি দিয়ে এখানে কী বুঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম করার আগে একথা জেনে নেওয়া জরুরী যে, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার বিশিষ্ট নবীদের অন্যতম ছিলেন এবং সকল নবীই গুনাহ থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ হয়ে থাকেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে, আদম ‘আলাইহিস সালাম ভুলবশতঃ তা করেছেন। ভুলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই শরী‘আতে একে পাপই গণ্য করা হয়নি। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطُؤُ وَالنَّسِيَانُ

অর্থঃ আমার উম্মাতের ভুলবশত ও ভুলে যাওয়ার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

তা ছাড়াও আদম ‘আলাইহিস সালামের এই ঘটনা প্রথমত নবুওয়্যাত ও রিসালাতের আগেকার। এ সময় নবীদের কাছ থেকে কোন ভুল প্রকাশ পাওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামা‘আতের কতক আলেমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়। দ্বিতীয়ত প্রকৃত অর্থে এটা একটা ভুলে যাওয়ার বিষয়, যা গুনাহ নয়। কিন্তু আদম ‘আলাইহিস সালামের উচ্চ মরতবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তার জন্য গুনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ভৎসনা করেছেন এবং সতর্ক করার জন্য এই ভুলকে عَضِيَانٌ (অবাধ্যতা) শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়ত عَزْم শব্দ ব্যবহার করে আয়াতে বলা হয়েছে, আদম ‘আলাইহিস সালামের মধ্যে عَزْم তথা অন্যায়ের সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। আগেই বলা হয়েছে, এর অর্থ কোন কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। আদম ‘আলাইহিস সালাম খোদায়ী নির্দেশ পালন করার পুরোপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল তাকে আল্লাহর হুকুম মান্য করার মজবুত সংকল্প থেকে বিচ্যুত করে দেয়। সুতরাং উক্ত ভুল কাজের মধ্যে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের ইচ্ছাশক্তির কোন প্রয়াস পাওয়া যায়নি।

আলোচিত বর্ণনা থেকে শিক্ষা

১. আল্লাহ তা‘আলার হেকমতের রহস্য অসংখ্য। কোন মানুষের পক্ষে, তিনি আল্লাহ তা‘আলার যত সান্নিধ্যপ্রাপ্তই হোন, সমস্ত রহস্য সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। এই কারণেই আল্লাহ তা‘আলার ফেরেশতাগণ চরম পর্যায়ের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে খলীফা বানানোর হেকমত সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি এবং ব্যাপারটির পূর্ণ তথ্য সামনে না আসা পর্যন্ত তারা বিস্ময়ে ডুবে ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার হেকমতের বিষয় বুঝে আসুক বা না আসুক, সর্বাবস্থায় তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে।

২. আল্লাহ তা‘আলার রহমতের দৃষ্টি ও তাওয়াজ্জুহ যদি কোন তুচ্ছ পদার্থের প্রতিও পড়ে যায়, তবে সে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদায় এবং মহাসম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং অনন্য মহত্ত্ব ও বুয়ুগী লাভ করতে পারে। আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার মূল

উপাদান-মাটির প্রতি লক্ষ্য করুন, তারপর আল্লাহ তা‘আলার প্রতিনিধিত্বের পদটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আর হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের নবুওয়াত ও রিসালাতের পদটিও দেখুন। আল্লাহ তা‘আলার রহমতের তাওয়াজ্জুহ দিয়ে সেই সাধারণ মাটি হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের পবিত্র দেহে এসে কত মর্যাদাবান হয়েছে! অবশ্য আল্লাহ তা‘আলার দয়াদৃষ্টির সেই ভাগ্য ঘটনাক্রমে হয় না অথবা হেকমতশূন্য হয় না, বরং মাখলুক তার যোগ্যতা অনুযায়ীই সেই রহমতপ্রাপ্ত হয়।

৩. মানুষকে যদিও সর্বপ্রকারের বুয়ুগী দান করা হয়েছে এবং সে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে, তবু তার সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত দুর্বলতা নিজের যায়গায় আগের মতই বহাল রয়েছে এবং মানব ও মনুষ্যসুলভ সেই সৃষ্টিগত দুর্বলতা তার মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে। এই মনুষ্য-দুর্বলতাই সেই বিষয় ছিল, যা হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চপদ অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইবলীসের ধোঁকায় পড়ে যান। সুতরাং কোন মানুষ, যতো বড় বুয়ুগী হোন, নিজেকে ক্রটিমুক্ত দাবি করা মানায় না এবং ঈমানী মৃত্যুর ব্যাপারে আশংকামুক্ত হওয়া ঠিক নয়।

৪. অপরাধী হয়েও যদি মানুষের অন্তর তাওবা ও অনুতাপের দিকে নিবিষ্ট হয়, তবে তার জন্য আল্লাহ তা‘আলার রহমতের দরজা বন্ধ থাকে না। অবশ্য খাঁটি তাওবা ও সত্যিকারের অনুতাপ শর্ত।

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের ভুল-ক্রটি যেমন এই তাওবা ও অনুতাপের ফলে মাগফিরাত লাভ করেছে, তদ্রূপ তার সকল বংশধরের জন্যও এই ক্ষমা ও রহমতের জগত খুবই প্রশস্ত। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

অর্থঃ (হে রাসূল,) আপনি বলে দিন, (আল্লাহ তা‘আলা বলছেন,) হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের নফসের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছ (অর্থাৎ গুনাহর কাজ করে নফসের উপর জুলুম করেছ), তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। নিঃসন্দেহে তিনি খুবই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা জুমার, আয়াত: ৫৩)

৫. আল্লাহর দরবারে বেআদবি করা ও বিদ্রোহী হওয়া যাবতীয় নেকি ও সংকাজ ধ্বংস করে দেয় এবং স্থায়ী অপমান ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে ইবলীসের ঘটনাটি বড় উপদেশমূলক। আল্লাহ তা‘আলার দরবারে বেআদবি ও বিদ্রোহ করার ফলে তার হাজার বছরের ইবাদতের কী পরিণতি হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে উপদেশ গ্রহণের উপকরণ। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন আমাদের সকলকে আলোচিত কাহিনী থেকে শিক্ষা অর্জন করে অহংকার ও আত্মগরিমামূলক কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থেকে তাঁর অনুগত বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হযরত নূহ 'আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর

www.darsemansoor.com

www.islamijindagi.com



সূচীপত্র

নূহ ‘আলাইহিস সালামের কওমের প্রতি, আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি

সর্বপ্রথম মূর্তিপূজারি জাতি

যেভাবে মূর্তিপূজার সূচনা হলো

কওমের প্রতি নূহ ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত

দাওয়াত প্রত্যাখ্যান

নবী মানুষের মধ্য থেকেই হবেন

হক অর্থসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত নয়

কওমে নুহের প্রতি আল্লাহর আযাব

যেভাবে আযাব এলো

ঘটনা থেকে শিক্ষা

بِسْمِهِ تَعَالَى

নূহ ‘আলাইহিস সালামের কওমের প্রতি, আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

অর্থঃ নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের ব্যাপারে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি। তার সম্প্রদায়ের সরদাররা বললো, আমরা আপনাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই। বরং আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রাসূল। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৫৯-৬১)

সর্বপ্রথম মূর্তিপূজারি জাতি

উল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের উম্মতের অবস্থা ও নূহ ‘আলাইহিস সালামের সাথে তাদের সংলাপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

নবী-আগমনের ধারাবাহিকতায় হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তার আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও



গোমরাহীর মোকাবেলার পর্যায় ছিল না। এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় এক হাদীসে এসেছে,

كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشْرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ.

অর্থঃ আদম ‘আলাইহিস সালাম ও নূহ ‘আলাইহিস সালামের মাঝখানে এমন দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে, যাদের সকলেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল।

বস্তুত পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম নূহ ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ই মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়। তাই তার যামানা থেকেই ঈমান ও কুফরের সাথে মোকাবেলার পর্যায় আসে। নিম্নোক্ত আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. وَانزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

অর্থঃ সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা পয়গামবর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব। যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৩)

বলা হয়, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের শরী‘আতের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুফর বা কাফেরদের তখন অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের আমল থেকেই শুরু হয়।

আর রিসালাত ও শরী‘আতের দিক দিয়ে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামই জগতের প্রথম রাসূল। এ ব্যাপারে মুসলিম শরীফের শাফা‘আত অধ্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত লম্বা এক হাদীসে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে সর্বপ্রথম রাসূল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ

অর্থঃ হে নূহ, আপনি ভূপৃষ্ঠের সর্বপ্রথম রাসূল।

এ ছাড়া মহাপ্লাবনে সারা পৃথিবী ডুবে যাওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচে ছিল, তারা ছিল হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম ও তার নৌকায় অবস্থিত সঙ্গী-সাথী। তাদের দিয়েই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়েছে। এ কারণেই হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে “ছোট আদম” বলা হয়। আর তাই তো পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহে পয়গামবরগণের কাহিনী বর্ণনার সূচনা তার দিয়েই করা হয়েছে।

এই কাহিনীতে সাড়ে নয়শ বছরের সুলম্বা হায়াতে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের নবীসুলভ চেষ্টা-প্রচেষ্টা, উম্মাতের বিরুদ্ধাচরণ এবং পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে ডুবে যাওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের অষ্টমপুরুষ। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের পুত্র হযরত শীস ‘আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন। হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের

আসল নাম “শাকির”। কোন কোন রেওয়াযাতে “সাকান” এবং কোন কোন বর্ণনায় “আবদুল গাফফার” নাম বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় যে, হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের যুগটি হযরত ইদরীস ‘আলাইহিস সালামের আগে ছিল না, বরং পরে ছিলো। তবে অধিকাংশ সাহাবীর মতে, হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম ইদরীস ‘আলাইহিস সালামের আগে ছিলেন। (আল বাহরুল মুহীত)

মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নূহ ‘আলাইহিস সালাম চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন এবং প্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত ছিলেন।

নূহ ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় ইরাকে বসবাসরত ছিল এবং তারা বাহ্যত সভ্য জাতি হলেও তারাই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা ও প্রচলন ঘটিয়েছিল।

যেভাবে মূর্তিপূজার সূচনা হলো

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের কওমের মূর্তিপূজার সূচনার ঘটনা হলো, তারা পরস্পরে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিল যে, আমরা আমাদের দেব-দেবী, বিশেষত নিম্নোক্ত এই পাঁচ প্রতিমার উপাসনা ত্যাগ করবো না। ১. ওয়াদ্দ (وَدَّ)। ২. সুওয়া (سُوَءًا)। ৩. ইয়াগুস (يَعُوقُ)। ৪. ইয়াউক (يَعُوقُ)। ৫. নাসর (نَسْرًا)।

ইমাম বাগাবী রহ. বর্ণনা করেন, এই পাঁচজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘আলার নেক ও খাস বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল

হযরত আদম ও হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের যমানার মাঝামাঝি। তাদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাদের ইন্তেকালের পর তাদের অনুসারীরা লম্বা সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত ও হুকুম-আহকামের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে।

অতঃপর এক সময় শয়তান তাদের এই বলে প্ররোচিত করলো, তোমরা যেসব নেক বান্দার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইবাদত করো, যদি তাদের মূর্তি তৈরি করে সামনে রেখে নিতে পারো, তা হলে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মূর্তি তৈরি করে ইবাদতখানা তৈরী করলো এবং তাদেরকে স্মরণ করে ইবাদতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করতে লাগল।

এই অবস্থায়ই তাদের সবাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। তারা অবশ্য এসব মূর্তি বা প্রতিমার কখনোই পূজা করতো না। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের জায়গায় এলো। তারা এগুলোর হাকিকত জানতো না।

এবার শয়তান এসে এই নতুন প্রজন্মকে বুঝাল, তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য ছিল মূর্তি ও প্রতিমা। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবীর লক্ষ্যে এসব মূর্তি ও প্রতিমারই উপাসনা করতো। তখন নতুন প্রজন্ম শয়তানের এসব কথা বিশ্বাস করলো এবং সেসব মূর্তি ও প্রতিমার পূজা শুরু করলো। তখন থেকেই পৃথিবীতে প্রতিমাপূজার সূচনা ঘটল।

কওমের প্রতি নূহ ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম সেই সম্প্রদায়কে শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করতে এবং অত্যাচার-অনাচার ত্যাগ করে ন্যায় ও সত্যের পথ ধরার দাওয়াত দিলেন। কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে,

فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهِ غَيْرُهُ

অর্থঃ তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৫৯)

এখানে প্রথম বাক্যে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এটাই মূলনীতি। দ্বিতীয় বাক্যে শিরক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর তাদের মাঝে অবস্থান করেছিলেন এবং তাদের সৎপথে আনার আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই কেবল ঈমান এনেছিল। কোন কোন বর্ণনামতে, মাত্র চল্লিশজন পুরুষ ও চল্লিশজন মহিলা তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছিল।

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম তার কওমকে দাওয়াত দিতে গিয়ে বললেন, তোমরা ঈমান এনে বিগত গুনাহর জন্য আল্লাহ তা‘আলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। যদি তোমরা ঈমান এনে খাঁটি দিলে তাওবা করো তা হলে এর বিনিময়ে তোমরা পরকালে তো মুক্তি পাবেই আবার দুনিয়ার যিন্দেগীতেও তোমাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহের দরজা খুলে দেয়া হবে। কিন্তু

হতভাগার দল নবীর এ কথার প্রতি কর্ণপাত করলো না। বরং ক্রমশ তারা নাফরমানীর দিকেই ধাবিত থেকে থাকল।

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম তাদের এক পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে দ্বিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। দ্বিতীয় পুরুষের পর তৃতীয় পুরুষের ব্যাপারেও এমনি আশাবাদী হয়ে তিনি কর্তব্যপালনে লিপ্ত থাকতেন। কারণ, তাদের পুরুষানুক্রমিক বয়স হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের বয়সের মতো এতটা লম্বা ছিল না। মুজিয়া হিসাবে তিনি লম্বা হায়াত পেয়েছিলেন।

কিন্তু যখন সেই সম্প্রদায়ের একের পর এক পুরুষ অতিক্রান্ত হতে থাকে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যৎ পুরুষ বিগত পুরুষ অপেক্ষা আরো বেশী অপরাধী প্রমাণিত হতে থাকে, তখন হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার দরবারে অভিযোগ করে বললেন,

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۖ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۖ

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বাড়িয়েছে। (সূরা নূহ, আয়াত: ৫- ৬)

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম আরো বললেন, হে পরওয়ারদিগার, দলবদ্ধভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে, প্রকাশ্যে ও সংগোপনে সর্বোতভাবে তাদের দীনের পথে আনার চেষ্টা করেছি। কখনও আযাবের ভয় দেখিয়েছি, কখনও জাল্লাতের নিয়ামতরাজির লোভ দেখিয়েছি। আরো বলেছি, ঈমান ও সৎকর্মের বরকতে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের দুনিয়াতেও সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন। আর পরকালে জান্নাতের মহানিয়ামত তো রয়েছেই। কখনও তাদের আপনার (আল্লাহ তা‘আলার) কুদরতের নিদর্শনাবলী পেশ করে বুঝিয়েছি। কিন্তু তারা কিছুতেই কর্ণপাত করলো না। বরং তারা আমাকে পথভ্রষ্ট মনে করলো।

এ সম্পর্কে এক আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

অর্থঃ তার সম্প্রদায়ের সরদাররা বললো, আমরা আপনাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৬০)

দাওয়াত প্রত্যাখ্যান

﴿مُلَ﴾ শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ের সরদার অথবা সমাজের মোড়ল বা নেতা। আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াতের জবাবে সম্প্রদায়ের প্রধানরা বললো, আমরা মনে করি, আপনি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে আছেন। কারণ, আপনি আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিতে বলছেন। কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি কুসংস্কার বৈ নয়। (নাউযুবিল্লাহ)।

এহেন পীড়াদায়ক ও কষ্টদায়ক কথাবার্তার জবাবে নূহ ‘আলাইহিস সালাম নবীসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা ধর্মপ্রচারক ও দীনের সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হয়ে রয়েছে। চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও রেগে যাওয়ার পরিবর্তে নরমভাবে তিনি সাদাসিধা ভাষায় তাদের

সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেন, যা এই আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ يَقُومُ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أُيْلِكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَ
أَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

অর্থঃ তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই। (তবে আমি তোমাদের মতো পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই।) বরং আমি বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে পয়গামবর। আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদের সদুপদেশ দিই আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জানো না। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৬১-৬২)

তিনি বললেন, এই পয়গামে আপনাদেরই মঙ্গল। এতে না আল্লাহর কোন লাভ আছে এবং না আমার কোন স্বার্থ আছে।

অতঃপর সেই মুশরীকরা হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত ও রিসালাতের উপর আপত্তি পেশ করলো,

مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا

অর্থঃ আমরা তো দেখি, আপনিও আমাদের মতো মানুষ। (সূরা হুদ, আয়াত: ২৭)

তারা বললো, আপনি আমাদের মতো পানাহার করেন, হাট-বাজারে যাতায়াত করেন, নিদ্রা যান, জাগ্রত হন, সবকিছু স্বাভাবিকভাবে আমাদের মতোই করেন। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও বার্তাবাহক বলে যেই অস্বাভাবিক দাবি তুলেছেন, তা আমরা কিরূপে মানতে পারি?

নবী মানুষের মধ্য থেকেই হবেন

তারা মনে করতো, আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলরূপে প্রেরিত হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সমীচীন নয়। বরং তাদের ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেন তার বিশেষত্ব সবাই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য হয়। এর উত্তরে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম যে সারগর্ভ বর্ণনা দিলেন, সত্যিই তা প্রণিধানযোগ্য। হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম বললেন,

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

অর্থঃ তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত যে, তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে তিনি তোমাদের ভীতিপ্রদর্শন করেন এবং যাতে তোমরা ভীত হও আর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও? অর্থাৎ তার ভীতি প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করো, যার ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাযিল হবে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৬৩)

একথা বলে তিনি বুঝালেন, মানুষকে রাসূল করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। প্রথমত তা আল্লাহ তা‘আলার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা রিসালাত দান করবেন। এতে কারো টু শব্দটি করার অধিকার নেই।

এ ছাড়া আসল ব্যাপার চিন্তা করলেও বোঝা যায়, সাধারণ মানুষের প্রতি রিসালাতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। ফেরেশতাদের দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

কারণ, রিসালাতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার নির্দেশাবলীর বিরোধিতা থেকে রক্ষা করা। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন মানুষের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি আদর্শ হয়ে তাদের দেখিয়ে দিবেন, মানবিক কামনা-বাসনার সাথে কীভাবে আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে। পক্ষান্তরে কোন ফেরেশতা এই দাওয়াত নিয়ে এলে এবং নিজের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরলে, মানুষের মাঝে বাহ্যত এই আপত্তি থেকে যেতে পারে যে, ফেরেশতারা মানবিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং নিদ্রা ও বিশ্রাম কিছুই নেই। এমতাবস্থায় আমরা তাদের মতো হবো কেমন করে?

কিন্তু নিজেদেরই এক ব্যক্তি যখন সব মানবিক প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবেন, তখন তাদের কোন অজুহাত থাকতে পারে না। এদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, **لِيُنذِرَكُمْ وَلِيَتَّقُوا** “যেন মানবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তির ভীতিপ্রদর্শনে প্রভাবিত হয়েই মানুষ ভীত ও মুতাকী হতে পারে।” কারো সত্তার প্রভাবে ভয় পেয়ে নয়। আর এটা ফেরেশতাদের দিয়ে সম্ভব নয়। কারণ, তখন তাদের সত্তার কারণেই মানুষ ভীত হয়ে পড়বে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা গেল, কোন ফেরেশতাকে নবীরূপে পাঠানো হয়নি কেন? কারণ, ফেরেশতাগণ অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সব দিক থেকেই তাদের সত্তা মানুষের তুলনায় বৈশিষ্ট্যময়। সুতরাং তাদের দেখলে তো ঈমান আনা বাধ্যতামূলক কাজ হতো। নবীগণের সাথে যেরূপ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা করা হয়েছে, ফেরেশতাগণের সামনে

সেরূপ আচরণ করার কার সাধ্য ছিল? অথচ কোন পরাক্রমশালী শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে ঈমান আনা হলে শরী‘আতের দৃষ্টিতে তা অগ্রহণযোগ্য। বরং গ্রহণযোগ্য হচ্ছে- ঈমান বিল গাইব অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার প্রবল পরাক্রমশীলতা প্রত্যক্ষ না করেই তার প্রতি ঈমান আনতে হবে। তা হলেই সেই ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে।

সুতরাং কোন ফেরেশতা নন, বরং উপযুক্ত মানুষই নবী হওয়ার যোগ্য। আর মানুষের নবী হিসাবে প্রেরিত হওয়া প্রমাণিত হবে- মুজিয়া দিয়ে।

সেজন্য নূহ ‘আলাইহিস সালাম তার কওমকে এ ব্যাপারে অবগত করানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ يَدَيْنَا مِّن رَّبٍّ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَصَبِّتْ عَلَيْكُمْ
أَنزِلْنَاهُمْ مِّنْهُمُهَا وَأَنزِلْ لَهَا كَرِهُونَ

অর্থঃ হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, আচ্ছা বলো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান থেকে রহমত (নবুওয়্যাত) দান করে থাকেন, অতঃপর তা তোমাদের বুঝে না আসে, তবে কি আমি তোমাদের গলদেশে জড়িয়ে দিব? অথচ তোমরা তা অবজ্ঞা করছো! (সূরা হুদ, আয়াত: ২৮)

উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ হওয়া নবুওয়্যাত ও রিসালাতের পরিপন্থী নয়। বরং একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, মানুষের নবী মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেন মানুষ অনায়াসে তার থেকে দীন শিক্ষা করতে পারে, তার আদর্শ ও তরীকা অনুসরণ করতে পারে।

বস্তুত মানুষ ও ফেরেশতার স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। যদি ফেরেশতাকে নবী হিসাবে পাঠানো হতো, তবে তার কাছে ধর্মীয় আদর্শ ও নিয়ম-নীতি শিক্ষা করা এবং তা পালন করা মানুষের জন্য অনেক কঠিন ও অসম্ভব হত। কেননা, ফেরেশতাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, নিদ্রা-তন্দ্রার প্রয়োজন হয় না, রিপূর তাড়না নেই। তারা মানবীয় প্রয়োজনাদির সম্মুখীন হন না। অতএব, তারা মানুষের দুর্বলতা উপলব্ধি করে যথাযথ তালিম-তরবিয়ত দিতে পারতেন না এবং তাদের পূর্ণ অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না।

তাই উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করলে আপনারাও অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবেন, মানুষ আল্লাহর নবী হতে পারবে না- এমন কোন কথা নেই। তবে আল্লাহর তরফ থেকে তার কাছে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে, যা দেখে মানুষ সহজেই বুঝতে পারবে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত পয়গামবর। আর এক্ষেত্রে সাধারণ লোকদের জন্য নবীর মুজিয়াই তার নবুওয়্যাতের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

এজন্যই হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমি আল্লাহর তরফ থেকে স্পষ্ট দলীল, অকাট্য প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। সুষ্ঠুভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে তোমরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ, তোমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ও অন্ধ করেছে। তাই তোমরা অস্বীকার করে বসেছো এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর অটল রয়েছো।

আর নবীগণের মাধ্যমে আগত আল্লাহর রহমত জোরজবরদস্তি করে মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জিনিস নয়- যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা সেইদিকে আগ্রহী না হয়।

এ কথা বলে নূহ ‘আলাইহিস সালাম এই ইঙ্গিত করলেন যে, ঈমানের অমূল্য দৌলত, যা আমি নিয়ে এসেছি, আমার যদি সাধ্য থাকতো, তবে তোমাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তোমাদের তা দিয়েই দিতাম। কিন্তু এটি আল্লাহর চিরন্তন বিধানের পরিপন্থী। এই মূল্যবান সম্পদ জোর করে কারো মাথায় তুলে দেওয়া যায় না।

এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে, জোরজবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান বানানো কোন নবীর যুগেই বৈধ ও অনুমোদিত ছিল না।

নূহ ‘আলাইহিস সালামের কওম আরো আপত্তি তুলল,

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بُادِي الرَّأْيِ

অর্থঃ আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন, তারা ছাড়া কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না। (সূরা হুদ, আয়াত: ২৭)

অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা দেখছি, আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আপনার অনুসরণকারী সবাই আমাদের সমাজের সবচেয়ে নিম্নমানের ও নির্বোধ লোক। তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন, ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখি না।

এই উক্তির মধ্যে দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো আপনার দাবি যদি সত্য ও সঠিক হতো, তা হলে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই সবার আগে তা গ্রহণ করতো। অথচ তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে। আর স্থূলবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির তা মেনে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনার প্রতি ঈমান আনলে আমরাও আহাম্মকরূপে পরিচিত হবো।



দ্বিতীয় দিক হলো, সমাজের নিকৃষ্ট, ইতর ও ছোটলোকগুলো আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। এখন আমরাও যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমরাও মুসলমান হিসাবে তাদের সমকক্ষ পরিগণিত হব। নামাযের কাতারে ও অন্যান্য মজলিসে তাদের সাথে বরাবরভাবে ওঠা-বসা করতে হবে। ফলে আমাদের অভিজাত্য ও কুলিনতার হানি হবে।

অতএব, এ কাজ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাদের ঈমান কবুল করাটা আমাদের ঈমানের পথে প্রতিবন্ধক। এমতাবস্থায় আপনি যদি ওই সকল গরীব-মিসকীনকে আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন, তা হলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনার কথা বিবেচনা করতে পারি।

হক অর্থসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত নয়

বাস্তবজ্ঞান বিবর্জিত কওমের জাহেল লোকেরা সামাজিক দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল, যাদের কাছে পার্থিব ধনসম্পদ ও বিত্ত-বৈভব ছিল না। মূলত এটা জাহেলী চিন্তাধারার ফল। বস্তুতপক্ষে ইজ্জত ও জিল্লতী ধনদৌলত ও বিদ্যা-বুদ্ধির অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, সম্পদ ও সম্মানের মোহ একটি নেশার মতো, যা অনেক সময় সত্য ও ন্যায়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সত্য ও ন্যায় থেকে পথচ্যুত করে দেয়। দরিদ্র ও দুর্বলদের সামনে যেহেতু এরূপ কোন অন্তরায় থাকে না, তাই তারাই সবার আগে সত্য ও ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে।

সেই জন্যই প্রাচীনকাল থেকে দরিদ্র-দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম কওমের লোকদের উক্ত মূর্ত্যাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করার জন্য প্রথমত বললেন, কারো ধনসম্পদের প্রতি নবী-রাসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তারা নিজেদের খেদমত ও তালীম-তাবলীগের বিনিময়ে কারো থেকে কোন পারিশ্রমিকও গ্রহণ করেন না। তাদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই দায়িত্বে। কাজেই তাদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র এক সমান। তাই আপনারা এমন অহেতুক আশঙ্কা পোষণ করবেন না যে, আমরা ধনসম্পদশালীরা যদি ঈমান আনি, তবে হয়তো আমাদের বিভূ-সম্পদে ভাগ বসানো হবে।

দ্বিতীয়তঃ তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, আপনারা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসাবে চাপ সৃষ্টি করছেন, যেন আমি দীন-দরিদ্র মুমিনদের তাড়িয়ে দিই। কিন্তু আমার দিয়ে তা কখনোই সম্ভব না। কারণ, আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহর নিকট তাদের উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদের তাড়িয়ে দেওয়া অন্যায় ও অসংগত।

তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের দৃষ্টিতে দরিদ্র মুমিনদের যেরূপ লাঞ্ছিত, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেখছো, আমি কিন্তু তোমাদের মতো একথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তাদের কোন কল্যাণ ও কামিয়াবী দান করবেন না। কারণ, প্রকৃত কল্যাণ ও কামিয়াবী ধনসম্পদ ও ক্ষমতার জোরে হাসিল করা যায় না। বরং মানুষের অন্তরের অবস্থা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তা দান করা হয়। আর এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই অবহিত আছেন যে, কল্যাণ

ও কামিয়াবী হাসিল করার জন্য কার অন্তর যোগ্য আর কার অন্তর অযোগ্য। অতএব তিনিই তার ফায়সালা করবেন।

পরিশেষে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম বললেন, তোমাদের মতো আমিও যদি দরিদ্র মুমিনদের লাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত মনে করি, তা হলে আমিও জালিমরূপে পরিগণিত হবো।

অবাধ্য জাতি এতোসব নসীহতের পরেও দাওয়াত কবুল করার পরিবর্তে উল্টো নূহ ‘আলাইহিস সালামের উপর নানাবিধ নির্যাতন চালাতে লাগল। হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে দীন প্রচার করতে গিয়ে কওমের লোকদের কাছে যে জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, তার কোন তুলনা নেই। কিন্তু তিনি তা নীরবেই সয়ে গেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে প্রায় এক হাজার বছরের লম্বা জীবন দান করার সাথে সাথে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তাভাবনা এবং নবীসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন যে, সারা জীবন তিনি অক্লান্তভাবে নিজ জাতিকে তাওহীদ ও সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু কওমের পক্ষ থেকে তিনি কঠিন নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হন। তার উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়। এমনকি তিনি অনেক সময় বেদীনের নির্যাতনের ফলে রক্তাক্ত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। অতঃপর হুঁশ ফিরে এলে দু‘আ করতেন, আয় আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা করুন। তাদের হিদায়াত দান করুন। তারা অজ্ঞ, মূর্খ। তারা জানে না, বোঝে না।

এব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, নূহ ‘আলাইহিস সালাম বেদীন সম্প্রদায়ের প্রহারের চোটে অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাকে একটি কন্ডলে জড়িয়ে ঘরে রেখে যেত। তারা মনে করতো, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু পরের দিন যখন চেতনা ফিরে আসত, তখন সম্প্রদায়কে আবার আল্লাহ তা‘আলার দিকে দাওয়াত দিতেন এবং দীনের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. উবায়দ ইবনে আমর লাইসী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এই সংবাদ পেয়েছেন যে, হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় তার গলা টিপে ধরতো। ফলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। আবার জ্ঞান ফিরে এলে, তিনি এই দু‘আ করতেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। কারণ, ওরা অবুঝ।

এই কাফেররা নিজেরা তো উৎপীড়ন করতোই, উপরন্তু জনপদের বদমাইশ ও দুষ্টলোকদেরও নূহ ‘আলাইহিস সালামের পিছনে লেলিয়ে দিতো।

পরিশেষে আল্লাহ তা‘আলা হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে সান্তনা দিয়ে ওহী নাযিল করলেন, আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া নতুন করে কেউ ঈমান আনবে না। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে সে কথাই বর্ণনা করা হয়েছে,

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

অর্থঃ নুহের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হলো, যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবে না। অতএব, তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না। (সূরা হুদ, আয়াত: ৩৬)

আল্লাহ তা‘আলা নূহ ‘আলাইহিস সালামকে সান্তনা দিলেন, ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে গেছে। তাই আপনি তাদের জন্য অনুশোচনা করবেন না। তারা আপনার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে, আপনি তাতে দুশ্চিন্তায় ভুগবেন না। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-অস্থিরতা থাকে। অপরদিকে নিরাশ হওয়ার মধ্যেও একপ্রকার শান্তি রয়েছে। অতএব, আপনি তাদের সংশোধনের আশা ছেড়ে দিন।

তখন নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের মুখে তার কওম সম্পর্কে এ কথা উচ্চারিত হয়েছিল,

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক, এখন এই কাফেরদের মধ্যে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী কাউকে রাখবেন না। যদি তাদের রাখেন, তবে তারা আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করে দিবে এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধররাও অবাধ্য ও কাফের হবে। (সূরা নূহ, আয়াত: ২৬-২৭)

কওমের নুহের প্রতি আল্লাহর আযাব

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের এই দু‘আ কবুল হলো। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি ওহী পাঠালেন, অচিরেই আমি এ জাতির উপরে মহাপ্লাবন আকারে আযাব অবতীর্ণ করবো। কাজেই আপনি একটি নৌকা তৈরি করুন, যার মধ্যে আপনার পরিবার, অনুসারীবৃন্দ ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও উপকরণসহ স্থানসংকুলান হয়। যাতে তাতে আরোহণ করে প্লাবনের দিনগুলো নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারেন। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۝

অর্থঃ আপনি আমার দৃশ্যপটে এবং আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরি করুন। আর পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে যাবে। (সূরা হুদ, আয়াত: ৩৭)

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে যখন নৌকা তৈরীর নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, বানাতেও জানতেন না। তাই উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন,

وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

অর্থঃ আপনি নৌকা তৈরি করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও ওহী অনুসারে।

হাদীস শরীফে আছে, নৌকা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও নির্মাণ-কৌশল ওহীর মাধ্যমে হযরত জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে শিক্ষা

দিয়েছিলেন। হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম শাল কাঠ দিয়ে উক্ত নৌকা তৈরি করেছিলেন।

আল্লাহ তা‘আলা হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে নৌকার নির্মাণ-পদ্ধতি ও কলা-কৌশল শিক্ষাদানের সাথে সাথে জানিয়ে দেন, আপনার কওমের উপর আমার আযাব এক মহাপ্লাবন আকারে আসবে। তারা সবাই তাতে ডুবে মরবে। তখন আপনি স্নেহপরবশ হয়ে তাদের জন্য কোন দু‘আ বা সুপারিশ যেন না করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নৌকাটি তিনশ গজ লম্বা, পঞ্চাশ গজ প্রস্থ, ত্রিশ গজ উচ্চ ও তিনতলাবিশিষ্ট ছিল। তার দুই পাশে অনেকগুলো জানালা ছিল। এভাবে ওহীর মাধ্যমে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের হাতে নৌকা ও জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি সাধিত হয়ে চলেছে।

আল্লাহর আদেশক্রমে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম যখন নৌকা নির্মাণকাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তির তাকে জিজ্ঞেস করতো, আপনি কী করছেন? তিনি উত্তর দিতেন, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে। তাই নৌকা তৈরি করছি। তখন তারা বলত, “এখানে তো পান করার মতো পানিও দুর্লভ। তা হলে আপনি কি ডাঙ্গা দিয়ে নৌকা চালাবার ফিকিরে আছেন?” হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “যদিও আজ তোমরা আমাদের নিয়ে উপহাস করছো, কিন্তু মনে রাখবে, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমরাও তোমাদের নিয়ে উপহাসের প্রয়াস পাবো। অর্থাৎ



তখন তোমরাই উপহাসের পাত্র হবে। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,

وَيَضَعُ الْقُلُوبَ عَلَيْكَ وَمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝

অর্থঃ তিনি নৌকা তৈরি করতে লাগলেন। তার কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পাশ দিয়ে যেত, তখন তাকে বিদ্রূপ করতো। উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের নিয়ে উপহাস করো, তবে মনে রাখবে, তোমরা যেমন উপহাস করছো, আমরাও অনুরূপ তোমাদের নিয়ে একদিন উপহাস করবো। (সূরা হুদ, আয়াত: ৩৮)

বস্তুত নবীগণ কখনও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী। বরং কাউকে নিয়ে বিদ্রূপ করা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

অর্থঃ এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উপহাস করবে না। হতে পারে, উপহাসকারীদের চেয়ে যাদের উপহাস করা হচ্ছে (আল্লাহর কাছে) তারাই শ্রেষ্ঠতর। (সূরা হুজরাত, আয়াত: ১১)

সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াতে উপহাস প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। এখানে এর অর্থ হলো কাজের মাধ্যমে জবাব দেওয়া। সেমতে “আমরা তোমাদের নিয়ে উপহাস করবো” বাক্যের অর্থ

হলো “তোমরা যখন আযাবে পতিত হবে তখন আমরা তোমাদের বলবো, এটা তোমাদের উপহাসের মর্মান্তিক পরিণতি।”

যেভাবে আযাব এলো

পরিশেষে যখন আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালা কার্যকর করার সময় হলো, তখন প্লাবনের প্রথম আলামত হিসাবে উনুন বা তন্দুর থেকে পানি উথলে উঠতে লাগল। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ

অর্থঃ এমনকি যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছুলো এবং ভূপৃষ্ঠ বা তন্দুর উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলো।

التَّنُّورُ শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠকেও تَنْوُر বলা হয়, রুটি পাকানোর তন্দুরকেও এবং যমিনের উঁচু অংশকেও تَنْوُر বলে। তাই তাফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে, উল্লিখিত আয়াতে تَنْوُر অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ কেউ বলেন, تَنْوُر বলে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের রুটি পাকানোর তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ার “আইনে অরদাহ” (عين وردة) নামক স্থানে অবস্থিত রয়েছে। উক্ত তন্দুরের ভিতর থেকেই সর্বপ্রথম পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ কেউ বলেন, এখানে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা কুফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল।

আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, تَنْوُر শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও আসলে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, প্লাবন যখন

শুরু হয়েছিল, তখন রুটি পাকানোর তন্দুর থেকেও পানি উঠেছে, সমতল ভূমি থেকেও উঠেছে, আর উঁচু যমিন থেকেও পানি উঠেছে। তেমনিভাবে সিরিয়ায় আইনে অরদার তন্দুর থেকেও পানি উঠেছে এবং কুফার তন্দুর থেকেও উঠেছে। এভাবে অল্প সময়েই সব একাকার হয়ে গিয়েছে।

তুফান শুরু হওয়ামাত্র হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে হুকুম দেওয়া হলো মুমিন পরিবার ও পৃথিবীর সকল কিছু জোড়া জোড়া করে নৌকায় তুলে নিতে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

قُلْنَا اٰخِذْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗ اِلَّا قَلِيْلٌ

অর্থঃ আমি নূহ ‘আলাইহিস সালামকে বললাম, সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং যাদের উপরে আগেই হুকুম হয়ে গিয়েছে, তাদের বাদ দিয়ে আপনার পরিবার-পরিজন ও সকল ঈমানদারকে নৌকায় তুলে নিন। বস্তুত অতি অল্প সংখ্যক লোকই তার সাথে ঈমান এনেছিল। (সূরা হুদ, আয়াত: ৪০)

আল্লাহ তা‘আলার হুকুম মোতাবেক হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম সকল মুমিনদের নৌকায় আরোহণ করালেন। আর প্রয়োজনীয় ঘোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণীর এক এক জোড়া নৌকায় তুলে নিলেন।

এর পরেই তার কাফের কওমের উপর মহাপ্লাবনের শাস্তি শুরু হয়ে গেল। সেদিনটি ছিল রজব মাসের দুই তারিখ। সেসময় আকাশ থেকে মুষলধারায় গরম বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগলো এবং নিচ থেকে ঠাণ্ডা পানির স্রোত অবিরলধারায় উৎসারিত হতে লাগলো। এসম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا مُنْهَبٍ ۝ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا

অর্থঃ আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের দরজা খুলে দিলাম এবং যমিনকে ঝরণার মতো প্রবহমান করলাম। (সূরা কামার, আয়াত: ১১)

কোন কোন বর্ণনা মতে, এমতাবস্থায় একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তুফান চলতে থাকে। তখন পানিতে সমস্ত জগত থৈ থৈ করতে লাগল। সবকিছু পানির নিচে তলিয়ে গেল। এভাবেই আল্লাহ তা‘আলা নূহ ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে যমিন থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। আর হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামসহ কিশতীতে অর্থাৎ নৌকাতে আরোহণকারী মুমিনদের আল্লাহ তা‘আলা নিজ কুদরতে হেফাজত করলেন।

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তাদের মোট সংখ্যা ছিল আশিজন, যাদের মধ্যে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াকুব এবং তাদের তিনজন স্ত্রীও ছিল।

নূহ ‘আলাইহিস সালামের চতুর্থ পুত্র কিনআন কাফেরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরেছিল। হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের পরিজনবর্গ যখন কিশতীতে আরোহণ করলো, কিন্তু কিনআন বাইরে রয়ে গেল, তখন পিতৃসুলভ স্নেহবশতঃ হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম তাকে ডাক দিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝

অর্থঃ নূহ ‘আলাইহিস সালাম তার পুত্রকে ডাক দিলেন। সে সরে ছিল। (তিনি বললেন,) প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে আরোহণ করো এবং কাফেরদের সাথে থেকো না। (সূরা হুদ, আয়াত: ৪২)

কাফের ও দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলের যোগসাজস ছিল এবং সে নিজেও কাফের ছিল। কিন্তু হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম তার কাফের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। তাই তাকে কিশতীতে চড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

অবশ্য যদি তিনি তার কুফরী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে সাব্যস্ত হয় তা হলে তার আহ্বানের মর্ম হবে, তিনি তাকে নৌকায় আরোহণের পূর্বশর্ত হিসাবে কুফরী থেকে তাওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং কাফেরদের সঙ্গ ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু হতভাগা কিনআন তখনও প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে যা বলেছিল এবং নূহ ‘আলাইহিস সালাম যে জবাব দিয়েছিলেন এবং পরিণাম কী হয়েছিল, সে সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ سَاوِئِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ
وَخَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُهْرَقِينَ ۝

অর্থঃ সে (কিনআন) বললো, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নিবো, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। নূহ ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই, একমাত্র তিনি (আল্লাহ) যাকে রক্ষা করবেন,

শুধু সে রক্ষা পাবে। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আঁড়াল হয়ে দাঁড়াল। ফলে সে ডুবে গেল। (সূরা হুদ, আয়াত: ৪৩)

বলাবাহুল্য, দূর থেকে পিতা-পুত্রের কথোপকথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করলো এবং কিনআনকে চিরতরে নিমজ্জিত করলো।

ঐতিহাসিক-সূত্রে জানা যায়, হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের সময় যে তুফান হয়েছিল ঐ তুফানের এক একটি ঢেউ বড় বড় পাহাড়ের চূড়া থেকে ১৫ গজ এবং কোন কোন বর্ণনামতে চল্লিশ গজ উচ্চতাবিশিষ্ট ছিল।

লম্বাসময় পর আল্লাহর হুকুমে প্লাবন সমাপ্ত হলো এবং জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়লো। আর বলে দেওয়া হলো, কাফেররা চিরকালের জন্য আল্লাহর রহমত থেকে বিদূরিত হয়েছে।

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের কওমের ধ্বংসের ব্যাপারে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُونَا ۖ

অর্থঃ তারা তাদের গুনাহ (অর্থাৎ কুফর ও শিরকের কারণে) পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে, অতঃপর আগুনে প্রবিষ্ট হয়েছে। (সূরা নূহ, আয়াত: ২৫)

পানিতে ডুবা ও আগুনে প্রবেশ করা বাহ্যত পরস্পর-বিরোধী আযাব হলেও আল্লাহর কুদরতের কাছে এটা অবাস্তব নয়। বলাবাহুল্য, এখানে আগুন দিয়ে জাহান্নামের আগুন বোঝানো হয়নি। কেননা, তাতে তো কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পরই

প্রবেশ করবে। বরং এটা ছিল বরযখী আগুন। কুরআনে কারীম তাদের এই বরযখী আগুনে প্রবিষ্ট হওয়ার খবর দিয়েছে।

ঘটনা থেকে শিক্ষা

কুরআন মজীদে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

১. আগের সকল পয়গামবরের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল এক ও অভিন্ন। তা হলো আল্লাহর ইবাদত ও তাওহীদের দাওয়াত।

২. আল্লাহ তা‘আলা তার পয়গামবরগণের সাহায্য ও সমর্থন কিভাবে চমৎকারভাবে করেন, তার দৃষ্টান্ত এখানে রয়েছে যে, পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়া পর্যন্ত উঁচু প্লাবনের মধ্যেও তাদের নিরাপত্তার কোন সমস্যা হয়নি।

৩. পয়গামবরগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা আল্লাহর আযাব ডেকে আনারই নামান্তর। পূর্ববর্তী উম্মতরা যেমন নবীদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার কারণে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, পরবর্তী বা একালেও এরূপ করলে, তেমনিভাবে আযাব ও গজবে নিপতিত হওয়া অবশ্যস্তাবী।

সুতরাং হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের দীনী দাওয়াতী কর্মতৎপরতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের দীনের দাওয়াত ও মেহনতের সাথে নিরলসভাবে ব্যাপৃত হওয়া, সেই সাথে নূহ ‘আলাইহিস সালামের কওমের নাফরমানীর পরিণাম দেখে ভীত হয়ে আল্লাহর ইবাদতের দিকে ও দীনের প্রতি এগিয়ে আসা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।

আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করেন। আমীন।



হযরত হুদ 'আলাইহিস সালাম

কওমে 'আদ

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com



সূচীপত্র

কওমে ‘আদের প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি

কওমে ‘আদের পরিচয়

কওমে ‘আদের শক্তি ও সমৃদ্ধি

হুদ ‘আলাইহিস সালামের আহ্বান

দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান

কওমে ‘আদের প্রতি আল্লাহর আযাব

মূর্তির নিকট মানুষের প্রার্থনা

যেভাবে আযাব এলো

নাফরমানীর পরিণতি

بِسْمِهِ تَعَالَى

কওমে ‘আদের প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَالِى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

অর্থঃ আমি ‘আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছি। তিনি তাদের বলেন, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমরা তো আল্লাহর সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে মিথ্যা আরোপ করছো। হে আমার জাতি, আমি দাওয়াতী কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমার বিনিময় কেবল তাঁরই কাছে, যিনি আমাকে পয়দা করেছেন। তবু তোমরা কি বুঝ না? (সূরা হুদ, আয়াত: ৫০-৫১)

কুরআনে কারীমের সূরা হুদের উল্লিখিত ৫০ ও ৫১ নং আয়াতে এবং এরপর থেকে ৬০ নং আয়াত পর্যন্ত মোট দশটি আয়াতে, বিশিষ্ট পয়গামবর হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালামের নামে এ সূরার নামকরণ হয়েছে।

যদিও এই সূরায় সাতজন পয়গামবরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালামের নামে সূরাটির নামকরণ দিয়ে বোঝা যায়, এখানে তার ঘটনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।



আল্লাহ তা‘আলা হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালামকে ‘আদ জাতির নিকট নবীরূপে প্রেরণ করেন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে ‘আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। এদের সবাই যেমন ছিল সাহসী তেমনই ছিল শক্তিশালী। সাহস ও শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তারা তাদের সাধারণ চলাফেরার পথে প্রসিদ্ধ টিলার উপর উঁচু উঁচু মজবুত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করতো। অথচ বাস্তব জীবনে এর কোন প্রয়োজন ছিল না। নিম্নোক্ত আয়াতে এই কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

اَتَّبِعُونَ كُلَّ رِجٍّ اِيَّةٍ تَعْبَثُونَ

অর্থঃ তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চস্থানে অনর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছো? (সূরা শুআরা, আয়াত: ১২৮)

হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাকে اَخَاهُمْ هُوْدًا (তাদের ভাই হুদ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কওমে ‘আদের পরিচয়

‘আদ প্রকৃতপক্ষে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং তার পুত্র সামের বংশধরেরই এক বাদশার নাম। অতঃপর তার বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় ‘আদ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

কুরআন মজীদে ‘আদের সাথে কোথাও اَدَوٰى (প্রথম ‘আদ) এবং কোথাও اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (স্তম্ভধারী ইরাম) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এতে বোঝা যায়, ‘আদ সম্প্রদায়কে ইরামও বলা হয় এবং প্রথম ‘আদের বিপরীতে কোন দ্বিতীয় ‘আদও রয়েছে।

এ সম্পর্কে তাফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, ‘আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব আসে তখন তাদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কায় গমন করেছিল। ফলে তারা আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। তাদের দ্বিতীয় ‘আদ বলা হয়। (বয়ানুল কুরআন)

তবে অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি হলো, ‘আদের দাদার নাম ইরাম। তার এক পুত্র আউস, তার বংশধররাই ‘আদ। তাদের “প্রথম ‘আদ” বলা হয়। আর তার অপর পুত্র জাসু-এর ছেলে হচ্ছে সামূদ। তার বংশধরকে “দ্বিতীয় ‘আদ” বলা হয়।

এই বক্তব্যের সারমর্ম হলো, ‘আদ ও সামূদ উভয়ই ইরামের দুই শাখা। এক শাখাকে প্রথম ‘আদ এবং অপর শাখাকে সামূদ অথবা দ্বিতীয় ‘আদ বলা হয়। ইরাম শব্দটি ‘আদ ও সামূদ উভয় সম্প্রদায়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

‘আদ সম্প্রদায়ের তেরটি পরিবার ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে ইয়ামানের হাযরামাউত পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। হাযরামাউত এলাকার বালুর পাহাড়সমূহকে আহকাফ বলা হয়। সেই আহকাফ নামক স্থানেই তাদের বেশির ভাগের বসবাস ছিল।

কওমে ‘আদের শক্তি ও সমৃদ্ধি

‘আদ জাতির ক্ষেত-খামারগুলো অত্যন্ত উর্বর ও শস্য-শ্যামল ছিল। সেখানে সবরকম ফলের বাগান ছিল। তাদের ধনসম্পদ, বাগ-বাগিচা, বার্নার পানি, ফল-ফলাদি ও খাদ্য-শস্য দিয়ে

তারা ছিল সমৃদ্ধশালী। আদন থেকে আম্মান পর্যন্ত তাদের ঘোড়া ও উটে পরিপূর্ণ ছিল।

শারীরিক দিক দিয়েও তারা ছিল সুঠামদেহী ও লম্বাকায়। নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضَاطَةً

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের লম্বাকায় করে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা তাদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির দরুন এসব নিয়ামত তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। তারা শক্তি-মদে মত্ত হয়ে দাস্তিকতার সাথে বলতে লাগল,

مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

অর্থঃ কে আছে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী?

এমনি করে তারা নৈতিক অধঃপতনের শিকার হলো এবং যে বিশ্ব প্রতিপালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল, তারা তাকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করলো।

হুদ ‘আলাইহিস সালামের আহ্বান

হুদ ‘আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে তাওহীদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন ছেড়ে দিয়ে ন্যায় ও সুবিচারের পথে চলতে দাওয়াত দিলেন।

হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম যে দীনী দাওয়াত পেশ করেন, তার মধ্যে তিনটি মূল বিষয় ছিল। প্রথমতঃ তাওহীদের আহ্বান এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যকোনো সত্তা বা শক্তিকে ইবাদত-উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতুলতামাত্র। দ্বিতীয়তঃ আমি যে

তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি এবং যেজন্য জীবন উৎসর্গ করেছি, তোমরা চিন্তা করে দেখ, আমি এমন কষ্ট-ক্লেশের পথ কোন্ স্বার্থে অবলম্বন করেছি? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্তুগত কোন ফায়দা বা স্বার্থও হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহর নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, তা হলে তোমাদের দাওয়াত দিতে এবং সংশোধন করতে গিয়ে এত কষ্ট-ক্লেশ বরণ করার কী প্রয়োজন ছিল? তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরী, শিরকী ইত্যাদি যত গুনাহ করেছ, সেসব থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐ সব গুনাহ থেকে তাওবা করো। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

অর্থঃ হে আমার কওম, তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো।

হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম তাদের আশ্বাস বাণী শুনিয়ে বললেন, যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তাওবা ও ইসতিগফার করতে পারো, (তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই), অধিকন্তু দুনিয়াতেও এর বহু উপকারিতা দেখতে পাবে।

দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান

হুদ ‘আলাইহিস সালামের আহ্বানের জবাবে তার দেশবাসী মূর্খসুলভ উত্তর দিল, যা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ তারা বললো, হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আসনি। আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের পূজা-অর্চনা বর্জন করতে পারি না। আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই।

তারা আরো বললো, আমরা মনে করি, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। তাই তুমি এমন অসংলগ্ন কথা বলছো।

হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম পয়গামবরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে যে জবাব দেন, সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিবরণ হচ্ছে,

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّهِ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدْ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ○ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ ○ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ○ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ○ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

অর্থঃ হুদ ‘আলাইহিস সালাম বললেন, (তোমরা যদি আমার কথা না মানো, তবে শোনো) আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি আর তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, (এক আল্লাহ ছাড়া) তোমাদের সব কাল্পনিক দেবতাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এখন আল্লাহ ছাড়া তোমরা (ও তোমাদের দেবতা) সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করো, এক্ষেত্রে আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না। (এত বড় কথা আমি এজন্য বলছি যে,) আমি আল্লাহ তা‘আলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যা তার পূর্ণ আওতাধীন নয়। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা সরল সঠিক পথে রয়েছেন। (সূরা হুদ, আয়াত: ৫৪-৫৬)

অর্থাৎ যে সরল সঠিক পথে চলবে, সে আল্লাহকে পাবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে সাহায্য করবেন।

সমগ্র জাতির মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘদিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ তার একটি লোমও স্পর্শ করতে পারল না। বস্তুত এটা হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালামের একটি মুজিয়া। এর দ্বারা একে তো তাদের একথার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি কোন প্রমাণ বা মুজিয়া প্রদর্শন করেননি। দ্বিতীয়ত তারা যে বলতো আমাদের কোন কোন দেবতা আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত করে দিয়েছে, তাও বাতিল করা হয়েছে। কারণ, দেব-দেবীর যদি কোন ক্ষমতা থাকতো, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা নিষ্ক্রিয় থাকতো না।

অতঃপর হুদ ‘আলাইহিস সালাম তার কওমকে বলেন,

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ

অর্থঃ তোমরা যদি এভাবে সত্য প্রত্যাখ্যান করতে থাকো, তবে জেনে রাখো, যে পয়গাম পৌঁছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

(সূরা হুদ, আয়াত: ৫৭)

কওমে ‘আদের প্রতি আল্লাহর আযাব

হুদ ‘আলাইহিস সালাম তাদের জানালেন, যথাযথভাবে আল্লাহ তা‘আলার পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছাবার পরও যখন তোমরা ঈমান আনছো না, তখন তোমাদের এমন কাজের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব ও গজব আপতিত হবে। তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে



আর আমার পরওয়ারদিগার তোমাদের যায়গায় অন্য জাতি পাঠিয়ে এই পৃথিবী আবাদ করবেন।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালামের কোন কথায় কর্ণপাত না করে বললো,

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضَّتْ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعَّظِينَ ۝

অর্থঃ তুমি আমাদের নসীহত করো কিংবা না করো, আমরা কোন অবস্থাতেই আমাদের মত ও পথ ত্যাগ করবো না। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৩৬)

একথা বলে তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অটল-অবিচল রইল।

এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম এই আযাব নাযিল হলো যে, তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকলো। এতে তাদের শস্যক্ষেতসমূহ শুকনো বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেল এবং বাগান ও শস্য জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। কিন্তু এর পরেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করলো না।

অতঃপর আট দিন ও সাত রাত পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব আপতিত হলো। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَأَمَّا عَادُ فَاهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ هُسُومًا ۖ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۖ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۚ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۝

অর্থঃ ‘আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচণ্ড ঝড়বায়ু দিয়ে। আল্লাহ তা‘আলা তা প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত অবিরাম। যেন আপনি তাদের দেখছেন, তারা অসার খেজুরকাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে আছে। আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছেন কি? (সূরা আল-হাক্বাহ, আয়াত: ৬-৮)

এই আযাবের ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগ-বাগিচা ও দালান-কোঠা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। মানুষ ও জীব-জন্তু শূন্যে উড়তে লাগল। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকলো এবং মরতে থাকলো।

প্রথম দিকে তারা আল্লাহর গজব আসতে দেখে মজবুত কেল্লায় সংরক্ষিত ঘরে আশ্রয় নিলো। আবার অনেকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে শরীরের অর্ধেকাংশ ঢুকিয়ে রাখলো, যাতে প্রচণ্ড ঝড় থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু তাদের কোন প্রচেষ্টাই তাদের আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ

অর্থঃ আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে যায়, তখন আর কোন অবকাশ থাকে না।

আল্লাহ তা‘আলা এভাবে ‘আদ জাতিকে পৃথিবীর যমিন থেকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

মূর্তির নিকট মানুষের প্রার্থনা

এক বর্ণনায় এসেছে, ‘আদ জাতির উপর তিন বছর বৃষ্টি বন্ধ থাকার পরে তারা তাদের কিছুসংখ্যক লোককে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

করতে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দিল। বাইতুল্লাহ শরীফে তখন অনেক দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপিত ছিল। তারা তখন এসব মূর্তির কাছেই নানান প্রার্থনা জানালো। কিন্তু নিজীব মূর্তির কোন কিছু করারই তো ক্ষমতা নেই। তাই তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

মক্কা গমনকারীদের মধ্যে প্রথম দলে ছয় ব্যক্তি ছিল। তাদের মধ্যে দুজন ছিল তাওহীদে বিশ্বাসী। অবশ্য তারা তাদের ঈমানের কথা গোপন রেখেছিল। তাদের একজনের নাম মাজিদ এবং অপরজনের নাম ছিল লাকিম।

এই দলের পরে আরেকটি দল মক্কায় গিয়েছিল। তাদের লোকসংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। তারা সবাই ছিল বেঈমান কাফের। এই দলের নেতার নাম ছিল কীল ইবনে ইনায।

মাজিদ উক্ত নেতাকে বললো, তোমরা পানির জন্য দু‘আ করতে এসেছ, কিন্তু যতক্ষণ না তোমরা হুদ ‘আলাইহিস সালাম ও তার রবের প্রতি ঈমান আনছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের দু‘আ কবুল হবে না বলে আমার প্রবল ধারণা। তার কথা শুনে সবাই তাকে হুদ ‘আলাইহিস সালামের অনুসারী মনে করে খুবই তিরস্কার ও ভৎসনা করলো।

তখন মাজিদ ও লাকিম উভয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলো, হে পরওয়ারদিগার, এরা কখনোই আপনার রহমতের প্রতি আস্তা আনবে না। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের দু‘আ কবুল করুন। তখন আল্লাহর দরবার থেকে অর্থাৎ গায়েব থেকে আওয়াজ এলো, তোমরা আমার কাছে কী প্রার্থনা করছো? তখন মাজিদ এই দু‘আ করলো, হে প্রভু, আমি যেন কোনদিন অনাহারে না থাকি। আর লাকিম দু‘আ করলো, হে



পরওয়ারদিগার, তুমি আমার আয়ু তিন হাজার বছর লম্বা করে দাও। আল্লাহর তরফ থেকে জবাব এলো, তোমাদের উভয়ের দু‘আ কবুল করা হলো।

অপরদিকে কীল ইবনে ইনায় তার সত্তর হাজার সঙ্গী নিয়ে একত্রে প্রার্থনা করে বললো, হে প্রভু, আমাদের মধ্যে কখনো কারো রোগব্যাদি হয়নি যে, তোমার কাছে তার আরোগ্য প্রার্থনা করবো। আর আমি নিজেও কখনও কোন বিপদে পড়িনি যে, বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাবো। আমরা সবাই শুধু ‘আদ জাতির জন্য তোমার কাছে বৃষ্টি কামনা করতে এসেছি।

যেভাবে আযাব এলো

তারা এভাবে প্রার্থনা জানানোর পরে আকাশের কোণে সাদা, কালো, লাল- এই তিন বর্ণের মেঘ আত্মপ্রকাশ করলো। মেঘের মধ্য থেকে অদৃশ্য আওয়াজ শোনা গেল, হে কীল, এই তিন প্রকার মেঘ থেকে তুমি কোন্ প্রকার চাও? কীল জানতো, সাদা ও লাল মেঘে বৃষ্টি হয় না। তাই সে কাল মেঘটিই প্রার্থনা করলো।

তারপর তারা বাইতুল্লাহ থেকে দেশে ফিরে এসে, কালো মেঘটিও তাদের সাথে সাথে চলে এলো। কাফেররা তখন হুদ ‘আলাইহিস সালামকে বিদ্রোপ করে বলতে লাগল, হে হুদ, তুমি বলেছিলে, আমাদের প্রতি তোমার আল্লাহর গজব নাযিল হবে। কিন্তু এখন কী দেখছ? শীঘ্রই বৃষ্টিপাত হয়ে আমাদের শস্যক্ষেত সুজলা-সুফলা করে দিবে। দেশে শান্তি ফিরে আসবে। দুর্ভিক্ষ দূর হবে।

হুদ ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আচ্ছা, তোমরা একটু ধৈর্যধারণ কর। এই কথা বলে তিনি তার ঈমানদার উম্মতদের অতি তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করতে বললেন।

অতঃপর কওমে ‘আদের উপর আল্লাহর কঠিন আযাব মারাত্মক বৃষ্টি নাযিল হলো। সেই আযাব এতই ভয়ংকর ছিল যে, কাফেররা কোন রকম উপায়ান্তর না দেখে প্রায় সাত লক্ষ লোক পাহাড়ের গর্তগুলোতে আত্মগোপন করে বলতে লাগল, এখন আর আসন্ন ঝড়-তুফান আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ভীষণ বজ্রধ্বনিসহ লাগাতার আটদিন এমন প্রবল ঝড়-তুফান প্রবাহিত হলো যে, দাস্তিক ‘আদ জাতির লোকদের দস্ত ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল এবং তারাও ধ্বংস হলো।

তাদের নির্ভীক মজবুত প্রাসাদগুলো প্রথম ঝাপটায়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দ্বিতীয়বারে তাদের আশ্রয়স্থল পাহাড়ের গুহাগুলোয় ঝড়বায়ু প্রবেশ করে তাদের সবাইকে বাইরে উড়িয়ে এনে এমনভাবে আছাড় মারলো যে, সাত লক্ষ মানুষের দেহ যেন উৎপাটিত খেজুর গাছের মতো নিস্প্রাণ অবস্থায় যমিনে পড়ে রইলো। অতঃপর প্রবল বায়ুর তাণ্ডব প্রচণ্ড ধুলাবালি উড়িয়ে সেসব লাশের উপরে এমনভাবে নিয়ে ফেলল, তার মধ্যে তারা চাপা পড়ে গেল।

সূরা আলহাক্কাহর বর্ণনা দিয়ে বোঝা যায়, ‘আদ জাতি ঝড়-তুফানের কবলে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু সূরা মুমিনুনের আয়াতে বলা হয়েছে,

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

অর্থঃ একটি বিকট শব্দ তাদের পাকড়াও করলো। (সূরা মুমিনুন, আয়াত: ৪১)

এই আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, ‘আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আযাবও নাযিল হয়েছিল।

নাফরমানীর পরিণতি

এই উভয় মতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, উভয় প্রকার আযাবই নাযিল হয়েছিল। প্রথমে ঝড়-তুফান শুরু হয়েছিল। তারপর চরম পর্যায়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছিল। (তাফসীরে মা‘রিফুল কুরআন)

এভাবেই ‘আদ জাতি আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে কুরআনে কারীমে সূরা আরাফে বলা হয়েছে,

وَقَطَعْنَا دَابَّالَّذِينَ كَذَّبُوا

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৭২)

এর মর্ম কোন কোন তাফসীরকার এই বর্ণনা করেছেন যে, তখন তাদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল, তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ভবিষ্যতের জন্য ‘আদ জাতিকে নির্বংশ করে দেওয়া হয়েছে।

হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালামের আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে যখন ‘আদ জাতির উপর আযাব নাযিল হলো তখন হুদ ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীরা একটি কুঁড়েঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে লুটিয়ে



পড়লেও এ কুঁড়েঘরটিতে বাতাস খুব সুস্বাদু পরিমাণে প্রবেশ করতো। হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীরা ঠিক আযাবের মুহূর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে বসে থাকেন। তাদের কোন কষ্টই হয়নি।

নাফরমানরা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর হুদ ‘আলাইহিস সালাম মক্কা মুকাররমায় চলে যান এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। (আল বাহরুল মুহীত)

অবশ্য হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম কোথায় ইন্তেকাল করেছেন- এব্যাপারে আহলে আরবদের মতবিরোধ রয়েছে। হাযরামাউতের অধিবাসীগণ দাবি করেন, ‘আদ জাতির ধ্বংসের পরে হুদ ‘আলাইহিস সালাম হাযরামাউত শহরে হিজরত করে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আর ফিলিস্তিনবাসীরা দাবি করেন, তিনি ফিলিস্তিনে হিজরত করে এসে সেখানে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালামের হাযরামাউতে ওফাত পাওয়ার বর্ণনাটিই সর্বাধিক বিশ্বস্ত ও যুক্তিযুক্ত। কেননা কওমে ‘আদের আবাসস্থল হাযরামাউতের কাছাকাছি ছিল। তাই স্বভাবতই প্রতীয়মান হয়, ‘আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পরে হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম নিকটবর্তী কোন বসতিতে বসবাস করেছেন এবং সেখানেই ওফাত পেয়েছেন। আর সেটা হলো হাযরামাউত শহর।

কুরআনে কারীমে বর্ণিত বিগত যামানার উম্মতদের এসব ঘটনা থেকে আমাদের নসীহত হাসিল করা উচিত এবং আল্লাহর



নাফরমানীর ভয়াবহ শাস্তির কথা চিন্তা করে আমাদের শরী‘আতের আদেশ-নিষেধ ঠিকমত মেনে চলা কর্তব্য। তা হলেই দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তা‘আলার আযাব-গজব থেকে পরিত্রাণ লাভ হবে।



হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com



সূচীপত্র

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াতী জীবন	১
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নাম ও বংশপরিচয়	২
দীনের প্রতি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত	৩
ঘটনা থেকে শিক্ষা	৪
দীনী কাজে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দূরদর্শিতা	৫
মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কঠোর পদক্ষেপ	৬
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কথা রূপক অর্থে ছিল	৭
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের প্রতি মিথ্যার সম্পর্ক ও তার জবাব	৮
স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দিলেন	৯
মিথ্যাসংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা	১০
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করার কারণ	১১
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কি সত্যিই অসুস্থ ছিলেন?	১২
আল্লাহর সমীপে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দু‘আ	১৩
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের প্রথম দু‘আ	১৪
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় দু‘আ	১৫
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের তৃতীয় দু‘আ	১৬
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের তৃতীয় দু‘আর ফল	১৭
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের তৃতীয় দু‘আর উপর প্রশ্ন	১৮
কখন প্রশংসামূলক কাজ করা যাবে	১৯
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের চতুর্থ দু‘আ	২০
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পঞ্চম দু‘আ	২১
কাফের-মুশরিকদের জন্য দু‘আ, প্রশ্ন ও জবাব	২২
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ষষ্ঠ দু‘আ	২৩
পরকালে মৃতদের জীবিত করার স্বরূপ দর্শন	২৪
ঘটনার সারসংক্ষেপ	২৫
আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও তার জবাব	২৬
আহমভাবে এরূপ ঘটনা না দেখানোর হেকমত	২৭
নমরূদের সাথে সৃষ্টিকর্তা নিয়ে বিতর্ক	২৮
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ	২৯
যেভাবে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুনে ফেলা হলো	৩০
যেভাবে আল্লাহর সাহায্য এলো	৩১
আগুনে বসে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কথোপকথন ও নমরূদের ঈমান	৩২
অস্বীকার	৩৩

কিয়ামতের দিন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে সর্বপ্রথম কাপড় পরানো হবে
 নমরুদের ধ্বংস এবং ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের হিজরত
 নমরুদ ও তার বাহিনীর ধ্বংসের কাহিনী
 ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের হিজরত
 হিজরতের পথে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দুটি মুজিয়া
 প্রথম মুজিয়াঃ ভাষা পরিবর্তন
 দ্বিতীয় মুজিয়া : অলৌকিকভাবে স্ত্রী সারাহর ইজ্জতের হেফাজাত
 ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের জন্ম
 ইসহাক ‘আলাইহিস সালামের জন্ম
 ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বিবি হাজেরা ও প্রথম সন্তান ইসমাঈলসহ
 মক্কায় হিজরত
 শিশুপুত্রকে কুরবানী করার আদেশ পালন
 ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে কাবা শরীফ নির্মাণের নির্দেশ
 কাবাঘর সর্বপ্রথম কে নির্মাণ করেন?
 কাবাঘর শিরকমুক্ত রাখার নির্দেশদানের হেকমত
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের
 দু‘আর বরকত
 প্রথম আবেদনঃ দীনের যাবতীয় মেহনত কবুল করা
 দ্বিতীয় আবেদনঃ মুসলিম বানানো
 তৃতীয় আবেদনঃ হজ্জের নিয়ম শিক্ষাদান
 চতুর্থ আবেদনঃ তাদের উম্মতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
 ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ
 ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে হজ্জের ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ
 উপসংহার
 ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের জীবন উম্মতের জন্য শিক্ষা

باسمه تعالى

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াতী জীবন

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 لَا يَبْلُغُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
 ○ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○
 لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○

অর্থঃ স্মরণ করুন ইবরাহীমের কথা, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাকে ভয় করো। তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয়, যদি তোমরা বুঝো। তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল মূর্তিরই পূজা করছো এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করো, তারা তোমাদের জীবন-উপকরণের মালিক নয়। সুতরাং আল্লাহরই ইবাদত করো। আর তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তোমরা তারই নিকট ফিরে যাবে। অনন্তর তোমরা যদি মিথ্যাপ্রতিপন্ন করো, তবে তো তোমাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছিল। এক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে দীনের কথা প্রচার করে দেওয়াই তো রাসূলের দায়িত্ব। তারা কি লক্ষ্য করে না, কীভাবে আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়াতা‘আলা সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ১৬-১৯)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম আ.-এর দীনী দাওয়াতের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন এবং এ মর্মে কাফেরদের অবস্থা উল্লেখ করেছেন। পূর্ববর্তী নবীগণের এ সকল ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনগণকে দীন প্রচারে কাফেরদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে সান্তনা দিচ্ছেন যে, পূর্বকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর কাফেরদের তরফ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তারা কখনো সাহস হারাননি। সুতরাং এখনও কাফেরদের উৎপীড়নের পরোয়া করা উচিত নয় এবং দীনের দাওয়াত মানুষের নিকটে পৌঁছাতেই থাকতে হবে।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নাম ও বংশপরিচয়

আল্লাহ তা‘আলার বিশিষ্ট নবী ও রাসূল হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বংশপরম্পরা হচ্ছে- ইবরাহীম বিন তারেখ বিন নাহুর বিন সারুগ বিন রাগাও বিন ফালেগ বিন আবের বিন সালেহ বিন আর বিন সাম বিন নূহ ‘আলাইহিমুস সালাম।

ইবনে আসাকির রহ. বলেন, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের মাতার নাম উমায়লা। কালবী বলেন, তার মাতার নাম বুনা বিনতে কুরবাতা বিন কুরাসি। তিনি বনী আরফাখাস বিন সাম বিন নূহ গোত্রের ছিলেন। (কাসাসূল আশ্বিয়া, ২০২ পৃষ্ঠা)

এতে দেখা যাচ্ছে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পিতা ও মাতা উভয়দিক দিয়েই নূহ ‘আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পিতার নাম “আযর” বলে প্রসিদ্ধ রয়েছে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ বলেন, তার নাম তারেখ; আযর তার উপাধি।



তবে ইমাম রাযীসহ পূর্ববর্তী কোন কোন আলেম বলেন, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পিতার নাম “তারেখ” এবং চাচার নাম আযর। তার চাচা আযর নমরুদের মস্তিষ্ক লাভের পর মুশরীক হয়ে যায়। আর চাচাকে পিতা বলা আরবী বাকরীতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত। এই রীতি অনুযায়ী আয়াতে আযরকে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। (যুরকানী ও শরহে মাওয়াহিব)

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম দামেস্ক শহরে বারযা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন। অবশ্য প্রসিদ্ধ হলো, তিনি বাবেল শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন।

দীনের প্রতি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত

আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম তার পিতার নিকট আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত দেন। তার পিতা মূর্তিপূজক ছিল। তিনি স্বীয় পিতার নিকট গিয়ে নরম হৃদয় নিয়ে কোমল ভাষায় তাকে বুঝালেন। এর বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআনে এভাবে ইরশাদ হয়েছে,

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا أَبَتِ إِنَّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۚ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۚ يَا أَبَتِ إِنَّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝

অর্থঃ স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম নিজের পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা, আপনি এমন কিছুর ইবাদত কেন করেন, যে শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনই কাজে আসে না? হে আমার পিতা, আমার নিকট মহান জ্ঞান এসেছে, যা আপনার

নিকট আসেনি। সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো। হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত করবেন না। শয়তান তো আল্লাহ-দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা, আমি আশংকা করি, আপনাকে দয়াময় আল্লাহর শান্তি স্পর্শ করবে। আর তখন আপনি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবেন! (সূরা মারয়াম, আয়াত: ৪২-৪৫)

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নিজের পিতার নিকট এভাবে নম্র ভাষায় সবকিছু বুঝিয়ে ঈমানের দাওয়াত দেন। কিন্তু তার পিতা সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। পিতা তার ডাকে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে উল্টো তাকে শাসিয়ে বললো,

قَالَ ارْغَبْ أَنتَ عَنِ الْهَقْيِ يَا بُرْهَيْمُ ۚ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهَ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۝

অর্থঃ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার দেব-দেবী থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে? যদি তুমি এথেকে নিবৃত্ত না হও, তবে আমি পাথর দিয়ে আঘাত করে তোমার প্রাণনাশ করবো। তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ৪৫)

পিতার এই জবাব শুনে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম খুব মর্মান্ত হলেন। তবে তার হিদায়াতের আশা ছাড়লেন না। এজন্য তিনি তার শান্তি কামনা করে তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন বলে তাকে জানালেন। তারপর যখন একথা নিশ্চিত প্রকাশ পেল যে, সে ঈমান অস্বীকার করে আল্লাহর শত্রু হয়ে গিয়েছে, তখন তার সাথে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করে বললেন,

وَاعْتَرِ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝



অর্থঃ আমি আপনাদের এবং আপনারা যা-কিছুর উপাসনা করেন, সেসবকে পরিত্যাগ করছি। আমি ইবাদত করবো আমার পালনকর্তা রবের। আশা করি, আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করে বঞ্চিত হবো না। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ৪৮)

যখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহর জন্য নিজ ঘর, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন এবং তাদের দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা তার সাময়িক অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে তাকে উত্তম স্বজন হিসাবে পুত্ররূপে ইসহাককে (আ.) দান করলেন। এই পুত্র পয়গামবর ছিলেন এবং দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। ইসহাক ‘আলাইহিস সালামও আরেক নেকসন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন পয়গামবর হযরত ইয়াকুব ‘আলাইহিস সালাম। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে তার পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিপূর্ণ দীনদার পরিবার দান করলেন, যা আল্লাহর পয়গামবর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষগণের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

তদুপরি পিতার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কিয়ামতের দিন পিতার জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট আরযি পেশ করবেন। অবশ্য তা গ্রহণ করা হবে না। এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার পিতার সাথে সাক্ষাত করবেন। তখন তার পিতা আযর-এর চোখের উপর ধুলাবালি থাকবে এবং অবস্থা বেহাল থাকবে। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তখন পিতাকে বলবেন, আমি কি



আপনাকে বলিনি যে, আমার নাফরমানী করবেন না? তখন তার পিতা বলবে, আজ থেকে তোমার নাফরমানী করবো না।

তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট আরযি পেশ করে বলবেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিয়ামতের দিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। অতঃপর বলবেন, হে ইবরাহীম, আপনার পায়ের নিচে কী? তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম দেখবেন এক রক্তাক্ত জন্তুকে ফেরেশতাগণ শক্ত করে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছেন। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পিতাকে তার আসল শেকলে ও অবয়বে নয়, বরং বিকৃত করে পশুর আকৃতি দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এর কারণ হলো হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যেন পিতার কারণে হাশরের ময়দানে সবার সামনে লজ্জিত না হন।”

ঘটনা থেকে শিক্ষা

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার পিতাকে ঈমানের দাওয়াত দিতে গিয়ে رَبِّیُّ বলে সম্বোধন করেছেন। আরবী অভিধানের দিক দিয়ে رَبِّیُّ শব্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালোবাসাসূচক সম্বোধন জ্ঞাপক। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে আল্লাহ তা‘আলা সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন, তা মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তুও স্বার্থক সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শিরকে শুধু লিগুই নয়, বরং এর উদ্যোক্তারূপেও দেখলেন, যে কুফর ও শিরক মিটানোর জন্যই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার



প্রতি আদব, মুহাব্বত ও ভালোবাসা তার থেকে প্রকাশমান ছিল। এই দুটি বিপরীতমুখী বিষয়কে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন।

رَبِّی শব্দটি পিতার প্রতি সন্তানের দয়া ও ভালোবাসা প্রকাশের প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। এরপর এমন কোন বাক্য ব্যবহার করেননি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনঃকষ্টের কারণ হতে পারে অর্থাৎ পিতাকে কাফের, গোমরাহ ইত্যাদি বলেননি। বরং পয়গামবরসুলভ প্রজ্ঞার সাথে শুধু তার দেব-দেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন। যাতে তিনি নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারেন।

দ্বিতীয়পর্যায়ে তিনি আল্লাহর প্রদত্ত নবুওয়্যাতের জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি সেই মহান দৌলত লাভ করেছেন, তা ব্যক্ত করে তার দাওয়াত কবুল করার জন্য অনুরোধ করেছেন। তৃতীয় পর্যায়ে কুফর ও শিরকের সম্ভাব্য অশুভ পরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হুঁশিয়ার করেছেন।

কিন্তু পিতা সেই কথাগুলোর প্রতি চিন্তাভাবনা করার পরিবর্তে এবং পুত্রসুলভ মায়া-মুহাব্বতের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে শাসিয়েছেন। অধিকন্তু এটুকু করেও ক্ষান্ত হননি, বরং তাকে পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করার হুমকি দিলেন এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য বললেন।

কিন্তু পিতার সেই কঠোরতার জবাবেও হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম এই বলে তার শুভ কামনা ব্যক্ত করলেন,

سلام عليكم (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) এবং তার নির্দেশ মতো বাড়ি ছাড়লেন। তবে এর পরেও তিনি তার কওমের প্রতি ঈমানের দাওয়াতের সিলসিলা জারি রেখেছেন এবং তাদের বিভিন্নভাবে হেদায়াত করার কোশেশ করেছেন।

দীনী কাজে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দূরদর্শিতা

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম দীনের প্রচার কাজে বিভিন্ন প্রজ্ঞাপূর্ণ ও দূরদর্শিতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে চন্দ্র-সূর্য ও তারকার পূজা করার অসারতা বুঝাতে গৃহীত পদক্ষেপ একটি, যা তিনি চন্দ্র-সূর্য ও তারকাপূজার বিপক্ষে স্থায়ী সম্প্রদায়ের সাথে মতবিনিময়ের সময় করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষাদান করেছিলেন। সেই ঘটনা পবিত্র কুরআনের নিম্নযুক্ত আয়াতে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكَوْكَبَ ۚ قَالَ هَذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي ۚ هَذَا أَكْبَرُ ۚ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۚ إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّكْرِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

অর্থঃ যখন রাতের অন্ধকার ইবরাহীমকে ঢেকে ফেললো, তখন তিনি একটি তারকা দেখতে পেলেন। তখন তিনি (স্বজাতিকে বুঝানোর লক্ষ্যে তাদের শুনিয়ে) বললেন, এই নক্ষত্র আমার প্রতিপালক? (অর্থাৎ তোমাদের ধারণা অনুসারে এটা বললেও এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই তোমরা এর স্বরূপ দেখে নিবে।)



অতঃপর কিছুক্ষণ পরে যখন নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেল, তখন তিনি (স্বজাতিকে জন্ম করার চমৎকার সুযোগ পেয়ে) বললেন, আমি অস্তগামী বস্তুকে আমার প্রতিপালক হিসাবে পছন্দ করতে পারি না। (অর্থাৎ একে প্রভু মানা যায় না বা এটা উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। বরং অস্তিত্ব যার কখনো শেষ হওয়ার নয়, তিনিই প্রতিপালক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।) এরপর অন্য এক রাত্রিতে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে ইবরাহীম (পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পস্থা অবলম্বন করে) বললেন, (তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) এটি আমার পালনকর্তা? (কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যে ফুটে উঠবে।) অতঃপর যখন চন্দ্র অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন ইবরাহীম বললেন, যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথ না দেখাতেন, তবে আমিও তোমাদের মতো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্থায়ী পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করতাম। (কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এই চাঁদও উপাসনার যোগ্য থেকে পারে না।) এরপর একদিন দীপ্তি নিয়ে সূর্যকে উদ্ভিত থেকে দেখে (পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে সেভাবেই) বললেন, (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার প্রতিপালক? এটি তো বিশাল। (কিন্তু এই বিশালতার স্বরূপও অতি সত্ত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে।) এরপর যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো, তিনি (জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ উপস্থাপন সম্পন্ন করার পর এগুলোর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং) বললেন, “হে আমার জাতি, আমি তোমাদের এসব মুশরীকসুলভ বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।” অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্ট বস্তুকেই আল্লাহর আসনে আসীন করেছ, যা স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। (সূরা আনআম, আয়াত: ৭৬-৭৯)

ফলত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম জাতির সামনে এই স্বরূপ উদঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনটিই থেকে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতিমুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত। বরং সেই মহান সত্তাই আমাদের পালনকর্তা, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকেই সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় চেহারা তোমাদের বানানো মূর্তি এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে সরিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

এ বিতর্কে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পয়গাম্বরসুলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ প্রয়োগ করে প্রথমবারেই তাদের নক্ষত্রপূজাকে পথভ্রষ্টতা আখ্যা দেননি, বরং তিনি এমন এক হেকমতপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক সুস্থ সচেতন মানুষের মন-মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মহান সত্য উপলব্ধি করে ফেলে।

কিন্তু অপরদিকে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে তিনি প্রথমবারেই কঠোর হয়ে যান এবং স্বীয় পিতা ও জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করে দেন। কেননা, মূর্তিপূজা যে একটা অযৌক্তিক ভ্রষ্টতা, তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও সুবিদিত। এর বিপরীতে নক্ষত্রপূজার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা এতটা সুস্পষ্ট ছিল না। তাই এব্যাপারে তিনি সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করেন।

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কঠোর পদক্ষেপ

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَتَاللّٰهِ لَا كَيْدَ لَكُمْۢ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝ فَجَعَلَهُمْ جُذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ
لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ۝ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاِلٰهِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ قَالُوْا سَبِّحْنَا
فَتَيِّدُ كُرْهُهُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرٰهِيْمُ ۝ قَالُوْا فَاتُّوْا بِهٖ عَلٰى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ
۝ قَالُوْا اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاِلٰهِنَا يٰ اِبْرٰهِيْمُ ۝ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا
فَسْأَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۝ فَرَجَعُوْا اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ الظّٰلِمُوْنَ
۝ ثُمَّ نَكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ ۝ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۝ اِبٌّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
۝ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

অর্থঃ আর (ইবরাহীম আ. মনে মনে বললেন,) আল্লাহর কসম, যখন আপনারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাবেন, তখন আমি আপনাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবো। অতঃপর তিনি সবগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন ওদের প্রধানটি ছাড়া; যাতে তারা তার কাছে প্রত্যাবর্তন করে। তারা বললো, আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করলো? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম। কতক লোক বললো, আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ বলতে শুনেছি; তাকে ইবরাহীম নামে ডাকা হয়। তারা বললো, তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত করো, যাতে তারা দেখে। তারা বললো, হে ইবরাহীম, আপনিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, এদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। অতএব, তাদের জিজ্ঞেস করুন, যদি তারা কথা বলতে পারে। অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করলো এবং বললো, ওহে লোকসকল,



তোমরাই বে-ইনসাফ। অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে এবং বললো, আপনি তো জানেন যে, এরা কথা বলে না। তিনি বললেন, আপনারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুই ইবাদত করেন, যা আপনাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক আপনাদের জন্য এবং আপনারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরই ইবাদত করেন, ওদের জন্য। আপনারা কি বুঝেন না? (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত: ৫৭-৬৭)

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব উদযাপন করতো। নির্ধারিত দিনে তারা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকেও আমন্ত্রণ জানালো যে, আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে চলুন। উদ্দেশ্য, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম উৎসবে যোগদান করলে হয়তো তাদের ধর্মের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে নিজের ধর্মের দাওয়াত ত্যাগ করবেন।

কিন্তু ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মনে মনে এই সুযোগকে অন্যভাবে ব্যবহার করতে চাইলেন যে, যখন গোটা সম্প্রদায় উৎসব উদযাপন করতে চলে যাবে, তখন আমি তাদের মূর্তির ঘরে প্রবেশ করে প্রতিমাগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দেব। তারা যাতে ফিরে এসে মিথ্যা উপাস্যদের বাস্তবদৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। হয়তো এতে তাদের কারো অন্তরে মূর্তিগুলোকে অসহায় ও অক্ষম দেখে ঈমান জাগ্রত হবে এবং সে শিরক থেকে তাওবা করে নিবে।

এই উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে যেতে অস্বীকার করলেন এবং অস্বীকারের পথ বেছে নিতে প্রথমে তারকার দিকে তাকালেন,

গভীর দৃষ্টিপাত করলেন, অতঃপর বললেন, আমি অসুস্থ। সম্প্রদায়ের লোকেরা অপারগ মনে করে তাকে রেখেই উৎসবে চলে গেল।

তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মূর্তিগুলোকে ভেঙে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিলেন। শুধু বড় মূর্তিটা ভাঙলেন না। যাতে এর মাধ্যমে এদের অক্ষমতা বোঝাতে পারেন।

এখানে “বড়” বুঝাতে হয়তো দৈহিক আকার-আকৃতি উদ্দেশ্য যে, উক্ত মূর্তি সবচেয়ে বড় ছিল। অথবা এটাও থেকে পারে যে, আকার-আকৃতিতে সমানই ছিল, কিন্তু পূজারিরা তাকে “বড়” বলে মান্য করতো।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম এই আশায় উক্ত কাজটি করলেন যে, তারা তাদের উপাস্যদের খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পূজার উপযুক্ত নয় এই জ্ঞান তাদের মধ্যে জাগ্রত হবে। এতে করে তারা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আহ্বানের দিকে ফিরে আসবে।

আল্লামা কালবী রহ. বলেন, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের এই কাজের উদ্দেশ্য এটা ছিল যে, তার সম্প্রদায় ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তি খণ্ড-বিখণ্ড এবং বড় মূর্তিটা সঠিক অবস্থায় আর কাঁধে কুড়াল অবস্থায় দেখবে, তখন হয়তো তারা এই বড় মূর্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করবে যে, এরূপ কেন হলো? সে যখন কোন উত্তর দিবে না, তখন এগুলোর অক্ষমতা তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কথা রূপক অর্থে ছিল

যখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় উৎসব থেকে ফিরে এলো এবং বললো,

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করেছে? যে করেছে, নিশ্চয় সে জালিম। (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত: ৫৯)

এর জবাবে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, বরং তাদের বড়টিই এ কাজ করেছে। (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত: ৬৩)

মুজাহিদ ও কাতাদা রহ. বলেন, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম উপরোক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের সামনে বলেননি, বরং মনে মনে বলেছেন অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দুয়েকজন দুর্বল লোক ছিল তাদের বলেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে, কাজটি তো ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং প্রধান মূর্তিকে অভিযুক্ত করা বাস্তবতা বিরোধী কাজ, যা মিথ্যা বলার শামিল। আল্লাহর দোস্ত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের জন্য এই মিথ্যাচার কীভাবে বৈধ হলো?

এর উত্তরে তাফসীরবিদগণ ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কথার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেছেন। তাফসিরে বয়ানুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের এ কথা “ধরে নেওয়া”র পর্যায়ে ছিল। অর্থাৎ “তোমরা একথা ধরে নাও না কেন যে, এ কাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে?” আর ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বাস্তব বিরোধী কথা বলা হলে, তা মিথ্যা গণ্য করা হয় না। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, (হে নবী, বলে দিন,) যদি রাহমানের (আল্লাহর) কোন সন্তান থাকতো, তা হলে আমি সর্বপ্রথম তার ইবাদতকারীদের মধ্যে হতাম।

এ ছাড়াও উক্ত প্রশ্নের বাস্তবসম্মত জবাব বাহরে মুহীত, কুরতুবী, রুহুল মাআনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সেসব গ্রন্থে বলা হয়েছে, এখানে রূপকভাবে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যে কাজ নিজে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। কেননা, এই মূর্তিটিই ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের এই কাজের কারণ হতে পারে, যেহেতু তার সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মানপ্রদর্শন করতো এবং একে বড় খোদা মনে করতো। (তাফসীরে মা‘রিফুল কুরআন)

উদাহরণত, যদি কোন বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হাত কেটে বলেন, আমি হাত কাটিনি, বরং তোমার কাজই তোমার হাত কেটেছে। এটা নিশ্চয় সঙ্গত কথা। কেননা, তার অন্যায় কাজই হাত কাটার মূল কারণ।

এ ছাড়া বর্ণিত আছে, মূর্তি ভাঙার কুড়ালটি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন। যাতে যেকোনো দর্শক ধারণা করে, সে-ই এ কাজ করেছে। এটাও সেরূপ রূপক আয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আরবি পরিভাষা অনুযায়ী এই ধরনের রূপকতার রূপায়নকে মিথ্যা হিসাবে অভিহিত করা হয় না।

উপরন্তু হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি সম্পর্কযুক্ত করার মধ্যে কয়েকটি উপকারিতা নিহিত রয়েছে, যেগুলো প্রকাশিত হওয়া ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল। যেমন,

১. দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, পূজার সময় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরীক করায় বড় মূর্তিটি রাগান্বিত হয়ে এ কাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তাওহীদের পথ

খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সঙ্গী-মূর্তিদের শরীকানা সহ্য করতে পারে না, তখন আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন কীভাবে নিজের সাথে এসব পাথরখণ্ডের শরীকানা মেনে নিবেন?

২. তাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল যে, যেসব মূর্তিকে আমরা খোদা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই প্রভু হতো, তবে তাদের কেউ ভেঙে চুরমার করতে পারতো না।

৩. ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কাজটি বড় মূর্তির দিকে সম্পর্কযুক্ত করে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করতে বলেন। তার জবাব দিতে হলে, মূর্তির বাকশক্তি থাকা জরুরী। এজন্যই বলেছেন, তাদের জিজ্ঞেস করুন, যদি তারা কথা বলতে পারে। এর মাধ্যমে তাদের কথা বলার ব্যাপারে অক্ষমতা তাদের সামনে প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এ থেকে তাদের বুঝা উচিত যে, এই অক্ষমরা ইলাহ হয় কী করে? (তাফসীরে মা‘রিফুল কুরআন)

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের প্রতি

মিথ্যার সম্পর্ক ও তার জবাব

বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে এসেছে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তিন জায়গা ছাড়া কোথাও অসত্য বলেননি। সেই তিন জায়গা হলো,

১. মূর্তি ভাঙার ব্যাপারে বলা যে, “তাদের বড়টাই এ কাজ করেছে”।

২. কওমের উৎসবে না যাওয়ার জন্য বলেছেন, “আমি অসুস্থ”।

৩. স্ত্রীকে জালিম শাসকের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে বোন বলে পরিচয় দিয়েছেন।

স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দিলেন

তৃতীয় বিষয়ের সেই ঘটনা হলো হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার স্ত্রী হযরত সারাহ সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। জনপদের প্রধান বা শাসক ছিল জালিম ও ব্যভিচারী। কোন ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে, সে স্ত্রীকে পাকড়াও করতো এবং তার সাথে ব্যভিচার করতো। কিন্তু কোন কন্যা পিতার সাথে কিংবা বোন তার ভাইয়ের সাথে থাকলে, সে এরূপ করতো না। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার স্ত্রীকে নিয়ে এই জনপদে পৌঁছার খবর কেউ এই জালিম শাসকের কাছে পৌঁছে দিলে, সে হযরত সারাহকে গ্রেফতার করে আনল।

সম্পর্ক যাচাইয়ের জন্য গ্রেফতারকারীরা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলো, এই মহিলার সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক কী? ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম জালিমদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বললেন, সে আমার বোন। এটাই হাদীসে বর্ণিত সেই রূপক অর্থের তৃতীয় মিথ্যা।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও জালিম শাসক সারাহকে গ্রেফতার করলো। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সারাহকে বলে দিলেন, আমি তোমাকে আমার বোন বলেছি। তুমিও এর বিপরীত বলো না। কারণ, ইসলামী সম্পর্কে তুমি আমার বোন। এখন এই দেশে আমরা দুজনমাত্র মুসলমান এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সেই জালিমের মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে সবিনয় প্রার্থনার জন্য নামায পড়তে শুরু করলেন।

হযরত সারাহকে সেই জালিম শাসকের সামনে আনা হলো। সেই জালিম যখনই কুমতলবে হযরত সারাহর দিকে হাত বাড়াল,

তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। সে তখন হযরত সারাহকে অনুরোধ করে বলল, তুমি দু‘আ করো, যাতে আমি আগের মতো সুস্থতা ফিরে পাই। আমি তোমাকে কিছুই বলবো না। সারাহ দু‘আ করলেন। তার দু‘আয় সে সুস্থ হয়ে উঠলো।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় সে খারাপ নিয়তে হযরত সারাহর দিকে হাত বাড়াতে চাইলো। তখন আল্লাহর হুকুমে আবার সে অবশ হয়ে গেল। সে আবার দু‘আর জন্য অনুনয় করলো। হযরত সারাহ দু‘আ করলেন। তাতে সে পুনরায় সুস্থ হলো।

সে আবার হযরত সারাহকে বদ নিয়তে ধরতে চাইলে, আবার অবশ হয়ে গেল। তখনও হযরত সারাহর কাছে দু‘আর জন্য অনুনয় করে বললো, তার সাথে আর কোন অসদাচরণ করবে না। এবারও হযরত সারাহ তার জন্য দু‘আ করলেন। তার দু‘আয় সে সুস্থতা ফিরে পেল। (ফাইজুল বারী শরহে বুখারী)

তিনবার এরূপ ঘটনার পর জালিম শাসক হযরত সারাহকে ফেরত পাঠিয়ে দিল এবং সেই সাথে নিজের প্রিয়তমা মেয়ে হাজেরাকে খাদেমা হিসাবে তাকে দিয়ে দিল।

উপরোক্ত হাদীসে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দিকে বাহ্যিক তিনটি মিথ্যার সম্পর্ক বুঝা যায়, যা বাহ্যত নবুওয়্যাতের শানের খেলাফ বলে মনে হয়। কিন্তু এর জবাব হাদীসের ব্যাখ্যায় স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রয়েছে। তা হলো, এই তিনটি কথার একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না। বরং এটা ছিল আরবী বালাগাতের (অলংকারশাস্ত্রের) পরিভাষায় “তাওরিয়া”। অর্থাৎ দ্ব্যর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে শ্রোতাকে এর এক অর্থ বোঝানো আর বক্তার মনে অন্য অর্থ থাকা। কারো জুলুম

থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফিকাহবিদগণের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েয। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়।

তদুপরি উল্লিখিত হাদীসে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নিজেই সারাহকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে বোন বলেছি, তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তুমিও আমাকে ভাই বলো। বোন বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন, আমরা উভয়ে দীনী ভাইবোন; আর এটাই তাওরিয়া। তাওরিয়াকে সাধারণত মিথ্যা বলে গণ্য করা হয় না।

এমনিভাবে মূর্তি ভাঙার কাজটি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্পর্ক করেছেন। তেমনিভাবে নিজের অসুস্থ হওয়ার কথা দিয়ে মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ চিন্তিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থ করেছেন। কিন্তু শ্রোতারা এটাকে শারীরিক অসুস্থতার অর্থ নিয়েছিল। (তাফসীরে মা‘রিফুল কুরআন, ৬:১৯৯)

মিথ্যাসংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্থতা

মির্জা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্যশিক্ষাবিদ এবং পাশ্চাত্যের পাণ্ডিত্যে মোহগ্রস্ত লেখক এই হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহর দোস্তু ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে মিথ্যার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। কাজেই ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে মিথ্যা বলার সাথে সম্পৃক্ত করার চেয়ে সনদের বর্ণনাকারীদের কথা মিথ্যা বলা সহজতর। কেননা, হাদীসটি কুরআনের পরিপন্থী।

স্বল্পজ্ঞান থাকার কারণে তারা একটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছেন যে, যেসব হাদীস কুরআনের পরিপন্থী হবে, তা যত শক্তিশালীই হোক, মিথ্যা ও ভুল আখ্যায়িত হবে। (শামায়িল)

এই নীতিটি সাধারণত সঠিক হলেও সহীহ হাদীসের বেলায় এ রকম চিন্তা করা অবাস্তব। কেননা, হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যেসব হাদীস সহীহ ও শক্তিশালী প্রমাণ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কুরআনের পরিপন্থী বলা যায়।

মূলত আলোচ্য হাদীসে দেখা গেছে, তিনটি কথা মিথ্যা বলা হয়েছে, যেগুলোর “তাওরিয়া” হওয়ার প্রমাণ হাদীসেই বিদ্যমান।

এখন কথা হলো, “তাওরিয়া” বোঝাতে গিয়ে কেন كَذِبًا (মিথ্যা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে? এর কারণ তা-ই, যা সূরা ত্ব-হায় হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের কাহিনীতে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের عَصَى ভুলকে (নাফরমানী করলেন) ও عَوَى (বিচ্যুত হলেন) শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর দোস্ত, তাদের সামান্য দুর্বলতাকেও এবং আযিমত ত্যাগ করে রুখসাত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। কুরআন মাজীদে এই ধরনের বিষয়ে পয়গাম্বরগণের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে।

তেমনি পরকালীন সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে যখন মানবজাতি একত্র হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য পয়গাম্বরগণের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে, তখন প্রত্যেক পয়গাম্বর তাঁর ক্রটির কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশ এর জন্য দণ্ডায়মান হবেন।

লোকজনের সেই সুপারিশের প্রার্থনার সময় হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম হাদীসে বর্ণিত ‘তাওরিয়ার’ ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে নিজের দোষ-ত্রুটি সাব্যস্ত করে ওজর পেশ করবেন। এই অবস্থার দিকে ইশারা করার জন্য হাদীসে এগুলোকে **كذبت** তথা মিথ্যা বলার শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ করার অধিকার ছিল এবং তার হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত আমাদেরও উক্ত হাদীসের বাণীটুকুই বলার অবকাশ আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মিথ্যা বলেছেন বললে তা জায়েয হবে না।

যেমন, সূরা ত্ব-হায় হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের কাহিনীতে ‘কুরতুবী’ ও ‘বাহরে মুহীতে’র বর্ণনায় রয়েছে, কুরআন অথবা হাদীসে কোন পয়গাম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন শিক্ষা অথবা হাদীস রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোন পয়গাম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েয ও ধৃষ্টতা বলে গণ্য হবে। (তাফসীরে মা‘রিফুল কুরআন, ৬:২০০)

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করার কারণ

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যখন উৎসবে যাওয়ার দাওয়াত দিল, তখন তিনি তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং

যেতে অস্বীকার করেন। এ সময় তার তারকার দিকে দৃষ্টিপাতের কারণ কী?

কেউ কেউ বলেন, এটা নিছক একটা উদ্দেশ্যহীন ও অনিচ্ছাধীন কর্ম ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার সময় মানুষ মাঝেমধ্যে অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তেমনি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে যখন উৎসবে যোগদান করার দাওয়াত দেওয়া হলো, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, এই দাওয়াত কীভাবে এড়ানো যায়? এই ভাবনার মধ্যে তিনি অনিচ্ছায় তারকার দিকে দেখতে থাকেন।

এ ব্যাপারে আরেকটি অভিমত হলো, তারকারাজি দেখার মধ্যে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল। তাই কুরআনে কারীমে গুরুত্বের সাথে তা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সেই উদ্দেশ্য কী ছিল? এই প্রশ্নের জবাবে সেই তাফসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের ভক্ত ছিল। তাই তারকারাজি দেখে দেখে তিনি জবাব দিলেন। যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা তার কথা অনায়াসেই মেনে নেয়। অবশ্য ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নিজে জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোন কথা বলেননি, তাই এ সংক্রান্ত বিশ্বাসের প্রশ্ন তার প্রতি আরোপিত হতে পারে না।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কি সত্যিই অসুস্থ ছিলেন?

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নিজ গোত্রের লোকদের আমন্ত্রণের জবাবে বলেছিলেন, اِنِّیْ سَقِیْمٌ আমি অসুস্থ। এখানে প্রশ্ন হয়, তিনি কি বাস্তবিকই অসুস্থ ছিলেন? পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। কিন্তু সহীহ বুখারীর এক হাদীস থেকে

জানা যায়, তিনি তখন এমন অসুস্থ ছিলেন না যে, মেলায় যেতে পারবেন না। তাই প্রশ্ন ওঠে, তিনি কেমন করে বললেন, আমি অসুস্থ?

অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর এই জবাব দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম এই বাক্যে “তাওরিয়া” করেছিলেন। এখানে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বাক্যের বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, আমি অসুস্থ। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ছিল অনুরূপ অন্যকিছু। সেটা কী ছিল এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যেমন,

১. কেউ বলেন, এতে তার উদ্দেশ্য ছিল মানসিক অসুস্থতা, যা স্বগোত্রের মুশরিকসুলভ কাণ্ড-কীর্তি দেখে তার মনে সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে سَقِيم শব্দের ব্যবহার থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, এটা مَرِيض শব্দ অপেক্ষা অর্থের দিক দিয়ে অনেকটা হালকা। এক্ষেত্রে ‘আমার মন খারাপ’ বলেও এর অর্থ ব্যক্ত করা যায়।

২. কেউ কেউ বলেন, اِنِّى سَقِيم বলে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা বলেছিলেন। আর উক্ত বাক্য দিয়ে এই অর্থ গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত বটে। কেননা, আরবী ভাষায় اسم فاعل এর পদ বহুল পরিমাণে ভবিষ্যৎকালের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاهُمْ مَيِّتُونَ এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ আপনিও মৃত এবং তারাও মৃত। কিন্তু এখানে এরূপ অর্থ

প্রযোজ্য নয়। বরং এখানে অর্থ হবে, “আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে।”

৩. এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ অসুস্থতার প্রসঙ্গ হয়তো এজন্য উত্থাপন করেছিলেন যে, তখন তার শরীর ভালো লাগছিল না। যার কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলেন। কিংবা এর দিয়ে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে, মৃত্যুর আগে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া নিশ্চিত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুস্থ না হলেও মৃত্যুর আগে মন ও শরীরের অবস্থা অবনতির দিকে যাওয়া অবশ্যসম্ভাবী। আর এটাও এক প্রকার অসুস্থতা।

৪. উক্ত কথার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হিসাবে কেউ কেউ এটা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তখন বাস্তবিকই কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। তবে উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থ ছিলেন না। বরং তিনি তার মামুলি অসুস্থতার কথাই এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, তাতে শ্রোতারা মনে করে নেয় যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের “তাওরিয়া”য় এই ব্যাখ্যা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। (তাফসীরে মা‘রিফুল কুরআন, ৭:৪৫২)

আল্লাহর সমীপে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দু‘আ
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার পিতা ও কওমের নিকট
তাওহীদ ও হেদায়াতের দাওয়াত পেশ করে নিজের যিম্মাদারী
আদায় করেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার নিকট নিম্নোক্ত দু‘আ
করেন, যা পবিত্র কুরআনের সূরা শু‘আরায় ইরশাদ হয়েছে।
তিনি দু‘আ করেন,

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْحَقْنَى بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝
وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ وَاعْفُ عَنِّي إِنَّكَ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ
يُبْعَثُونَ ۝

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন। পরবর্তীদের মধ্যে আমার সত্যভাষ্য অব্যাহত রাখুন এবং আমাকে জান্নাতুন নাইম-এর অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; তিনি তো পথভ্রষ্টদের মধ্যে হয়ে গিয়েছেন এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। (সূরা শুআরা, আয়াত: ৮৩-৮৬)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম, আল্লাহ তা‘আলার নিকট ছয়টি বিষয়ে দু‘আ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের প্রথম দু‘আ

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম প্রথমত দীনের প্রজ্ঞা বা দীনের পরিপক্ব জ্ঞানের জন্য দু‘আ করেছেন। কেননা, দীনী প্রজ্ঞা অর্জন ছাড়া প্রকৃত রূপে ভালো বা মন্দ চেনা যায় না। তাই দীনের উপর পুরোপুরিভাবে চলার জন্য দীনী প্রজ্ঞা বা গভীর জ্ঞান জরুরী।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় দু‘আ

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম দ্বিতীয়ত সৎকর্মশীল বা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দু‘আ করেছেন। ইলমের সাথে সাথে পরিপূর্ণ আমল অপরিহার্য। সৎকর্মশীলতা প্রার্থনার



দ্বারা তিনি সেই দু‘আই করেছেন। ইলম ও আমল এই দুটি বিষয় কামালাতের বিশেষ গুণ।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের তৃতীয় দু‘আ

তৃতীয় বিষয়ের দু‘আয় হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পরবর্তী মানুষদের মধ্যে তার গুণাদর্শ বিরাজিত থাকার প্রার্থনা করেছেন। এর দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, এমন সুন্দর তরীকা ও উত্তম নিদর্শন লাভ করা, যা-কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, রুহুল মা‘আনী)

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের তৃতীয় দু‘আর ফল

আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের এই দু‘আর বরকতে তার আদর্শকে পরবর্তীদের জন্য অনুসরণীয় করেছেন। ফলে ইহুদী, খ্রিস্টান এমনকি মক্কার মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের মিল্লাতকে ভালোবাসে এবং নিজেদের এর অনুসারী বলে থাকে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ। তবু তাদের দাবি, আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতের অনুসারী। আর মুসলিম উম্মাহ তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়াকে নিজেদের জন্য গর্বের বিষয় মনে করে এবং বাস্তবেও তারা মিল্লাতে ইবরাহীমীর উপর কায়ম আছে। আর বিশেষভাবে তাদের কুরবানী, খাৎনা প্রভৃতি হুকুম হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সুন্নতরূপেই পালিত হয়।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের তৃতীয় দু‘আর উপর প্রশ্ন

উক্ত আয়াতের বর্ণনার দিয়ে বাহ্যত বুঝা যায়- হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম দু‘আ করেছেন, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন হোক। এ সম্পর্কে প্রশ্ন হয়, এটা

তো বাহ্য যশঃপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়। অথচ যশঃপ্রীতি অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা শরী‘আতের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। পবিত্র কুরআনে পরকালের নিয়ামত লাভকে যশঃপ্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরশীল ঘোষণা করে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, ‘সেই আখিরাতের আবাস আমি তাদের জন্যই বানিয়েছি, যারা পৃথিবীতে উঁচুতা ও বিশৃঙ্খলা চায় না।’

তাই প্রশ্ন জাগে, এমন যশঃপ্রীতির দু‘আ ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কীভাবে করলেন?

এর জবাব হচ্ছে, উক্ত আয়াতের বর্ণনার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, এই দু‘আর আসল লক্ষ্য যশঃপ্রীতি নয়, বরং আল্লাহ তা‘আলার কাছে এই দু‘আ করা যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দান করুন, যা আমার আখিরাতের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সৎকর্মের প্রেরণা জাগে এবং আমার পরেও যেন মানুষ সৎকর্মের ব্যাপারে আমাকে অনুসরণ করে। এই অর্থে এটা দোষের বিষয় তো নয়ই, বরং এর মাধ্যমে সৎ পথে অধিক অগ্রসর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বুঝায়, যা প্রশংসনীয়।

কখন প্রশংসামূলক কাজ করা যাবে

এই আয়াত দিয়ে প্রশংসামূলক কাজ করা অর্থাৎ যা করার দিয়ে কোন ব্যক্তি লোক-সমাজে প্রশংসিত হবে, এমন কাজ করা জায়েয প্রমাণিত হয়। ইবনে আরাবী রহ. বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে যে প্রশংসা হয়, সে সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েয।

তবে এ ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম গাযযালী রহ. বলেন, কোন কাজ করে দুনিয়াতে সম্মান ও প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছা তিনটি শর্তে বৈধ হবে।

১. যদি নিজেকে বড় এবং অন্যদের ছোট ও হেয়প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য না হয়। বরং এরূপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে।

২. মিথ্যা গুণকীর্তন না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই, তার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা না করা।

৩. তা অর্জন করার জন্য কোন গুনাহ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করা না হয়।

এ ছাড়াও তা কোনভাবে রিয়ার পর্যায়ে যেন না হয়। রিয়া অর্থ কোন নেকের কাজ, যা শুধু আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য করতে হয়, তা লোক দেখানোর নিয়তে বা কোন মানুষকে খুশি করার জন্য কিংবা মানুষের সুনাম-সম্মান পাওয়ার লক্ষ্যে করা।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের চতুর্থ দু‘আ

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম চতুর্থ বিষয়ে জান্নাতের অধিকারী হওয়ার জন্য দু‘আ করেছেন। প্রত্যেক মুমিনেরই এই দু‘আ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দু‘আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পঞ্চম দু‘আ

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দু‘আর পঞ্চম বিষয় হলো, নিজের পিতার জন্য মাগফিরাত কামনা। এ মর্মে তিনি

দু‘আয় বলেন, ‘(হে আমার পালনকর্তা,) আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; তিনি তো পথভ্রষ্টদের মধ্যে হয়ে গিয়েছেন।’

কাফের-মুশরিকদের জন্য দু‘আ, প্রশ্ন ও জবাব

এতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পিতা কাফের ও মুশরিক ছিলেন। আর কাফের-মুশরিক ও বেদীনদের জন্য ক্ষমা বা মাগফিরাতের দু‘আ করা নিষিদ্ধ।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, ‘নবী ও মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করবে, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয় এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী’। (সূরা তাওবা, আয়াত: ১১৩)

আয়াতটির পটভূমিতে সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিব যদিও মুসলমান ছিলেন না, কিন্তু সারাজীবন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন এবং কাফেরদের মোকাবেলায় তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং মন থেকে চাইতেন ও চেষ্টা করতেন, তিনি যেন ইসলামের কালেমা পড়ে মুসলমান হন। যাতে তিনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পান এবং জান্নাত লাভ করেন। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেও কাফেরদের প্ররোচনার কারণে ঈমান গ্রহণ করেননি। এমতাবস্থায়ই তার মৃত্যুর সময় এসে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শেষ মুহূর্তে হলেও ঈমান আনলে, পরকালে তার জন্য সুপারিশ করতে

পারবেন এ আশা নিয়ে তার নিকট পৌঁছলেন এবং বললেন, চাচাজান, আপনি কালেমা পড়ুন, আমি কিয়ামতের দিন আপনার জন্য সুপারিশ করবো। কিন্তু আবু জাহেল, আবদুল্লাহ বিন উমাইয়া প্রমুখ কাফের পূর্ব থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা বলতে লাগলো, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের দীন ছেড়ে দিবে? তাদের প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত আবু তালিব বলে ফেললেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি এবং ওই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হলো। তখন চাচার প্রতি আন্তরিকতার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করলেন, আমি আপনার জন্য সর্বদাই আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে থাকবো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে নিষেধ না করা হয়। সেই মুহূর্তে আল্লাহ তা‘আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সকল মুসলমানকে কাফের ও মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করতে নিষেধ করা হয়, যদিও তারা নিকটাত্তীয় হয়।

সুতরাং হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বর্ণিত দু‘আ সম্পর্কে প্রশ্ন এসে যায়, আল্লাহ তা‘আলার চিরন্তন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফিরাতের দু‘আ করলেন?

এর জবাব হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নিজের পিতার জীবদ্দশায় তার ঈমান গ্রহণের তাওফীকপ্রাপ্তির মাধ্যমে ক্ষমা লাভের আশায় আল্লাহ তা‘আলার কাছে সেই দু‘আ করেছিলেন। কারণ, ঈমানের পর মাগফিরাত নিশ্চিত ছিল। আর এজন্য এভাবে দু‘আ করার ব্যাপারে তিনি পিতাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। এর আগে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার পিতার জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ রয়েছে, সবগুলোর উদ্দেশ্য একই। অর্থাৎ আল্লাহ যেন তাকে ঈমানের তাওফীক দেন, যাতে তার মাগফিরাত হয়।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও উল্লিখিত অর্থে কাফেরদের জন্য ক্ষমার দু‘আ করার বর্ণনা হাদীসে রয়েছে। উহুদ যুদ্ধের সময় কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক রক্তাক্ত করে দেয় এবং তার দান্দান মোবারক শহীদ করে দেয়, তখন দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা মোবারক থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং দু‘আ করছিলেন, ‘আয় আল্লাহ, আমার কওমকে ক্ষমা করে দিন, কেননা, তারা তো অবুঝ।’

এখানেও উদ্দেশ্য এই যে, তাদের ঈমান ও ইসলামের তাওফীক নসিব করুন, যাতে করে তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে।

এরই ভিত্তিতে ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, জীবিত কাফেরদের জন্য এভাবে দু‘আ করা জায়েয আছে যে, আয় আল্লাহ, তাদের ঈমান ও ইসলামের তাওফীক দান করুন, যেন তারা ক্ষমার যোগ্য হয়। (তাফসীরে মা‘রিফুল কুরআন, ৪:৪৭২)

অথবা উক্ত প্রশ্নের জবাব এটাও হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ধারণা ছিল, তার অন্তরের কামনা ও দাওয়াতের ফলে তার পিতা গোপনে ঈমান গ্রহণ করেছেন। যদিও তা প্রকাশ করেননি। তাই তার জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করেছিলেন।

অতঃপর যখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়, তার পিতা কুফর-এর উপর মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন তিনি পিতার জন্য দু‘আ ও ইসতিগফার বন্ধ করে দেন। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে সে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে,

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

অর্থঃ ইবরাহীমের নিজের পিতার জন্য ইসতিগফারের ব্যাপারটি একটি ওয়াদা পালন করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যে ওয়াদা তাঁর পিতার সঙ্গে করে রেখেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর নিকট পরিষ্কার হলো যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তিনি তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। নিশ্চয় ইবরাহীম কোমল হৃদয় ও সহনশীল। (সূরা তাওবা, আয়াত: ১১৪)

উক্ত আয়াত দিয়ে বুঝা যায়, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নিকট পিতার কুফর প্রকাশ পাওয়ার পর তিনি তার সাথে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আর আয়াতে তার পিতাকে কাফের হিসাবে “আল্লাহর শত্রু” বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, কাফেররা আল্লাহর শত্রু অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা কাফেরদের তার শত্রু বলে গণ্য করেছেন। আর যারা আল্লাহর শত্রু গণ্য হবে, তারা মুমিনদেরও শত্রু গণ্য হবে। এজন্য কাফেরদের শত্রু মনে করা এবং তাদের সাথে কোনরকম বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখা ঈমানের দাবি।

সেই দাবি পূরণ করেই হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নিজের কওমকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার পর যারা সেই দাওয়াত কবুল করলো না, বরং কাফের-মুশরিকই রয়ে গেল, তাদের



সাথে সবরকম সম্পর্কচ্ছেদের সাথে সাথে তাদের শত্রু বলেও ঘোষণা করেন। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ لَهُمْ إِنَّا بَرَاءُ مِنْكُمْ
وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا
حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অর্থঃ তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সহচরগণের মধ্যে অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের কওমকে বলেছেন, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা করো, তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। আমরা তোমাদের অমান্য করছি। সর্বদার জন্য আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশমান থাকবে, যতদিন তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন না করবে। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৪)

উপরোক্ত আয়াতে কাফেরদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতকে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আদর্শ অনুসরণের জন্য বলা হয়েছে।

তেমনিভাবে মুমিনদের কাফের-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা স্থাপন করতে নিষেধ করে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا
بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ۗ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا

أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ إِنَّ يَثْقَفُكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝

অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কারো না। তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা ছুড়ে দিচ্ছ! অথচ তারা তোমাদের প্রতি যে সত্য এসেছে, তাকে অস্বীকার করেই কাফের হয়েছে। তোমাদের করতোলগত করতে পারলে, তারা তোমাদের শত্রুরূপে আবির্ভূত হবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি তাদের পেশীশক্তি ও রসনাশক্তি (মিডিয়া) প্রসারিত করবে। আর তারা অন্তর থেকে কামনা করে, তোমরা যদি কাফের হয়ে যেতে! (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ১-২)

এই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট হচ্ছে, হিজরতের পর মক্কার কাফেররা যখন হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, এই গোপন তথ্য পূর্বাহ্নে মক্কাবাসীদের নিকট ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হযরত হাতেব বিন আবু বালতা‘আ। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত, মক্কায়ে এসে বসবাস করছিলেন। মক্কায়ে তার স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায়ে বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায়ে হিজরত করেছিলেন। আর তার স্ত্রী ও সন্তান সবাই মক্কায়ে থেকে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়েকেরামের হিজরতের পর মক্কায়ে বসবাসকারী মুসলিমদের উপর কাফেররা অনেক নির্যাতন চালাত এবং তাদের নানাভাবে কষ্ট দিত। তবে যেইসব হিজরতকারীর আত্মীয়স্বজন মক্কায়ে ছিল, তাদের স্ত্রী-সন্তানেরা কোনরূপে

নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন, তার স্ত্রী ও সন্তানদের মক্কার কাফের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, সেই কাফেরদের কিছুটা খাতিরদারী করলে, তারা হয়তো তার সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই তিনি ওই মুহূর্তে মক্কাভিমুখে গমনকারিণী ‘সারা’ নাম্নী জনৈক গায়িকার নিকট মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে দেন, তাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর অভিযান পরিচালনার সংবাদ তাদের জানিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে এই সংবাদ অবগত হয়ে আলী রা., আবু মারসাদ রা. ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. কে পাঠিয়ে পশ্চিমধ্যে সারার নিকট থেকে সেই পত্র উদ্ধার করেন। সেই সাহাবী পরে এই কাজের জন্য খুবই অনুতপ্ত হন।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। উক্ত আয়াতে সকল মুসলমানকে কাফের-মুশরিকদের থেকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং কাফেরদের সাথে মুসলিমদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হারাম করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে কাফেরদের বুঝাতে “কাফের” শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে “আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রথমত ঐ নির্দেশের কারণ ও দলীল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহর শত্রুর কাছে বন্ধুত্ব করা বা তাদের বন্ধুত্ব কামনা করা, নিজের সাথে প্রতারণা করা ছাড়া আর কিছুই না। অতএব, এ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফেররা যে পর্যন্ত কাফের থাকবে, তারা কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে



না। কেননা, তারা আল্লাহর দুশমন। অতএব, যে মুসলমান আল্লাহকে মুহাব্বত করার দাবি করে এবং আল্লাহর মুহাব্বত লাভের আশা করে, সে কীভাবে আল্লাহর শত্রুদের বন্ধু বানাতে পারে?

তেমনিভাবে পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা কাফের-মুশরিক, হিন্দু-বেদীন, নাস্তিক-মুরতাদ এবং আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব বা অন্তরঙ্গতা স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি এক আয়াতে এই হুঁশিয়ারি করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাদের বন্ধু বানাবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ষষ্ঠ দু‘আ

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ষষ্ঠ দু‘আ এই করেছেন যে, হাশরের ময়দানে যেন তিনি পিতার বেদীনার কারণে লাঞ্চিত না হন। এই দু‘আর বরকতে তিনি কিয়ামতের দিন স্বীয় পিতার কারণে লাঞ্চিত হবেন না। এর আগে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট আরযি পেশ করে বলবেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন আমাকে লাঞ্চিত করবেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। অতঃপর বলবেন, হে ইবরাহীম, আপনার পায়ের নিচে কী? তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম দেখবেন, এক রক্তাক্ত জন্তুকে ফেরেশতাগণ শক্ত করে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছেন। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম-‘আলাইহিস সালামের পিতাকে তার আসল চেহারায় নয়, বরং বিকৃত করে পশুর



চেহরায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটা এজন্য করা হবে, যাতে করে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পিতার কারণে হাশরের ময়দানে লজ্জিত না হন।

পরকালে মৃতদের জীবিত করার স্বরূপ দর্শন

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,
 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْجِي الْمَوْتَىٰ قَالَتْ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَتْ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُ قَالَتْ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ
 حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

অর্থঃ স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখান কেমন করে আপনি মৃতদের জীবিত করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, আপনি কি বিশ্বাস রাখেন না? ইবরাহীম বললেন, অবশ্যই বিশ্বাস রাখি, তবে চাম্ফুষ দেখার আবেদন করছি, যাতে অন্তরে ইতমিনান হাসিল হয়। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, তা হলে চারটি পাখি ধরুন। অতঃপর সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নিন। তারপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দিন। অতঃপর সেগুলোকে ডাকুন। তখন তারা আপনার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি প্রজ্ঞাবান। (সূরা বাকরা, আয়াত: ২৬০-২৬১)

উল্লিখিত আয়াতে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহ তা‘আলার একটি কুদরতী নিদর্শন স্বচক্ষে দেখার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘটনার সারসংক্ষেপ

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ইচ্ছা জাগল, মৃতদের কীভাবে পরকালে জীবিত করা হবে তা দেখার। তাই তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট আরজ করলেন, হে পরওয়ারদিগার, আপনি পরকালে কীভাবে মৃতদের পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করলেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার কারণ কী? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি তোমার বিশ্বাস নেই? ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম উত্তর দিলেন, পরওয়ারদিগার, অবশ্যই। আর আপনার সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা ও প্রতিমুহূর্তেই আমি দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানবপ্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সাথে যদি তা নিজ চোখে সরাসরি দেখতে পায়, তা হলে এতে অন্তরে ইতমিনান হাসিল হয়। সেরূপ ইতমিনান হাসিলের জন্যই আমার এই প্রার্থনা।

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি তাকে প্রত্যক্ষ করাবার জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরিকদের এ সংক্রান্ত যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যায়। সেই পদ্ধতি ছিল, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে চার প্রজাতির চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দিলেন, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্র হাতের কাছে চলে আসে। আর তিনি যেন সেগুলোকে ভালোভাবে চিনতেও পারেন। অতঃপর নির্দেশ দিলেন, পাখিগুলোকে জবাই



করে এর হাড়, গোশত, পাখা ইত্যাদি টুকরো টুকরো করে কিমায় পরিণত করুন, তারপর সেগুলোকে উলট-পালট করে ভালোভাবে মিশিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজের পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দিন। তারপর এদের ডাকুন। তখন এগুলো আল্লাহ তা‘আলার কুদরতে এক অঙ্গ অপর অঙ্গের সাথে মিশে জীবিত হয়ে দৌড়ে আপনার কাছে চলে আসবে।

তাহসীরে রুহুল মা‘আনীতে ইবনুল মানযারের উদ্ধৃতিতে হযরত হাসান রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তা-ই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে যার যার হাড়ের সাথে তার হাড়, পাখার সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশত, রক্তের সাথে রক্ত মিলে আগের রূপ ধারণ করলো এবং ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কাছে দৌড়ে উপস্থিত হলো। তখন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করলেন, ইবরাহীম, কিয়ামতের দিন এমনিভাবে সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ একত্র করে একমুহূর্তে সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করে পুনরুত্থান করবো।

এই ঘটনায় আল্লাহ তা‘আলা মানুষের মৃত্যুর পরে রোজহাশরে পুনর্জীবিত করার এক নিদর্শন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে দেখালেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়েরও অপনোদন হতে পারে। মৃত্যুর পর পরকালে পুনর্জীবিত হওয়া ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে মুশরিকদের এটাই ছিল বড় প্রশ্ন যে, মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়, আর এই মাটি বাতাসের সাথে কোথায় যে উড়ে যায়- তার কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না। আবার কখনো তা পানির স্রোতের সাথে মিশে



যায়। কখনো বা গাছ ও শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে, আবার এর রেণু দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিক্ষিপ্ত অণু-কণা একত্র করে তাতে প্রাণসঞ্চার করার বিষয়টি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের বোধগম্য হওয়ার মতো নয়। কেননা, সব বিষয় তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করতে চায়। অথচ এটা হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার কুদরত, যা ঈমানের চক্ষু দিয়েই কেবল হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। তারা যদি তাদের বোধশক্তির বাইরের সেই কুদরতী ক্ষমতা সম্পর্কে একটু চিন্তা করে, তবেই বুঝতে পারবে, তাদের অস্তিত্বও তো সারাবিশ্বের বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুরই একটা সমষ্টি, যাকে আল্লাহ তা‘আলা মাতৃগর্ভে সঞ্চার করেছেন।

আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও তার জবাব

আলোচ্য ঘটনায় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রথমত প্রশ্নঃ হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের মনে এমন প্রশ্ন কেন জেগেছিল? অথচ তিনি আল্লাহ তা‘আলার সর্বময় ক্ষমতার উপর অকাট্য বিশ্বাসীরূপে তৎকালীন সর্বোচ্চ স্তরের মুমিন এবং নবী ছিলেন।

এর উত্তর হলো, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের প্রশ্ন কোন সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ছিল না। এ কথা তিনি এ সম্পর্কিত আল্লাহ তা‘আলার প্রশ্নের জবাবে ব্যক্ত করেছিলেন। বরং তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতে মৃতদেহকে জীবিত করবেন, তা তাঁর সর্বময় ক্ষমতার জন্য কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়; কিন্তু মৃতকে জীবিত করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে, তাঁরা কখনো কোন মৃতকে জীবিত থেকে দেখেনি। পরন্তু মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি ও রূপ বিভিন্নরকম হতে পারে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে, যে বস্তু সে দেখেনি, তার অনুসন্ধান করার জন্য তাঁর মনে একটা কৌতূহল জন্ম নেয়। এই

কৌতূহল নিবারণের দ্বারা অন্তরে স্থিরতা লাভ করাকে ‘ইতমিনান’ বলা হয়। এই কুলবি ইতমিনান লাভের উদ্দেশ্যেই ছিল হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের এই প্রার্থনা।

এতে ঈমান ও ইতমিনান-এর মধ্যকার পার্থক্য বুঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ ঈমান সেই ইচ্ছাধীন দৃঢ়বিশ্বাসকে বলে, যা মানুষ অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অর্জন করে। আর ইতমিনান অন্তরের সেই দৃঢ়তাকে বলা হয়, যা প্রত্যক্ষ কোন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।

এছাড়া হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী অবশ্যই ছিলেন। তবে প্রশ্নটি ছিল শুধু তার স্বরূপটি জানার জন্য। এজন্যই তো তিনি এ কথা বলেননি যে, আপনি কি পরকালে মৃতকে জীবিত করবেন? বরং বলেছেন, হে পরওয়ারদিগার, আপনি পরকালে মৃতদের কীভাবে জীবিত করবেন, তা আমাকে দেখান। অর্থাৎ এখানে প্রশ্ন মৃতদের জীবিত করার বিষয়ে নয়। বরং তাদের জীবিত করার কাইফিয়ত বা স্বরূপ সম্পর্কে।

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মৃতকে জীবিত করার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। অপরদিকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে তার মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, “আপনি কি বিশ্বাস রাখেন না” এর কারণ কী?

এর উত্তর হলো, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মূলত মৃতদের জীবিত করার স্বরূপ জিজ্ঞেস করেছিলেন। আর তিনি মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না। কিন্তু তার এই প্রশ্ন থেকে মানুষ ভুল অর্থ করতে পারে। তাই মানুষ যাতে

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের এই প্রশ্নের ভুল অর্থ করতে না পারে এবং তার বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে, সে জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে তার জবাব স্পষ্ট করে দিয়ে অন্যদের ভুল বুঝার বা ভুল ব্যাখ্যা করার পথ বন্ধ করে দেন।

আহমভাবে এরূপ ঘটনা না দেখানোর হেকমত

আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, “আর জেনে রাখুন, আল্লাহ তা‘আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে; আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ তা‘আলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এতে ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকবে না। অথচ মানুষকে ঈমান বিল গায়েব-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা পরীক্ষা করেন।

নমরূদের সাথে সৃষ্টিকর্তা নিয়ে বিতর্ক

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

অর্থঃ “আপনি কি দেখেছেন সেই লোককে, যে ইবরাহীমের (‘আলাইহিস সালাম) সাথে তার পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল এ কারণে যে, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছেন? ইবরাহীম (‘আলাইহিস সালাম) যখন বললেন,

আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম (‘আলাইহিস সালাম) বললেন, তা হলে আল্লাহ তো সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, আপনি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করুন। তখন সেই কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী কওমকে হেদায়েত করেন না”। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৮)

উক্ত আয়াতে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সাথে নমরুদের বিতর্কের বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে এই বিতর্ক সংঘটিত হয়েছিল।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের জন্মভূমি বাবেল শহরের নিকট ছিল। তাঁর যামানায় বাদশা ছিল নমরুদ। সে দুনিয়াতে কুফর ও শিরকের সয়লাব ঘটিয়েছিল। এমনিভাবে সে নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছিল (নাউযুবিলাহ)।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পিতাও মূর্তিপূজক ছিল। যখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তাদের তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং বললেন, তোমরা সকলেই গোমরাহীর মধ্যে রয়েছ, এই কথাটি নমরুদের গায়ে লেগে গেল এবং বললো, আমিই সকলের খোদা। আমি ছাড়া আর কোন খোদা নেই। কারণ, আমিই সমুদয় রাজত্ব, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও মাল-দৌলতের অধিকারী। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তাকে ঈমান ও তাওহিদের দাওয়াত দিয়ে অনেক বুঝালেন। কিন্তু সে অবাধ্য রয়ে গেলো।

তারপর খোদাদ্রোহী নমরুদ ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে জব্দ করার জন্য বললো, আপনি যে তাওহিদের তথা এক আল্লাহর

দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন, আপনার রবের দলীল কী? ইবরাহীম
‘আলাইহিস সালাম জবাবে বললেন,

رَبِّی الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ

অর্থঃ “আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি জীবিত করেন এবং
মৃত্যুদান করেন”।

বাস্তবে এটা আল্লাহ তা‘আলার তাওহীদের উপর এত বড় দলীল
যে, যতো খোদায়ী দাবিদার আছে এবং যতো লোক তাদের মান্য
করে, সকলেরই এ কথা জানা আছে যে, জীবিত করা এবং
মৃত্যুদান করা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই হাতে। অন্যকারো
হাতে নয়। যে খোদা দাবি করে, সে তো নিজের জীবনও বাঁচাতে
পারে না, সে আবার অন্যকে জীবন দান করবে কীভাবে?

কিন্তু এত বড় দলীল শুনেও নমরুদ সত্য মেনে নিল না, বরং
হটকারিতা প্রদর্শন করে নিজেই খোদা দাবি করে বলল,

أَنَا أُمِیْتُ

অর্থঃ “আমিই তো জীবন দান করি এবং মৃত্যু দেই”।

এই বলে নিজের দাবির পক্ষে দলীল প্রদর্শন হিসাবে নমরুদ
জেলখানা থেকে দুই ব্যক্তিকে ডাকলো এবং তাদের একজনকে
কতল করার ও অপরজনকে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিল। তার
আদেশমতো কাজ করা হলো। এরপর বললো, “দেখলে তো!
আমি একজনকে জীবন দান করে ছেড়ে দিলাম এবং
আরেকজনকে মৃত্যু দিলাম। সুতরাং আমিই খোদা।”

নমরুদের এই মূর্খতার জবাব ছিল, যাকে আপনি মেরে
ফেলেছেন, তাকে কি জীবন দিতে পারবেন? নিশ্চয় না।

কিন্তু হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বিশেষ হেকমত অবলম্বন করে তার এই মূর্খতার জবাব উপেক্ষা করে তার স্কুল বুদ্ধির আঙ্গিকেই দ্বিতীয় স্পষ্ট দলীল পেশ করলেন। তিনি বললেন,

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

অর্থঃ “আল্লাহ তো প্রতিদিন সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদিত করেন। যদি আপনি খোদায়ী দাবি করেন, তা হলে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করুন তো দেখি”। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৮)

এ কথায় নমরুদ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে লা-জবাব হয়ে গেল। এ ব্যাপারে কিছু বলার মওকা তার থাকলো না। কিন্তু তবু সে ঈমান গ্রহণ করলো না। তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না।”

মুফাসসীরগণ বলেন, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম উক্ত চ্যালেঞ্জ করার পর নমরুদ চিন্তা করলো, আমি যদি এখন একথা বলি যে, ঠিক আছে, আমি সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করবো, কিন্তু যখন আমি তা পারব না আর আমার দিয়ে তা সম্ভবও নয়, তখন তো আমার অক্ষমতা সবার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন আমার খোদায়ী দাবির মুখ কোথায় থাকবে? তাই সে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের চ্যালেঞ্জের কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলো।

অবশ্য নমরুদ উল্টো ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে বলতে পারতো যে, যদি আপনার আল্লাহ সত্য হন, তা হলে তিনিই পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত করে দেখান। কিন্তু সে তা বলেনি।

এর কারণ হলো, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যখন নমরুদের সাথে বিতর্ক করলেন, তখন এই সমগ্র দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা যে আল্লাহ- এ কথা নমরুদের বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল। তাই তার অন্তরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একথা জেগে উঠেছিলো যে, নিশ্চয় আল্লাহ, যিনি পূর্বদিক থেকে সূর্য উদয় করেন, তিনি পশ্চিমদিক থেকেও উদয় করতে পারেন। আর এ ব্যক্তি আল্লাহর নবী হয়ে থাকলে, অবশ্যই এমন হবে। আর এমন হলে, বিশ্বময় এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাতে লাভের পরিবর্তে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। মানুষ এই মুজিয়া দেখে আমার দিক থেকে ফিরে তাঁর দিকে ঝুঁকে যাবে। তাতে সামান্য বাড়াবাড়িতে রাজত্বই চলে যাবে। তাই সে কোন উত্তর না দিয়ে চুপ হয়ে যায়। (বায়ানুল কুরআন)

এই আয়াত দিয়ে বুঝা গেল, যখন আল্লাহ তা‘আলা কোন কাফেরকে দুনিয়াতে মান-সম্মান দান করেন, তখন তাকে সে নামে অভিহিত করা জায়েয। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনবোধে তার সাথে সত্যের পক্ষ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করাও জায়েয, যাতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যায়।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝ قُلْنَا يٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ ۝ وَآرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِسِرِينَ ۝

অর্থঃ “তারা (কাফের নমরুদ ও তার দলবল) বললো, ওকে (ইবরাহীমকে) পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম, “হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।”

তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল; তখন আমি তাদেরই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম”। (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত: ৬৮-৭০)

এর আগে আলোচনা করা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কওমের লোকেরা যখন তাদের বিশেষ উৎসব পালন করতে গেল, তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তাদের তৈরিকরা মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। শুধু বড় মূর্তিটা বাদ রাখেন। যাতে মূর্তিগুলোর অক্ষমতা তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং মূর্তিগুলোর পূজা বাদ দিয়ে তারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করে।

তারা উৎসব থেকে ফিরে এসে মূর্তিগুলোর এই অবস্থা দেখে বললো, আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করলো? কতক লোক বললো, এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ‘ইবরাহীম’ বলা হয়। তারা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে বললো, ইবরাহীম, আপনিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, না, এদের এই বড়টিই কি এ কাজ করেছে? এ ব্যাপারে মূর্তিগুলোকেই জিজ্ঞেস করুন, যদি তারা কথা বলতে পারে। তারা তখন (মূর্তিগুলোর অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরে) মনে মনে চিন্তিত হলো। কিন্তু মুখে বললো, আপনি তো জানেন, এরা কথা বলে না। তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আপনারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করছেন, যারা আপনাদের কোন উপকার করতে পারে না বা ক্ষতিও করতে পারে না। এরা কখনো ইলাহ হতে পারে না।

আপনারা এদের বাদ দিয়ে প্রকৃত ইলাহ আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করুন।

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কথায় সে দেশের শাসক খোদা দাবিদার নমরুদ ও তার লোকেরা ক্ষেপে গেল এবং তাকে কঠোর শাস্তি দানের ও আগুনে পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড- প্রদানের পরিকল্পনা করলো। এ লক্ষ্যে নমরুদ ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখলো।

যেভাবে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুনে ফেলা হলো ঐতিহাসিক রেওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ডে পুড়িয়ে মারার জন্য একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে আগুনসংযোগ করে সাতদিন পর্যন্ত তা প্রজ্বলিত করতে থাকে।

তাদের উপাস্য-মূর্তির বিরোধিতা করা এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ায় সেই কাফের-বেদীনরা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে খতম করতে এমনভাবে সোচ্চার হলো যে, তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল, তারা মান্নত মানতে শুরু করলো, যদি আমি ভালো হয়ে যাই, তা হলে আমি ইবরাহীমকে জ্বালানোর জন্য লাকড়ি জমা করবো।

আগুনকুণ্ড প্রস্তুত হয়ে গেল। আগুনের অসহ্য তাপের কারণে সেই আগুনকুণ্ডের নিকট যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। যদি কোন প্রাণী নিকট দিয়ে যেত, তা হলে তাপের কারণে মারা যেত। তাই সেই আগুনকুণ্ডে তারা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে কীভাবে নিষ্ক্ষেপ করবে- এই নিয়ে চিন্তায় পড়লো। তখন ইবলীস মানুষের সুরতে তাদের নিকট উপস্থিত হলো। সে হযরত ইবরাহীম

‘আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বলে দিল।

শয়তান বললো, ইবরাহীমকে মিনজানিক বা কামানের মাধ্যমে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করো। তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা তার পায়ে রশি বেঁধে মিনজানিকের মাধ্যমে তাকে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো।

যেভাবে আল্লাহর সাহায্য এলো

যখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, তখন ফেরেশতাকুল এবং প্রত্যক্ষদর্শী সকল সৃষ্টিজীব চিৎকার করে উঠলো, “ইয়া রাক্বানা, আপনার দোস্তের এ কী বিপদ!” আল্লাহ তা‘আলা তাদের সকলকে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সাহায্য করার অনুমতি দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পানির দায়িত্বশীল ফেরেশতা এসে বললেন, হে খলীলুল্লাহ, আপনি যদি চান তা হলে আমি পানির সয়লাবের মাধ্যমে আগুন নিভিয়ে দিতে পারি। বাতাসের ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর বন্ধু, যদি আপনি চান, তবে আমি প্রচণ্ড-বাতাস দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিব। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তাদের এসব প্রস্তাবের জবাবে বললেন, আল্লাহ তা‘আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম ব্যবস্থাকারী।

হযরত উবাই বিন কা‘ব রা. থেকে বর্ণিত, যখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তখন জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম উপস্থিত হয়ে বললেন, কোন খেদমতের প্রয়োজন আছে কি? উত্তরে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন। সুতরাং আমার জন্য যা মর্জি হয়, তিনি তা করবেন। আপনাদের

সাহায্যের কোন প্রয়োজন আমার নেই।” অতঃপর জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম বললেন, তা হলে আপনার পরওয়ারদিগারের কাছে প্রার্থনা করুন। উত্তরে তিনি বললেন, “আমার অবস্থা আমার পরওয়ারদিগারের জানা আছে।” (তাফসীরে মাযহারী, ৬:১৩৫; আনওয়ারুল বয়ান, ৬:১৫৮)

তখন আল্লাহ তা‘আলা আগুনকে হুকুম দিলেন, হে আগুন, ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও। (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত: ৬৯)

তখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের জন্য আগুন আর আগুন রইলো না, বরং এয়ারকন্ডিশনে পরিণত হয়ে গেল। তবে আগুন সত্তার দিক দিয়ে আগুনই ছিল এবং ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সত্তা ও আশপাশ ছাড়া অন্যসবকিছু দহন করছিল। এমনকি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে যে রশি দিয়ে বেঁধে নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছিল, সেটাও পুড়ে ছাই ও ভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দেহে আগুনের সামান্য আঁচড়ও লাগেনি। বরং তা তার জন্য আরামদায়ক ও শান্তিময় শীতল হয়ে গেল।

উক্ত আয়াতে ٱلْبَرِّ (শীতল)-এর পরে ٱلسَّالِ (শান্তিদায়ক) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসীরগণ বলেন, যদি এখানে ٱلسَّال শব্দটি উল্লেখ না করা হতো, তা হলে সেই আগুন এত শীতল হয়ে যেত যে, তা সহ্যের বাইরে চলে গিয়ে কষ্টের কারণ হতো। তাই ٱلسَّال শব্দ উল্লেখ করে আগুনের শীতলতাকে প্রশান্তিকর বানানো হয়েছে। (তাফসীরে মা‘রিফুল কুরআন)



ঐতিহাসিক রেওয়ায়াতে রয়েছে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সেই আগুনকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। তিনি বলতেন, এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারাজীবন তেমনটি লাভ করিনি। (তাফসীরে মাযহারী, ৬:১৩৭)

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যখন আগুনকুণ্ডে ছিলেন, তখন ছায়া দানকারী ফেরেশতা তাকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। সেই ফেরেশতা তারই আকৃতিতে তার নিকট উপস্থিত ছিলেন। এ সময় জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম জান্নাত থেকে একটা গালিচা ও একটা জামা নিয়ে এলেন। তিনি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে সেই জান্নাতী জামা পরিধান করালেন। কারণ, নমরূদের লোকেরা তাকে বিবস্ত্রপ্রায় করে ফেলেছিল। অতঃপর নিচে জান্নাতী গালিচা বিছিয়ে দিলেন। (আনওয়ারুল কুরআন, ৬:১৫৯)

আগুনে বসে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কথোপকথন ও নমরূদের ঈমান অস্বীকার

সেসময় নমরূদ নিজের অটালিকায় বসেই দেখছিল, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বাগানে বসে আছেন এবং তার পাশে তারই মতো এক ব্যক্তি বসে কথা বলছেন। আর ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আশপাশে যতো লাকড়ি ছিল, সবগুলোকে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুন স্পর্শ করছে না।

এই দৃশ্য দেখে নমরূদ ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে অন্যভাবে কাবু করার জন্য বললো, “ইবরাহীম, আপনি কি এই আগুনের মধ্যদিয়ে বের হয়ে আসতে পারবেন?” তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “হ্যাঁ, অবশ্যই বের হতে পারবো ইনশাআল্লাহ।” এই বলে তিনি নিজ জায়গা থেকে

উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই আগুন ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এই অবস্থা দেখে নমরুদ বললো, হে ইবরাহীম, আপনার ইলাহ দেখছি খুবই শক্তিশালী! আগুনও তার কথা শোনে!

এই কুদরত অবলোকন করে নমরুদ খুবই প্রভাবিত হলো এবং নত হয়ে বললো, আমি আপনার আল্লাহর নামে চার হাজার গাভী মান্নত হিসাবে জবাই করবো। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার ধর্ম আঁকড়ে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা আপনার পক্ষ থেকে কিছুই কবুল করবেন না। তাই আপনি আপনার ধর্ম ছেড়ে আল্লাহর দীন গ্রহণ করুন। নমরুদ বললো, আমি আমার ধর্ম এবং আমার দেশ তো ছাড়তে পারবো না। তবে আমার কথা রক্ষার জন্য অবশ্যই গাভী জবাই করবো। (আনওয়ারুল বয়ান, ৬:১৫৯)

গিরগিটির অপকর্ম এবং তার পরিণতি

হযরত উম্মে শুরাইক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটি (কাকলাস) কে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, সে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আগুনকুণ্ডে আগুন বাড়ানোর জন্য ফুক দিয়েছিল। (বুখারী শরীফ, ২:৪৭৪)

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন গিরগিটি সেখানে গিয়ে আগুনে ফুক দেয়। তার এই শয়তানি তৎপরতার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

এমনকি গিরগিটি হত্যা করার প্রক্রিয়ার তারতম্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়াবের বেশ-কমের ঘোষণাও

দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই গিরগিটি হত্যা করতে পারবে, তার জন্য একশত নেকি লেখা হবে। আর যে দুইবারে মারবে, তার জন্য প্রথম ব্যক্তির চেয়ে কিছু কম এবং যে তিনবারে মারবে, তার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির চেয়ে কিছু কম সাওয়াব লেখা হবে।” (মুসলিম শরীফ, ২:২৩৬)

অপরদিকে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের উপর প্রজ্বলিত আগুন নিভানোর উদ্দেশ্যে ব্যাঙ তাতে পেশাব করেছিল বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।

কিয়ামতের দিন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে সর্বপ্রথম কাপড় পরানো হবে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের সকলকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, তোমরা উলঙ্গ থাকবে এবং খাৎনাবিহীন থাকবে। তখন সর্বপ্রথম ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে কাপড় পরিধান করানো হবে।

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে সর্বপ্রথম পরানোর এই ফযীলত এ কারণে প্রদান করা হবে যে, নমরুদের লোকেরা তাকে উলঙ্গপ্রায় করে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। এর মাধ্যমে কাফের-বেদীনরা তাকে বেইজ্জতি করতে চেয়েছিল। তাই কিয়ামতের দিন তাকে সর্বাত্মক কাপড় পরিয়ে সম্মানিত করা হবে। (আনওয়ারুল বয়ান, ৬:১৬০)

নমরুদের ধ্বংস এবং ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের হিজরত



আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۝ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

অর্থঃ তারা (নমরুদ ও তার লোকেরা) ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইলো (আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করে)। তখন আমি তাদেরই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। আর আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্য বরকত রেখেছি। (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত: ৭০-৭১)

আল্লাহ তা‘আলা উক্ত আয়াতে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে নমরুদের আগুনকুণ্ড ও জুলুমের কবল থেকে মুক্তিদানের এবং নমরুদের অধিকারভুক্ত দেশ (ইরাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছে দেওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, যেখানে আল্লাহ তা‘আলা বিশ্ববাসীর জন্য বরকত ও কল্যাণ রেখেছেন বলে ইরশাদ করেছেন। মুফাসসীরগণ বলেন, উক্ত দেশ হচ্ছে সিরিয়া।

উক্ত দেশে বিশ্ববাসীর জন্য বরকত ও কল্যাণ রাখার কথা এজন্য বলা হয়েছে, উক্ত দেশ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের ধারক। কেননা, আল্লাহ তা‘আলার অধিকাংশ পয়গাম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। আর সুষম আবহাওয়া, নদ-নদীর প্রাচুর্য, ফলমূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার রয়েছে এদেশে।

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে নমরুদের আগুনকুণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা প্রথমত নমরুদকে পুনরায় দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইবরাহীম ‘আলাইহিস

সালামকে নির্দেশ দেন। নমরুদ তা প্রত্যাখ্যান করলো এবং শেষ পর্যন্ত চরম ঔদ্ধত্য দেখাল। এভাবে পরপর তিনবার দাওয়াত দেওয়ার পরও নমরুদের হেদায়েত হলো না। তখন আল্লাহ তা‘আলা নমরুদকে তার দলবলসহ সমূলে ধ্বংস করেন এবং ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে দীনের দাওয়াত দানের নিমিত্তে সিরিয়া হিজরত করার নির্দেশ দেন।

নমরুদ ও তার বাহিনীর ধ্বংসের কাহিনী

হযরত য়ায়েদ বিন আসলাম রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়ার পর আবার নমরুদের নিকট পাঠালেন এবং তাকে ঈমানের দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিলেন। তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তাকে ঈমানের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে তা গ্রহণে অস্বীকার করলো। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাকে দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারপরও নমরুদ অস্বীকার করলো। অনুরূপভাবে তৃতীয়বার দাওয়াত দিলেন। তখনও অস্বীকার করলো।

অতঃপর নমরুদ ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে পরাস্ত করার জন্য বললো, আপনি আমার সাথে মোকাবেলার জন্য নিজের দলবল একত্র করুন এবং আমি আমার দলকে একত্র করবো। তারপর দেখা যাবে- কার শক্তি কতটুকু! সেমতে নমরুদ তার দলকে সূর্য উদিত হওয়ার সময় জমা করলো। তারা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কোন বাহিনী না দেখে ঠাট্টা-মজাক শুরু করলো। ঠিক ওই সময় আল্লাহ তা‘আলা নমরুদের বাহিনীর বিরুদ্ধে মশার বাহিনী পাঠালেন। সেই মশা এত প্রচুর সংখ্যক ছিল যে, নমরুদের বাহিনী তাদের কারণে সূর্য দেখতে পাচ্ছিল না। আল্লাহ তা‘আলা নমরুদের বাহিনীর উপর মশার বাহিনীকে



পুরোদস্তুর চড়াও করলেন। মশা তাদের গোশত ও রক্ত সব খেয়ে ফেলল। শুধু হাড়িগুলো রেখে দিল। এভাবে নমরুদের সম্পূর্ণ বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল।

এই অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে একটি মশা নমরুদের নাকের ছিদ্র দিয়ে তার মাথার ভিতর প্রবেশ করলো। সে বহু বছর পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিল। আল্লাহ তা‘আলা তাকে এর দিয়ে কঠিন শাস্তি দিলেন। ওই সময় থেকে সর্বদা মশার যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য তার মাথায় লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে হতো। এভাবে শাস্তি হতে হতে এক সময় আল্লাহ তা‘আলা তাকে ধ্বংস করে দেন। (কাসাসূল আশ্বিয়া, ১১৩ পৃষ্ঠা)

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের হিজরত

আগুনকুণ্ড থেকে বের হওয়ার পর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম এবং নিজের স্ত্রী সারাহকে সঙ্গে নিয়ে ইরাক থেকে হিজরত করে শামের ফিলিস্তিন নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য যাবতীয় বরকতের ব্যবস্থা করেন। হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ভাতিজা ছিলেন এবং তিনি নমরুদের আগুনকুণ্ডে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের মুজিয়া স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি মুসলমান ছিলেন। এবং বিবি সারাহ ও আগেই মুসলমান ছিলেন।

হিজরতের পথে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দুটি মুজিয়া প্রথম মুজিয়াঃ ভাষা পরিবর্তন

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নমরুদের আগুনকুণ্ড থেকে মুক্তিলাভ করে দীনের হেফাজত ও নির্বিঘ্নে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে গোপনে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন।

তখন নমরুদ এই সংবাদ পেয়ে তাকে গ্রেফতার করার জন্য বিভিন্ন স্থানে তার গঠনাকৃতির সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে লোক পাঠালো। তাদের এ কথা বলা হয়েছিল, “ইবরাহীম নামক সেই যুবক সুরিয়ানী ভাষায় কথা বলে। সুতরাং এই ভাষায় কথা বলে উক্ত গঠনাকৃতির কোন যুবককে পেলেই গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে আসবে।”

যাত্রাপথে ছিল একটি নদী। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নদীটি অতিক্রম করতেই শত্রুদের গোয়েন্দারা তাকে ধরে ফেলে এবং ভাষা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ভাষা পরিবর্তন করে দেন। তিনি অনর্গল সুরিয়ানীর পরিবর্তে ইবরাণী ভাষায় (নমরুদ ও তার লোকদের ভাষায়) কথা বলতে থাকেন। তখন শত্রুরা ভুল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ভেবে তাকে ছেড়ে দেয়। এভাবে আল্লাহ তা‘আলা ভাষা পরিবর্তনের কৌশল করে স্বীয় খলীল ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে নমরুদের কবল থেকে পরিত্রাণ দান করেন। (মু‘জামুল বুলদান, ৪:৮৮)

দ্বিতীয় মুজিযা : অলৌকিকভাবে স্ত্রী সারাহর ইজ্জতের হেফাজাত হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সফর করতে করতে এক অত্যাচারী চরিত্রহীন শাসকের এলাকা অতিক্রমকালে একস্থানে যাত্রাবিরতি করেন। তার সঙ্গে ছিলেন বিবি সারাহ। আল্লাহ তা‘আলা বিবি সারাহকে যথেষ্ট সৌন্দর্য দান করেছিলেন। সে সময় জালিমের অনুচররা তাকে গিয়ে সংবাদ দিল যে, আমাদের এখানে ভিনদেশী একটি লোক এসেছে। তার সঙ্গে এসেছে এক অনুপম সুন্দরী নারী। জালিম শাসক তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস



সালামকে তলব করে বিবি সারাহর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানতে চাইলো। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম জানতেন, এই জালিম সুন্দরী নারীদের জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নেয় এবং তার সঙ্গীটি স্বামী হলে প্রথমেই তাকে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু স্বামী ভিন্ন অন্যকেউ হলে, তাকে হত্যা করে না। এজন্য তিনি কৌশল করে জবাব দিলেন, সে আমার বোন। তারপর তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে বিবি সারাহকে বললেন, জালিম শাসক তোমার ও আমার সম্পর্কের কথা জানতে চাইলে বলে দিয়েছি, তুমি আমার বোন হও। কারণ, এই এলাকায় মুসলিম বলতে তো কেবল তুমি আর আমি। সুতরাং সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী হলেও দীনী দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ভাইবোনও বটে। কাজেই জালিমের কাছে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ফাঁস করে আমাদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করো না। বলে দিও, আমি তোমার ভাই।

তারপর সেই জালিম বিবি সারাহকে তার কাছে ডেকে আনলো এবং অসৎ উদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়ালো। হযরত সারাহ আল্লাহর কাছে দু‘আ করলেন, “আয় আল্লাহ, যদি আমি আপনার ও আপনার রাসুলের উপর ঈমান এনে থাকি এবং স্বামী ছাড়া অন্য সকল থেকে আমার ইজ্জত রক্ষা করে থাকি, তা হলে এই জালিমকে আমার উপর থেকে রুখে দিন।”

এই দু‘আর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা সেই জালিমের হাত-পা অবশ করে দিলেন। উপায়ান্তর না দেখে জালিম নিজের ভুল স্বীকার করে হযরত সারাহর কাছে ক্ষমা চাইলো এবং এই দুরবস্থা থেকে পরিদ্রাণের জন্য তাকে আল্লাহর কাছে দু‘আ করতে অনুরোধ করলো। বিবি সারাহ তার স্বাভাবিক অবস্থার জন্য আল্লাহর কাছে দু‘আ করলেন। কারণ, তার ভয় হচ্ছিল, জালিম



এই অবস্থায় মারা গেলে তার লোকেরা তাকে তার হত্যাকারী সাব্যস্ত করবে। বিবি সারাহর দু‘আয় সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর পুনরায় সে কুমতলবে বিবি সারাহর দিকে হাত বাড়ালো। এবারও সে আগের মতো বরং তার চেয়ে বেশি মারাত্মকভাবে গজবে পতিত হলো এবং তার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। তখন সে আবার বিবি সারাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে তার সেই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর নিকট দু‘আ করতে বললো। তখনও বিবি সারাহ তার জন্য দু‘আ করলেন। সে বিবি সারাহর দু‘আয় সুস্থ হলো। কিন্তু পুনরায় সে বিবি সারাহর প্রতি কুমতলবে হাত বাড়ালো। এবারও তার হাত-পা আরো মারাত্মকভাবে অবশ হয়ে গেল। এবারও সে ক্ষমা চেয়ে বিবি সারাহকে তার গজব থেকে মুক্তির জন্য দু‘আ করতে বললো। এবারও বিবি সারাহ দু‘আ করলেন। তাতে সে সুস্থ হয়ে গেল। এভাবে তিনবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

অবশেষে সে নিরাশ হয়ে তার অনুচরদের ডেকে বললো, এ তোমরা কাকে ধরে এনেছো? এ-তো জিনের প্রভাবে কাজ করে! একে ছেড়ে দাও। অন্য বর্ণনামতে, ঘটনাটিকে সে বিবি সারাহর কারামত মনে করলো এবং তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল। আর নিজের খাস খাদেমা হাজেরাকে তাঁর খাদেমা হিসাবে উপটৌকনস্বরূপ প্রদান করলো।

কোন কোন বর্ণনামতে, হাজেরা ছিলেন সেই বাদশার কন্যা অর্থাৎ শাহজাদী। বাদশা তাকে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন প্রথা অনুসারে দ্বিতীয় স্ত্রী প্রথম স্ত্রীর খাদেমা হয়ে

থাকতো বিধায় তাকে খাদেমা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অথবা বড় ব্যক্তিদের জন্য উন্নতমানের খানা-পিনার আয়োজন করেও দাওয়াত করার সময় যেমন ডাল-ভাতের কথা বলা হয়, তেমনি হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের মতো মর্যাদাবান নবীর পরিচয় পেয়ে নিজের কন্যাকে বাদশা খাদেমা বলে ব্যক্ত করেছে। শেষোক্ত এই কথাটি অর্থাৎ হযরত হাজেরা খাদেমা নন, বরং শাহজাদী ছিলেন, এটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

যাই হোক, বিবি সারাহ আল্লাহ তা‘আলার সাহায্যে শয়তানের চক্রান্ত অসার করে দেন এবং আপন ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করে হযরত হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে উদ্বিগ্ন, পেরেশান ও অপেক্ষমাণ হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কাছে ফিরে আসেন।

এক বর্ণনামতে, উক্ত ঘটনার সময় আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও সারাহর মাঝখানের দৃশ্যমান সকল বাধা দূর করে স্বচ্ছ কাচের মতো পরিষ্কার করে দেন। ফলে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম জালিমের সকল কার্যকলাপ চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছিলেন এবং বিবি সারাহর আব্রু রক্ষা পাওয়ায় প্রশান্তি লাভ করছিলেন। (কাসাসুল আম্বিয়া ও ইবনে কাসীর)

ইসমাইল ‘আলাইহিস সালামের জন্ম

শামদেশে (সিরিয়া) হিজরতের সময় ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বয়স অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে ৭৫ বছর ছিল এবং তার স্ত্রী সারাহ ও হাজেরা বয়স্কা ছিলেন। হিজরত করে শামে পৌঁছে তারা সেখানে বসবাস করতে থাকেন এবং দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন।

অতঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বিবিগণ বার্বক্যে পৌঁছেলেও এ পর্যন্ত কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি স্বীয় ওয়ারিস কামনা করে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দু‘আ করলেন,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একজন নেককার সন্তান দান করুন।

আল্লাহ তা‘আলা তার দু‘আ কবুল করলেন এবং তাকে ফেরেশতার মাধ্যমে সন্তান দানের সুসংবাদ দিলেন।

যখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার দরবারে স্বীয় ওয়ারিস চেয়ে দু‘আ করলেন এবং আল্লাহ তা‘আলা তার দু‘আ কবুল করে তাকে সন্তান দানের ব্যাপারে সুসংবাদ দিলেন, তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আয় আল্লাহ, আপনি আমাকে কীভাবে সন্তান দান করবেন? আমার তো সন্তান হয় না এবং আমার স্ত্রী তো বৃদ্ধ। আল্লাহ তা‘আলা ওহী পাঠালেন, আপনার এই স্ত্রীর মাধ্যমেই সন্তান হবে। তখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ছোট বিবি হাজেরা ‘আলাইহিস সালাম গর্ভবতী হলেন।

যখন হযরত সারাহ ‘আলাইহিস সালাম হযরত হাজেরার গর্ভবতী হওয়ার সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি নিজের সন্তান না হওয়ার কারণে মনে ব্যথা পেলেন এবং হাজেরাকে উপেক্ষা করতে লাগলেন। তাই একপর্যায়ে হাজেরা সারাহর কাছ থেকে দূরে স্থানীয় একটি ঝাঁরার কাছে চলে গেলেন। সেখানে একজন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে সারাহর খাদেমা, আপনি কোথা থেকে এলেন এবং কোথায় যাচ্ছেন? হযরত



হাজেরা বললেন, সারাহর কাছ থেকে এসেছি। ফেরেশতা বললেন, আপনি তাঁর নিকট ফিরে যান এবং তাঁর অধীনেই থাকুন। আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন নেক সন্তানের। অতঃপর ফেরেশতা তাকে বললেন, হে হাজেরা, আপনি গর্ভবতী হয়েছেন এবং আপনি এমন এক ছেলে জন্ম দিবেন, যার নাম হবে ইসমাঈল।

সেখান থেকে ফিরে হযরত হাজেরা ‘আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের সুসংবাদ অনুযায়ী একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিলেন। তার নাম ইসমাঈল রাখা হলো। যখন হযরত হাজেরার গর্ভে পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বয়স ৮৬ বছর ছিল। (কাসাসুল আম্বিয়া, ১১৯ পৃষ্ঠা)

ইসহাক ‘আলাইহিস সালামের জন্ম

হযরত হাজেরার গর্ভে যখন ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের জন্ম হলো, তখন হযরত সারাহ হযরত হাজেরাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। তাকে সন্তানসহ দেখলে নিজের সন্তান না হওয়ার জ্বালা বেড়ে যেত। তাই একপর্যায়ে হযরত সারাহ ‘আলাইহিস সালাম, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে বললেন, আপনি তাদের পৃথক করে দিন।

অপরদিকে একটি সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য সারাহর মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তখন আল্লাহ তা‘আলা তার মনোবাসনা পূরণার্থে তাকে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

অর্থঃ আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দিলাম, যিনি নেককার নবী হবেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১১২)

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

فَبَشِّرْنَهَا يَاسُحَقُ وَمِنْ وَرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوبُ

অর্থঃ এবং আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দিলাম। আরো সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের ঔরসে ইয়াকুবের জন্মের। (সূরা হুদ, আয়াত: ৭১)

আল্লাহ তা‘আলা সন্তান লাভের সুসংবাদ দিয়ে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কাছে পুনরায় ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও তার স্ত্রী সারাহ এই সংবাদ শুনে বিস্মিত হলেন। তাঁরা যদিও সন্তানের জন্য একান্তভাবে উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু উভয়ের বার্ধক্য চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যত সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাদের বিস্ময়ের জবাবে আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতার মাধ্যমে জানালেন, এভাবেই কুদরতী উপায়ে তারা একটি পুত্রসন্তান লাভ করবেন, তার নাম হবে ইসহাক। আরো অবহিত করা হলো, হযরত ইসহাক ‘আলাইহিস সালাম লম্বাজীবী হবেন এবং তিনিও সন্তান লাভ করবেন। তার সন্তানের নাম হবে ইয়াকুব। তারা উভয়ে নবুওয়্যাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াত দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যাকে জবাই করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম, ইসহাক ‘আলাইহিস সালাম নন। কারণ,



ইসহাক ‘আলাইহিস সালাম ছোটবেলায় জবাই হয়ে গেলে পরবর্তীকালে পিতা হওয়ার এবং নবী হওয়ার প্রসঙ্গ আসতো না। তা ছাড়া হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে এই সুংসবাদ দেওয়া হয়েছিল হযরত ইসমাইলের জবাইয়ের ঘটনার পরে। তখন হযরত ইসহাক-এর জন্মই হয়নি। সুতরাং তিনি জবাই হতে পারেন না। (কাসাসূল আম্বিয়া, ১১৯ পৃষ্ঠা; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১: ১৯২)

সুসংবাদ অনুযায়ী হযরত ইসমাইল-এর জন্মগ্রহণের তেরো বছর পর যখন হযরত ইসহাক ‘আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন, এই হিসাবে তখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বয়স ছিল একশ বছর। আর আহলে কিতাবদের বর্ণনা অনুযায়ী, তখন হযরত সারাহর বয়স ছিল নব্বই বছর। (কাসাসূল আম্বিয়া, ১৩০ পৃষ্ঠা)

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বিবি হাজেরা ও প্রথম সন্তান ইসমাইলসহ মক্কায় হিজরত

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ঘরে যখন ইসমাইল ‘আলাইহিস সালাম জন্মলাভ করেন, অপর দিকে সারাহর সাথে হাজেরার বনিবনা হচ্ছিল না, তখন আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দেন, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননী হাজেরাকে মক্কার শুকনো প্রান্তরে কাবা ঘরের পাশে রেখে আসুন। তখন তিনি তাদের শামদেশ থেকে বহু দক্ষিণে বর্তমানের মক্কা শহরে বাইতুল্লাহর নিকটে রেখে এলেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু‘আ করলেন, “আয় আল্লাহ, এই শহরকে আপনি একটি নিরাপদ শহর হিসাবে গণ্য করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে হেফাজত করুন। কারণ, এই মূর্তির কারণে



অনেক লোক গোমরাহ হয়ে গেছে। আমি এই মরুভূমিতে স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে যাচ্ছি। আপনি তাদের ঈমান ও আমালে সালাহের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।”

এমনিভাবে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তাদের দুনিয়ার উপকারের জন্যও দু‘আ করলেন, “আয় আল্লাহ, তাদের জন্য পানি ও ফলমূলের ব্যবস্থা করুন। যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়।”

এ কারণেই মক্কা মুকাররমায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদের তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এতো অধিক পরিমাণে সেখানে পৌঁছে যায় যে, অন্যান্য অনেক শহরেই সেগুলো পাওয়া দুষ্কর। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তাদের জন্য শুধু খাওয়ার ফলের দু‘আই করেননি, বরং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে সর্বোচ্চ মানের বস্তুটি সেখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্যও দু‘আ করেন। তার এই দু‘আর কারণে মক্কা মুকাররমা কোন কৃষিপ্রধান অথবা শিল্প এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উন্নতমানের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়, যা জগতের অন্যকোনো বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যখন হাজেরা ও ইসমাইল ‘আলাইহিমাস সালামকে মক্কার প্রান্তরে রেখে ফিলিস্তিনের উদ্দেশে রওনা হতে লাগলেন, তখন থলের মধ্যে কিছু খেজুর ও একটু পানি দিয়ে গেলেন। চলে যাওয়ার সময় তার স্ত্রী পিছনে চললেন এবং বারবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের এ মরুভূমিতে রেখে আপনি কোথায় যান? তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর হুকুমেই কি আপনি আমাদের এখানে রেখে যাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর হুকুমেই তোমাদের এখানে

রেখে যাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা আমাদের রক্ষা করবেন। অতঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম চলে গেলেন।

এদিকে অল্পদিনের মধ্যে পানি ও খাবার শেষ হয়ে গেল। তখন বিবি হাজেরা পানির জন্য পাগলের মতো সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানি পাচ্ছেন না। এরইমধ্যে আল্লাহ তা‘আলা হযরত জিবরাইল ‘আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দিলেন। ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের পায়ের দিকে, ফেরেশতা জিবরাইল নিজের বাজু দিয়ে আঘাত করলেন। সাথে সাথে সেখানে পানির ঝরনা প্রবাহিত হয়ে গেল। হযরত হাজেরা ছুটে এসে বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করলেন। উক্ত কুয়াটি পরবর্তীকালে যমযম কূপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, যার পানি সারা বিশ্বের মানুষ পান করছে এবং উক্ত পানিকে বেহেশতের পানি থেকেও বরকতময় বলা হয়েছে। মি‘রাজে شق صدر বক্ষ বিদীর্ণ করার ঘটনা তার প্রমাণ।

অতঃপর কবিলায়ে জুরহুম পানির সন্ধান পেয়ে সেখানে এসে তাদের সাথে বসবাস শুরু করে দিল। অপরদিকে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বিবি-বাচ্চাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে মক্কায় আসতেন এবং তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে ফিলিস্তিন ফিরে যেতেন। (আনওয়ারুল বয়ান, ৫:১৬০)

শিশুপুত্রকে কুরবানী করার আদেশ পালন

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ فَبَشِّرْهُ بِعَلِيمٍ ۝ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُ
 إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ۝ قَالَ يَاقَبْتُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّ لِلْجَبِينِ ۝ وَكَادَيْتُهُ أَنْ يَأْبُرَ هَيْمٌ ۝ قَدْ
 صَدَّقْتُ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ وَ
 فَدَيْنُهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ (ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম দু‘আ করলেন,) হে
 আমার পরওয়ারদিগার, আমাকে এক সৎপুত্র দান করুন। তখন
 (আমি তার দু‘আ কবুল করলাম) এবং তাকে এক সহনশীল
 পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। অতঃপর সে যখন পিতার সাথে
 চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইবরাহীম
 (‘আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন, বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি
 যে, তোমাকে জবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কী দেখ?
 সে বলল, পিতাজী, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা
 পালন করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে সবরকারীদের
 একজন পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ
 করলেন এবং ইবরাহীম (‘আলাইহিস সালাম) তাকে জবাই করার
 জন্য শায়িত করলেন, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম,
 ইবরাহীম, আপনি স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। আমি
 এভাবে সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক
 সুস্পষ্ট পরীক্ষা। অতঃপর আমি তার পরিবর্তে জবাই করার জন্য
 দিলাম এক মহান জন্তু। আর আমি তার এ বিষয়টি পরবর্তীদের
 মধ্যে রেখে দিলাম। ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক।
 এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। তিনি আমার

মুমিন বান্দাদের একজন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০০-১১১)

এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট পুত্রসন্তান লাভের জন্য দু‘আ করলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে হযরত হাজেরা ‘আলাইহিস সালামের গর্ভে পুত্রসন্তান দান করলেন তার নাম রাখা হয় ইসমাইল। এরপর আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম স্ত্রী হাজেরা ও প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাইলকে মক্কার জনমানবহীন মরু প্রান্তরে রেখে আসেন। অতঃপর মাঝে মধ্যে তিনি শাম থেকে মক্কায়ে এসে স্ত্রী-পুত্রের খোঁজখবর নিতেন। এভাবেই বয়ে চলছিল সময়।

এক সময় শিশু ইসমাইল ‘আলাইহিস সালাম কৈশোরে পা রাখলেন। তার বয়স যখন তেরো বছর হলো, কারো কারো মতে, তিনি তখন সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন, কুরআনের ভাষায়- **فَكَانَ بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ** পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার বা পিতার কাজে সহযোগী হওয়ার বয়সে পৌঁছলেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০২)

তখন আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে এক বর্ণনামতে পরপর তিনরাতে স্বপ্নের মাধ্যমে তার বৃদ্ধ বয়সের আকাঙ্ক্ষার ধন, কলিজার টুকরা, পুত্র ইসমাইলকে কুরবানী করার জন্য ইঙ্গিত দান করলেন। নবীগণের স্বপ্ন সত্য ও ওহী বিধায় এটি ছিল আদেশ।

আদেশটি স্বপ্নযোগে দেওয়া হয়েছিল হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আনুগত্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাওয়ার জন্য।

কারণ, স্বপ্নে পাওয়া নির্দেশের মধ্যে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে, যেটা সরাসরি নির্দেশের ক্ষেত্রে থাকে না। কারণ, সরাসরি নির্দেশের নাফরমানী আল্লাহর অনুগত বান্দা বিশেষ করে নবীদের থেকে কল্পনাও করা যায় না। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলার উক্ত নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আনুগত্য পরখ করা, তাই তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিতদান করে দেখতে চাইলেন, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কোনরূপ ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন কি না? কিন্তু তিনি তো ছিলেন খলীলুল্লাহ এবং এর আগেও দুটি পরীক্ষায় পরিপূর্ণভাবে কামিয়াব হয়েছিলেন। তাই তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে আল্লাহ তা‘আলার আদেশ শিরোধার্য করে পুত্রকে কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ‘আলাইহিস সালাম নবুওয়্যাতী পদ্ধতি মোতাবেক সহজতম পন্থায় কাজটি আনজাম দেওয়ার লক্ষ্যে এবং আল্লাহর প্রতি পুত্রের আনুগত্য পরিমাপের উদ্দেশ্যে পুত্রকে স্বপ্নের কথা শুনালেন। তিনি এও ভেবেছিলেন যে, পুত্রের মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা-সংশয় দেখা গেলে, বুঝিয়ে তাকে প্রস্তুত করে নিবেন। তাই তিনি বললেন,

يٰٓيُنٰى اِنِّىۡ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىۡ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى

অর্থঃ প্রিয় বৎস, স্বপ্নে দেখলাম, আমি তোমাকে জবাই করছি। অতএব, ভেবে দেখো, তোমার অভিমত কী? (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০২)

পুত্রও তো ছিলেন খলীলুল্লাহর পুত্র; ভবিষ্যৎ পয়গাম্বর। তাই কচি বয়সেও পুত্র বুঝে ফেললেন, বাহ্যত যদিও এটি একটি স্বপ্ন, কিন্তু নবীগণের স্বপ্ন হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহ তা‘আলার ওহী ও আদেশ। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন,

আব্বাজান, আদেশ যখন আল্লাহ তা‘আলার, আর আমি যখন তার বান্দা, সুতরাং এখানে আবার মত-অভিমতের প্রশ্ন কেন? পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَعَلْنَا مَا تَكْفُرُونَ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

অর্থঃ আব্বাজান, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, নিঃসঙ্কোচে তা পালন করুন। আর (আশ্বস্ত হোন), ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০২)

উক্ত বাক্যে আল্লাহ তা‘আলার রাহে জান কুরবানের জন্য বিনাদ্বিধায় প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার মতো এত বড় ব্যাপারটিকেও ‘ইনশাআল্লাহ’ বলে আল্লাহ তা‘আলার দিকে সম্পর্কিত করা এবং নিজের অমর কীর্তিকে যুগ-যুগান্তের ধৈর্য ধারণকারীদের কীর্তির সঙ্গে তুলনা করা, হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের অপূর্ব নিষ্ঠা ও বিনয়ের পরিচয় বহন করে।

তারপর যখন পিতা পুত্রকে কুরবানী করার জন্য আর পুত্র কুরবান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন, মানুষের চরম শত্রু ইবলীস তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে প্রতারণিত করার জন্য তিন তিনবার ফন্দি আঁটল। কিন্তু আল্লাহর খলীল সাত সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করে শয়তানের সব চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিলেন। আজ হাজী সাহেবগণ মিনায় তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে সেই স্মৃতিকে ধারণ করে রেখেছেন।

এক সময় পিতা-পুত্র মিনার কুরবানগাহে পৌঁছলেন। তাদের উভয়ের হৃদয়ে অনুভূতিগুলো তখন কেমন আলোড়ন তুলেছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা মানুষের সাধ্যাতীত। আল্লাহ তা‘আলা



কুরআনের বর্ণনায় এই ব্যাপারটি মানুষের উপলব্ধির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন,

فَلَمَّا سَلَّمَ

অর্থঃ তারপর যখন তারা উভয়ে আল্লাহর আদেশের সামনে নত হলেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০৩)

তাফসীরবিদগণ লিখেছেন, কুরবানগাহে পৌঁছে হযরত ইসমাইল ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “আব্বাজান, আমাকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি ছটফট করতে না পারি। আর আপনার পরিধানের কাপড় সামলে নিন। যাতে আমার রক্তের ছিঁটা তাতে না পড়ে। তা না হলে এতে আমার সাওয়াব হ্রাস পেতে পারে। এ ছাড়া কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে আমার মা ব্যাকুল হবেন। তারপর আপনার ছুরিটা ভালো করে ধার করে নিন। আর ছুরিটা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন, যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। কারণ, মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলবেন। আর চাইলে আমার জামাটি তার কাছে নিয়ে যেতে পারেন। হয়তো তিনি এতে কিছুটা সন্তোষ পাবেন”।

একমাত্র পুত্রের মুখে এসব কথা শুনে পিতার কী অবস্থা হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ‘আলাইহিস সালাম দৃঢ়তার সাথে অটল পাহাড় হয়ে বললেন, “বেটা, আল্লাহ তা‘আলার হুকুম পালনে তুমি কতইনা উত্তম সহযোগী!” তারপর তিনি পুত্রকে চুমু খেলেন এবং ভালো করে বেঁধে মাটিতে গুঁইয়ে দিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ

অর্থঃ তিনি তাকে উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০৩)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পুত্র ইসমাঈলকে কাত করে এমনভাবে শোয়ালেন যে, কপালের একদিক মাটি স্পর্শ করেছিল।

অপর বর্ণনায় আছে, প্রথমে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পুত্রকে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে বারবার ছুরি চালানো সত্ত্বেও যখন ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের গলা কাটছিল না এবং জবাইয়ের কাজ সম্পন্ন হচ্ছিল না, তখন পুত্র নিজেই আবদার করে বললেন, “আব্বাজান, আমাকে উপুড় করে শুইয়ে দিন। কারণ, আমার মুখমণ্ডল দেখে আপনার মধ্যে পিতৃস্নেহ উথলে ওঠে। ফলে পূর্ণশক্তি দিয়ে গলা কাটা হয় না। তাছাড়া ছুরি দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই”।

একথা শুনে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পুত্রের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে উপুড় করে শোয়ালেন এবং তার গলায় সজোরে ছুরি চালালেন।

কিন্তু তখনও গলা কাটা গেল না। কেননা, মূলত আল্লাহ তা‘আলা তখন ছুরি ও গলার মাঝখানে একটি পিতলের টুকরোর প্রতিবন্ধক রেখে দিয়েছিলেন। ফলে শত চেষ্টার পরও হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের গলা কাটলো না।

আল্লাহ তা‘আলা তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের এই প্রয়াস কবুল করে ইরশাদ করলেন,

يَا إِبْرَاهِيمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا

অর্থঃ হে ইবরাহীম, আপনি স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০৩-১০৪)

স্বপ্নে পুত্রকে কুরবানী করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কাজ এ পর্যায় পর্যন্ত আসার পরই সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা এজন্য দেওয়া হয়েছিল যে, স্বপ্নে মূলত জবাইয়ের চেষ্টা দেখানো হয়েছিল, জবাই হয়ে গিয়েছেন এটা দেখানো হয়নি। সুতরাং নির্দেশিত হুকুম পালনে, যা তার করণীয় ছিল, তিনি এরইমধ্যে করে দেখিয়েছেন এবং এতে কোনরূপ ত্রুটি করেননি। সুতরাং তার পরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে এবং তিনি এতে পরম সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের পরিবর্তে কুরবানী সম্পন্ন করার জন্য জাহ্নাত থেকে ভেড়া প্রেরণ করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইরশাদ করেন, **إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ** এভাবে আমি খাঁটি বান্দাদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০৫)

অর্থাৎ যারা আমার হুকুম সর্বশক্তি দিয়ে তামিল করতে সচেষ্ট হয়, আমি তাদের দুনিয়ার কষ্ট থেকে নাজাত দিয়ে দিই। আর আখিরাতের পুরস্কার তো আছেই। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, **وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ**

অর্থঃ আর আমি ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের পরিবর্তে জবাই করার জন্য দান করলাম এক শ্রেষ্ঠ জীব। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০৭)

বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার বাণী- **يَا إِبْرَاهِيمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا**

অর্থঃ “হে ইবরাহীম, নিশ্চয় আপনি স্বপ্নের নির্দেশ পালন করেছেন”- শুনে উপরের দিকে তাকিয়ে হযরত জিবরাইল ‘আলাইহিস সালামকে একটি ভেড়া নিয়ে উপস্থিত দেখতে পান। এই জান্নাতী ভেড়া হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে দেওয়া হলে, তিনি আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কুরবানী করেন।

যেহেতু এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল, সুতরাং কুরবানী কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ রইলো না এবং ভেড়াটিও বরকতময় হওয়া সন্দেহাতীত ছিল। এজন্য একে “শ্রেষ্ঠ জীব” বলা হয়েছে। এই ভেড়াটি হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের পুত্র হাবিলের কুরবানীর জন্তু। কিয়ামতের পর মৃত্যুকে এটির আকৃতি দিয়ে পুনরায় জবাই করা হবে।

উক্ত কুরবানী আল্লাহ তা‘আলার নিকট এত পছন্দনীয় হয় যে, তিনি এ নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখার জন্য তখনই সামর্থ্যবান মুমিনদের উপর পশু কুরবানীকে বিধান করে দেন।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়েকেরামকে জিলহজ্জ মাসের ১০, ১১, ১২ তারিখে পশু কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন, তখন সাহাবীগণ এ বিধানের তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ‘আলাইহিস সালামের সুন্নত ও নিদর্শন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বললেন যে, এর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে তোমাদের নেকি দেওয়া হবে। তিনি আরো ইরশাদ করেন, এ

কুরবানীর রক্ত যমিনে পড়ার আগেই তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়।

স্মর্তব্য যে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কর্তৃক ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের কুরবানীর ঘটনা মিনায় সংঘটিত হয়েছিল। তাই এ স্থানেই হজ্জের সময় কুরবানী আদায় করা হয়। এভাবে আজ পর্যন্ত হজ্জ আদায়কারীগণ এই স্থানে কুরবানী আদায় করে সেই পবিত্র স্মৃতি ধারণ করে আছেন।

উল্লেখ্য, মিনা ময়দানের পূর্বপ্রান্তের যে স্থানে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানীর মহান ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সে স্থানটি সুরণীয় করে রাখার জন্য সেখানে পরবর্তীকালে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, যার নাম মাসজিদুল কাবাহ।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে কাবা শরীফ নির্মাণের নির্দেশ
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

অর্থঃ যখন আমি ইবরাহীমকে কাবাঘরের স্থান জানিয়ে দিলাম যে, (এটা ইবাদতের জন্য পুনর্নির্মাণ করুন) এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবেন না। আর আমার এই ঘরটি পবিত্র রাখুন তাওয়াফকারীদের জন্য, (নামাযে) দণ্ডায়মান লোকদের জন্য এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য। (সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৬)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে মক্কা মুকাররমায় কাবা-বাইতুল্লাহ শরীফ পুনর্নির্মাণ এবং এই সম্পর্কিত বিশেষ নির্দেশ প্রদানের কথা ইরশাদ হয়েছে।

আরবী অভিধানে اٰلِ শব্দের অর্থ হচ্ছে কাউকে ঠিকানা বা অবস্থানের ঘর দেওয়া। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হলো আমি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে কাবা শরীফের অবস্থান গ্রহণের ঠিকানা দিয়েছি। এতে বুঝা যাচ্ছে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পূর্ব থেকে এ ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়াতের আলোকে এ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সিরিয়ার বসবাস করতেন। সেখান থেকে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে প্রথমত স্ত্রী হাজেরা ও স্নেহের পুত্র ইসমাইল ‘আলাইহিস সালামকে রেখে যান, পরবর্তীকালে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে তিনি এখানে হিজরত করে চলে আসেন।

অতঃপর আয়াতে “মাকানাল বাইত” শব্দ দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাবাঘর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতে জানা যায় কাবা শরীফের প্রথম নির্মাণ করা হয়েছিল হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের পৃথিবীতে আগমনের আগে অথবা সাথে সাথে। বর্ণিত আছে, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম ও তৎপরবর্তী নবীগণ বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতেন।

তাই পবিত্র কুরআনে কাবাঘরকে মানুষের জন্য নির্মিত পৃথিবীর প্রথম ঘর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, “নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য নির্মিত হয়েছে তা সেই ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত (কাবা-বাইতুল্লাহ শরীফ)। তা জগতবাসীদের জন্য বরকতময় ও হেদায়েতশূল।”

কাবাঘর সর্বপ্রথম কে নির্মাণ করেন?



কাবাঘর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কে নির্মাণ করেন, এ ব্যাপারে একাধিক মত পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, ফেরেশতাগণ সর্বপ্রথম কাবাঘর নির্মাণ করেছেন। তারপরে তার পুনর্নির্মাণ করেছেন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম। আবার কারো মতে, ফেরেশতারা না, বরং হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম কাবাঘরের প্রথম নির্মাণকারী।

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সেই কাবাঘরটি হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তারপর হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের সময় মহাপ্লাবনের মুহূর্তে কাবাঘরের প্রাচীর আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। তারপর মহাপ্লাবনের কারণে তা যমিনে ঢাকা পড়ে যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাগণের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে কাবা শরীফের সেই ভিত্তির অবস্থান জানিয়ে দেন এবং তার কাছে সেটি উন্মুক্ত করে দেন। সেই আদি ভিত্তির উপরই হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কাবাঘর অর্থাৎ বাইতুল্লাহ শরীফ পুনর্নির্মাণ করেন।

কিন্তু প্রখ্যাত মুফাসসীর, মুহাদ্দীস ও ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, কোন সহীহ ও অকাট্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আগে কাবা শরীফ নির্মিত হয়েছে বলে উল্লেখ পাওয়া যায় না। যারা সূরা হাজ্জে বর্ণিত (ঘরের স্থান) দিয়ে তা প্রমাণ করার প্রয়াস পান, সেটা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা ‘ঘরের স্থান’ কথাটি পূর্ব থেকেই ঘর নির্মিত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। আসলে “ঘরের স্থান” বলে এখানে আল্লাহ তা‘আলা যে তার ইলমের মধ্যে পূর্ব থেকেই এই স্থানটিকে



বাইতুল্লাহ শরীফের জন্য নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করে রেখেছিলেন, তা বুঝানো হয়েছে। আর এই কারণেই হযরত আদম “আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে সকল নবী ‘আলাইহিস সালামের কাছে এই স্থানটি সম্মানিত ছিল। যদিও সেখানে ঘরের স্বরূপ ছিল না।

তিনি আরও বলেন, আমরা যে বলে থাকি, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম একটি (লাল ইয়াকুতের) গম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন এবং ফেরেশতাগণ তাকে বলেছিলেন, আপনার পৃথিবীতে আগমনের আগেই আমরা এই ঘরের তাওয়াফ করেছি এবং অনুরূপ হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের কিশতী চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই স্থানে ঘুরপাক খেয়েছিল ইত্যাদি যেইসব তথ্য বর্ণনা করা হয়, মূলত এগুলো ইসরাইলী রেওয়ায়াত নির্ভর। সে জন্য নিয়ম অনুযায়ী এগুলোকে আমরা সত্যায়নও করবো না, আবার মিথ্যাপ্রতিপন্নও করবো না। আর সহীহ বর্ণনা হিসাবে যাকে আমরা কাবা শরীফের সর্বপ্রথম নির্মাতা হিসাবে পেয়েছি, তাকেই প্রথম নির্মাতা হিসাবে ধরে নিব। আর তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম। (আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. প্রণীত কাসাসুল আশ্বিয়া, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

অপরদিকে তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে ৪নং ও ১৭নং পারায় মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. যে তাফসীর বর্ণনা করেছেন, তাতে বিভিন্ন হাদীস দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, কাবা শরীফের প্রথম নির্মাতা আল্লাহর নির্দেশে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম। এটিই প্রসিদ্ধ ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত। আর এর সাথেই প্রথমে উল্লেখকৃত আয়াতের বর্ণনা, কাবা শরীফ পৃথিবীর প্রথম ঘর হওয়ার বিষয়ের অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তো আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে সিরিয়া থেকে মক্কায় এসে প্রথমবার তার স্ত্রী হাজেরা ও স্নেহাস্পদ পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামকে মক্কার সেই জনমানবশূন্য প্রান্তরে রেখে যান। এরপর আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে, প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামকে কুরবানী করার জন্য দ্বিতীয়বার আসেন। পরে তার ফিদিয়া হিসাবে জন্তু কুরবানী করেন। এসম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা আগে উল্লেখ হয়েছে।

অতঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যখন তৃতীয়বার স্ত্রী-পুত্রের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য মক্কায় আগমন করেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে পবিত্র কাবাঘর নির্মাণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

উক্ত নির্দেশ পেয়ে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম স্বীয় পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামকে বললেন, “বৎস, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের আদেশ করেছেন।” ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, নির্দিধায় তা সম্পন্ন করুন।” ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “তুমি কি আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে?” ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম জবাব দিলেন, “কেন নয়, অবশ্যই আমি আপনার সহযোগী হবো।” তখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম উক্ত নির্দেশের ব্যাখ্যা করে বলেন, “আমার প্রতিপালক আমাকে তার ঘর নির্মাণের আদেশ করেছেন।” এই বলে তিনি পার্শ্ববর্তী একটি টিলার দিকে ইঙ্গিত করে ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামকে বাইতুল্লাহ শরীফের স্থান দেখিয়ে দেন।

অতঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাইল ‘আলাইহিস সালাম উভয়ে মিলে বাইতুল্লাহ শরীফের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। হযরত ইসমাইল ‘আলাইহিস সালাম পার্শ্ববর্তী পাহাড় থেকে পাথর বহন করে আনতেন, আর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পাথরের উপর পাথর রেখে গাঁথুনি দিয়ে দেয়াল নির্মাণ করতেন। এভাবে পবিত্র কাবা শরীফের নির্মাণ কাজ চলতে থাকে। (মাহমুদ মিসরী রহ. প্রণীত কাসাসুল আশ্বিয়া, ২০৪)

কাবাঘরের দেয়াল নির্মাণের একপর্যায়ে যখন দেয়াল উঁচুতে উঠে গেল এবং যমিনে দাঁড়িয়ে গাঁথুনি তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে গাঁথুনির কাজ অব্যাহত রাখলেন। এটিই সেই ঐতিহাসিক পাথর, যাকে কুরআনে কারীমে “মাকামে ইবরাহীম” নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পাথর বর্তমানে কাবা শরীফের সন্নিকটে বেষ্টনকৃত জালিতে স্থাপিত আছে। কাবা শরীফের তাওয়াফের সময় এই স্থানে দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, “তোমরা মাকামে ইবরাহীমের নিকট মুসাল্লা (নামাযস্থল) বানাও”। আশ্চর্যের বিষয় যে, আজও মাকামে ইবরাহীমের সেই ঐতিহাসিক পাথরে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পায়ের ছাপ বিদ্যমান রয়েছে।

বর্ণিত আছে, কাবা শরীফ নির্মাণকাজে সেই মাকামে ইবরাহীম পাথরটি স্বয়ংক্রিয় লিফটের কাজ দিত। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম উপরে ওঠা বা নিচে নামার প্রয়োজন অনুসারে সেটাকে নির্দেশ দিতেন। তখন তা আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে কুদরতীভাবে সেরূপেই উঁচুতে উঠতো এবং নিচে নামতো।



হযরত জাহমের বর্ণনা মতে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নির্মিত কাবাঘরে ছাদ দেওয়া ছিল না। উপরের দিকটি ছিল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এমনকি তাতে কোন প্রবেশদ্বারও ছিল না। তবে দরজার স্থানে ধনভাণ্ডার হিসাবে একটি কূপ খনন করা হয়েছিল। বাইতুল্লাহ শরীফের উদ্দেশ্যে মানুষের দানকৃত যাবতীয় ধনসম্পদ সেখানে সংরক্ষণ করা হতো। (মাহমুদ মিসরী রহ. প্রণীত কাসাসুল আশিয়া)

কাবাঘর শিরকমুক্ত রাখার নির্দেশদানের হেকমত

কাবা শরীফের কাছে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে পুনর্বাসিত করার পর আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেন,

أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا

অর্থঃ আমার সাথে (ইবাদতে) কাউকে শরীক করবেন না।

এতে শিরক না করার নির্দেশের মুখ্য উদ্দেশ্য ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নন। কেননা, তিনি শিরক করবেন-এরূপ কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ তা‘আলার জন্য তার ইখলাস ও আত্মত্যাগ এবং এ ব্যাপারে কঠিন কঠিন পরীক্ষায় তার উত্তীর্ণ হওয়া আর মুশরিকদের মোকাবেলা ইত্যাকার ঘটনা এর চাম্ফুষ প্রমাণ। তা ছাড়া নবীগণ থেকে কোন গুনাহর কথা কল্পনাও হতে পারে না। সুতরাং এখানে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে নসীহত করে সাধারণ মানুষকে শোনানো উদ্দেশ্য, যাতে তারা কখনোই শিরকের কাছে ধারেও না যায়। বস্তুত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে সম্বোধনের মাধ্যমে কথাটি জোরালো করা হয়েছে। কেননা, এতে মানুষ মনে করবে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের মতো জালীলুল কদর নবীকে যখন এ

কাজে নিষেধ করা হলো, তখন তো আমাদের এ ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকতে হবে। এরপর আল্লাহ তা‘আলা আদেশ করেন,

وَطَهِّرْ بَيْتِي

অর্থঃ আমার ঘর পবিত্র রাখুন...।

তখনও সেখানে বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মিত হয়নি, তারপরও বাইতুল্লাহ শরীফকে পবিত্র রাখার কথা বলা হয়েছে এই ভিত্তিতে যে, মূলত বাইতুল্লাহ প্রাচীরের নাম নয়, বরং যে পবিত্র স্থানে আগে বাইতুল্লাহ নির্মিত ছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটাই মূল বাইতুল্লাহ। এটা সবসময়ই বিদ্যমান ছিল।

একে পবিত্র করার আদেশদানের বিশেষ কারণ হলো সেসময়ও জুরহুম ও আমালিকা সম্প্রদায় সেখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মূর্তির পূজা করতো। (কুরতুবী)

তেমনি এই আদেশটি পরবর্তী লোকদের শোনানোও উদ্দেশ্য, যাতে তারা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকে।

এখানে বাইতুল্লাহ শরীফকে পবিত্র করার দ্বারা কুফর ও শিরক থেকে তাকে পবিত্র রাখা বুঝানো হয়েছে। তেমনিভাবে বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকে তাকে পবিত্র রাখার বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে এ নির্দেশ দিয়ে দুনিয়ার মানুষদের এ ব্যাপারে সাবধান করা উদ্দেশ্য। কারণ, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তো এই মহৎ কাজ এমনিতেই করতেন। তা সত্ত্বেও তাকে সম্বোধন করে এ নির্দেশ দেওয়ার দিয়ে তাকিদ করা হয়েছে যে, যখন তাকেই এ কাজ করতে বলা

হচ্ছে, তখন অন্যদের এ কাজের গুরুত্ব কতটুকু তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দু‘আর বরকত

আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ পেয়ে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাইল ‘আলাইহিস সালামকে নিয়ে কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। পবিত্র কাবা-বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণকালে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাইল ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার কাছে বিশেষ দু‘আ করেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۖ وَإِنَّا مَوَدُّكَ عَلَىٰ بَيْنِنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

অর্থঃ যখন ইবরাহীম (‘আলাইহিস সালাম) কাবাঘরের প্রাচীর নির্মাণ করতে লাগলেন এবং তার (সহযোগীরূপে) ইসমাইল, তখন তারা দু‘আ করলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পক্ষ থেকে (এটা এবং আমাদের সকল মেহনত) কবুল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছু শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের আপনার অনুগত বানিয়ে দিন এবং আমাদের বংশধর থেকে এমন এক উম্মত বানিয়ে দিন, যারা আপনার অনুগত হবে। আর আমাদের হজ্জের নিয়মকানুন অবগত করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই



মহান্ধমশীল ও পরম দয়াবান। হে আমাদের প্রতিপালক, আর আপনি তাদের মধ্যে (আমাদের উম্মতের মধ্যে তথা হযরত ইসমাইলের খান্দানে) এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদেরই মধ্য থেকে হবেন, যিনি তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন এবং তাদের কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয় আপনি সর্বময় ক্ষমতাবান ও মহান সংবিধানকারী। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৭-১২৯)

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাইল ‘আলাইহিস সালাম কাবা শরীফ নির্মাণকালীন উক্ত দু‘আয় আল্লাহ তা‘আলার কাছে চারটি বিষয়ে আবেদন করেছেন। আল্লাহ তা‘আলার দয়া যে, তিনি তার সবগুলো আরজিই কবুল করেছেন। নিচে এসম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হলো।

প্রথম আবেদনঃ দীনের যাবতীয় মেহনত কবুল করা

প্রথমত হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গে ইসমাইল ‘আলাইহিস সালাম তাদের নির্মিত কাবা শরীফ এবং অন্যান্য সকল দীনী মেহনত কবুল করার জন্য দু‘আ করেছেন। নবীগণের ইবাদত-আমল কবুল হওয়ারই কথা। তারপরও এ ব্যাপারে তাদের দু‘আ করা বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের ভীতি ও শঙ্কার পরিচায়ক, যা তাদের ঈমানী গুণ। কেননা, কোন নেক কাজ করার পর তা আল্লাহর নিকট কবুল হলো কি না- এ ব্যাপারে ভীত থাকা এবং তা কীভাবে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে- তার ফিকির করা খাঁটি মুমিনের আলামত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۝

অর্থঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় যা দান করার তা দান করে, আর তাদের অন্তর ভীত ও কম্পিত থাকে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তারা কল্যাণ অর্জনে দ্রুতগামী এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (সূরা মুমিনুন, আয়াত: ৬০-৬১)

এ ছাড়াও কবুলিয়াতের দু‘আর মধ্যে নিজেদের নেক কাজের উপর ফখর ও অহম না করার পরিচয় বহন করে। এতে বান্দার আযিযী ও এনকেসারী প্রকাশ পায়, যা মুমিনের বিশেষ গুণ।

দ্বিতীয় আবেদনঃ মুসলিম বানানো

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম দ্বিতীয়ত এই দু‘আ করেন যে, আল্লাহ তা‘আলা যেন তাঁদের তাঁর মুসলিম (অনুগত) বান্দা এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে মুসলিম উম্মত বানিয়ে দেন।

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলার অনুগত বান্দা। তারপরও তাঁরা তাঁদের অনুগত বান্দা বানানোর আবেদন করে আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাদের নিজেদের আযিযী ও অক্ষমতা পেশ করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের মনে হচ্ছে, তাঁদের আরো অনুগত হতে হবে।

এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার যতবেশি মারেফাত তথা আল্লাহর বড়ত্বের জ্ঞান অর্জিত হবে, তিনি ততবেশি অনুভব করবেন যে, তাঁর দিয়ে আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য ঠিকমত আদায় হচ্ছে না। তাই তিনি আরো বেশি বেশি আমল করতে

সচেষ্টি হবেন। এটা আল্লাহ তা‘আলার দরবারে অধিক মরতবা হাসিলেরই প্রক্রিয়া।

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম এখানে তাঁদের মুসলিম বান্দা বানানোর আরজির পাশাপাশি তাঁদের সন্তানদের “উম্মতে মুসলিমা” বানানোর আবেদন করেছেন। আবার অন্যত্র তাঁরা সন্তানদের এ ব্যাপারে ওসিয়্যাত করে বলেছেন,

وَلَا تَتُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

অর্থঃ তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১০২)

এই দু‘আর মাধ্যমে তাঁরা আখিরী উম্মত তথা উম্মতে মুহাম্মদীকে মুসলিমরূপে পরিগণিত করার আবেদন করেছেন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও ইসমাইল ‘আলাইহিস সালামের সেই মনোবাসনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা তাদের বংশধরস্তু নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের নাম মুসলিম আর তাদের ধর্মের নাম ইসলাম রেখেছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُكُمُ الْمُسْلِمِينَ

অর্থঃ এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনিই এর আগে তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন। (সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৮)

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তথা ইহুদী, খ্রিস্টান, এমনকি মুশরিক-হিন্দুরাও দাবি করে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের (আবরাম বা ব্রাহ্ম-এর) অনুসারী। এটা তাদের ভুল ধারণা ও মিথ্যা দাবি। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদী ধর্ম তথা ইসলামই শেষ



যামানায় একমাত্র ইবরাহীমী ধর্ম বা মিল্লাতে ইবরাহীমিয়া। তা উক্ত আয়াত দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয় আবেদনঃ হজ্জের নিয়ম শিক্ষাদান

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তৃতীয়ত দু‘আ করেন, আমাদের হজ্জের নিয়মকানুন অবগত করুন।

বর্ণিত আছে, এই দু‘আর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম আগমন করেন এবং হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে বাইতুল্লাহ শরীফের স্থানে নিয়ে গিয়ে তাকে এর প্রাচীর নির্মাণ করতে বলেন। নির্মাণ শেষে হযরত জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম তাকে নিয়ে একের পর এক হজ্জের স্থানসমূহে নিয়ে গিয়ে এ পবিত্র স্থানসমূহকে শাআয়িরুল্লাহ তথা আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ নিদর্শন হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেন এবং এখানে হজ্জের কার্যাদি তথা বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ), সাফা-মারওয়ার সায়ী (দৌড়ানো), মিনায় তিন জামারায় রমী (কংকর নিক্ষেপ), আরাফা ও মুযদালিফার উকূফ (অবস্থান) প্রভৃতি শিক্ষা দেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১:২৫১)

চতুর্থ আবেদনঃ তাদের উম্মতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম সবশেষে আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করেন, “পরওয়ারদিগার, আমাদের বংশধরদের মধ্যে মহান এক রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি উম্মতের নিকট আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনাবেন এবং উম্মতকে কিতাব (পবিত্র কালামুল্লাহর ইলম) শিক্ষা দিবেন, তাদের দীনের ইলম ও প্রজ্ঞা



শিক্ষা দিবেন, আর তাদের তাযকিয়া (আত্মিক পরিশুদ্ধতা) দান করবেন।”

আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের এই দু‘আ কবুল করে সাইয়েদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী ও সর্বশেষ রাসূল হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। এসম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

অর্থঃ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অতি বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব (কুরআন) ও হেকমত (হাদীস ও দীনী ইলম) শিক্ষা দেন। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৬৪)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট যে চারটি মহাগুণসম্পন্ন একজন রাসূলের আবেদন করেছিলেন, হুবহু সেই চারটি মহাগুণসম্পন্ন রাসূলরূপে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের সুসংবাদ এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

তবে বিশেষ হেকমতস্বরূপ এখানে সেসব গুণ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় কিছুটা আগ-পিছ করা হয়েছে। আবেদনের ক্ষেত্রে তাযকিয়া (উম্মাতকে পরিশুদ্ধ করা)-এর গুণটি বলা হয়েছে চার

নম্বরে, আর সুসংবাদের ক্ষেত্রে সেটিকে আনা হয়েছে দুই নম্বরে। আহলে দিল আলেমগণ এর দুটি হেকমত বর্ণনা করেছেন।

১. আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব সঠিকভাবে তুলে ধরতে এটা করা হয়েছে।
২. একথা বুঝানো হয়েছে যে, নববী যিম্মাদারির ধারাক্রম অনুযায়ী এটি চতুর্থ স্থানে হলেও কার্যক্ষেত্রে এর গুরুত্ব কিতাব ও হেকমতের তালিমের তুলনায় আগে।

বস্তুত এই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অর্জন দীনী সকল কাজের সম্পূরক এবং সকল ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। সুতরাং এটা ছাড়া কিতাব ও দীনের তালীম পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকল নবী-রাসূলের দীন কায়েমের তরীকা ছিল এক ও অভিন্ন। সেটা হলো, দীনের জরুরী পাঁচটি বিষয়- ঈমানিয়াত, ইবাদত, মু‘আমালাত, মু‘আশারাত ও তাযকিয়া বাস্তবায়ন করা। আর এ লক্ষ্যে তারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উল্লিখিত নববীগুণের চার তরীকায় মেহনত করেছেন। তাদের এ মেহনতের বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে কারীমের চার স্থানে বর্ণনা করেছেন। যথা, সূরা বাকারা- আয়াত নং ১২৯, সূরা বাকারা- আয়াত নং ১৫১, সূরা আলে ইমরান- আয়াত নং ১৬৪ এবং সূরা জুমআ- আয়াত নং ২।

সুতরাং এখন যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিস হয়ে উম্মতের মধ্যে নবীওয়ালা যিম্মাদারী আদায় করতে বা দীন কায়েমের মেহনত করতে চান, তাদের প্রথমত নবীওয়ালা দাওয়াতের পাঁচটি গুণের বিষয়ে যত্নবান থেকে হবে।

১. ঈমান সহীহ ও শিরকমুক্ত হতে হবে।



২. ইবাদতগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী করতে হবে।

৩. রিযিক হালাল রাখতে হবে।

৪. সতর্কতার সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে যাবতীয় হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক আদায় করতে হবে।

৫. আত্মার রোগসমূহের ইসলাহর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে। এ পর্যায়ে সকল গুনাহ বর্জন করতে হবে এবং ভালো গুণাবলী অর্জন করতে হবে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭৭)

অতঃপর তাদের পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবীওয়ালা তরিকায় উম্মতের মধ্যে দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে চার পদ্ধতিতে মেহনত করতে হবে।

১. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتُكَ এর মর্ম অনুযায়ী উম্মতের নিকট কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করবেন। এর জন্য বিশেষভাবে কুরআনী মাদরাসা কয়েম করতে হবে এবং সেখানে সবার জন্য সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শিক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

এক্ষেত্রে বর্তমান প্রচলিত নুরাণী, নুরিয়া বা নাদিয়া ট্রেনিং পদ্ধতির কুরআনী মকতব ও বয়স্কদের কুরআন শিক্ষাকোর্স বেশ ফলদায়ক হতে পারে।

২. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ এর মর্ম অনুযায়ী উম্মতকে কিতাব তথা কুরআনের বিশদ ইলম শিক্ষা দিবেন। এর জন্য মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তাফসীরসহ বিশদ ইলম শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক তাফসীরকোর্স এবং পবিত্র কুরআনের বিশদ ইলম অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণকোর্স বিশেষ ফায়োদাজনক থেকে পারে।

৩. **وَالْحِكْمَةُ** এর মর্ম অনুযায়ী দীনের প্রজ্ঞা তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফ ও সুন্নত-আদর্শ তথা পূর্ণাঙ্গ ইলমে দীন শিক্ষা করা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

এর জন্য পরিপূর্ণ মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সিহাহ সিভাহসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমুদয় হাদীস শরীফ ও তার আলোকে প্রণীত ফিকহী কিতাবের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

এ ছাড়াও যারা ছোটকালে দীন শিক্ষা ও দীনের বুঝ হাসিলের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি, তাদের জন্য প্রচলিত তাবলিগী জামা‘আতে शामिल হয়ে দীন ও ঈমানের বুঝ ও জ্ঞান অর্জন বিশেষ ফলদায়ক হবে।

৪. **وَالْعَمَلُ** এর মর্ম অনুযায়ী দীনের ধারক-বাহকদের ইলমেদীন শিক্ষা করা ও শিক্ষাদানের পূর্ণাঙ্গ মেহনতের পাশাপাশি নিজেদের এবং উম্মাতের তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মিক ইসলাহর ব্যবস্থা করতে হবে। এ পর্যায়ে মুজাহাদার মাধ্যমে আত্মার যে দশটি রোগ বা ব্যাধি রয়েছে, এগুলো অন্তর থেকে দূর করে আত্মার যে দশটি গুণ রয়েছে, সেগুলো অন্তরে হাসিল করতে হবে। এর জন্য হক্কানী শায়েখ বা ইসলাহী মুরব্বির মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক মুজাহাদা ফলপ্রসূ হয়।



মোদাকথা, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাইল ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট যেসকল গুণসম্পন্ন রাসূল প্রেরণের জন্য দু‘আ করেছেন এবং আল্লাহ তা‘আলা যে মহান গুণাবলীতে পরিপূর্ণ করে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, সেইসব গুণ দীনের প্রত্যেক দায়ী ও ধারক-বাহকের জন্য একান্ত আবশ্যিক। এসব গুণ নিজের মধ্যে আনয়ন করে উম্মতের মধ্যে দীন প্রতিষ্ঠার মেহনত করার যে ফর্মুলা এখানে বর্ণনা করা হলো, সহীহ নকশায় দীনের খেদমত আনজাম দিতে তা পুরোপুরি মেনে চলা কর্তব্য।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে হজ্জের ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ বাইতুল্লাহ শরীফ-এর নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের প্রতি দুনিয়ার ঈমানদার মানুষদের কাবা শরীফে এসে হজ্জ সম্পাদন করার জন্য ঘোষণা দানের নির্দেশ প্রদান করেন। সেই নির্দেশে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِذْ قَالَ النَّاسُ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝
 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
 الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ۝ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْفُوا
 نُدُورَهُمْ وَلِيُطَوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

অর্থঃ (হে ইবরাহীম,) আপনি মানুষদের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দিন। তা হলে তারা আপনার (নির্মিত বাইতুল্লাহর) নিকট পৌঁছাবে পায়ে হেঁটে এবং দুর্বল উটসমূহে সওয়ার হয়ে। সেগুলো সুদূর পথ অতিক্রম করে পৌঁছাবে। যেন তারা নিজেদের উপকারের জন্য

উপস্থিত হয়। আর যেন (জবাই করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে (কুরবানীর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে) ঐ সকল নির্দিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুর উপর, যা আল্লাহ তাদের দান করেছেন। অতঃপর তোমরা ওগুলো থেকে খাও, আর বিপন্ন-অভাবগ্রস্তদের খাওয়াও। তারপর তারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং নিজ ওয়াজিব কাজসমূহ পূর্ণ করে। আর (ঐ নির্দিষ্ট দিনগুলোর মধ্যেই) নিরাপদ (কাবা) ঘরের তাওয়াফ করে। (সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৭-২৯)

আয়াতে **وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ** অর্থাৎ, “লোকদের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দাও” বলে হজ্জ ফরয হওয়ার ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম এই নির্দেশ পেয়ে আল্লাহ তা‘আলার কাছে আরজ করলেন, “ইয়া রাক্বাল ‘আলামীন, এই জনমানবহীন প্রান্তরে আমার ঘোষণা কে শুনবে? আর জনপদসমূহে আমার ঘোষণা পৌঁছাবে কী করে?” আল্লাহ তা‘আলা বললেন, “আপনি ঘোষণা করুন। আমি আপনার ঘোষণা সারাবিশ্বে পৌঁছে দেব।”

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে (মতান্তরে আবু কুবাইস পাহাড়ে আরোহণ করে) দুইকানে আগুল রেখে ডানে-বায়ে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে আওয়াজ দিলেন, “হে লোকসকল, আপনাদের রব আপন ঘর নির্মাণ করেছেন এবং আপনাদের সামর্থ্যবানদের উপর এই ঘরের হজ্জ ফরয করেছেন। আপনারা সবাই তার আদেশ পালন করুন।”

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের এই আওয়াজ পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছে দেন। তাতে তৎকালীন জীবিত লোকেরা তো বটেই, কিয়ামত পর্যন্ত

আগমনকারী সকল মানুষের কাছে এই আওয়াজ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ তা‘আলা যাদের ভাগ্যে হজ্জ লিখে রেখেছেন, তারা বা তাদের রুহ সেই আওয়াজের জবাবে “লাব্বায়িক” (আমি হাজির আছি) বলে সাড়া দিয়েছিলেন।

অতঃপর হজের জন্য বাইতুল্লাহ শরীফে মানুষের আগমনের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাইতুল্লাহর যিয়ারতে আসতে থাকবে। তাদের কেউ বাহনজন্তুর অভাবে অথবা দূরত্ব কম হওয়ায় পায়ে হেঁটে আসবে, আবার কেউ আসবে সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তাদের অনেকেরই লম্বা সফরের ফলে তাদের বাহন জন্তুগুলো দুর্বল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ তারা বহু দূর-দরাজ থেকে আসবে।

আয়াতের মর্ম এটাই। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সওয়ারীর জন্য মানুষ শুরুতেই দুর্বল উট নির্বাচন করবে।

আল্লাহ তা‘আলার কুদরত যে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সেই হজ্জের দাওয়াতের পর মানুষ দলে দলে পবিত্র কাবা-বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ সম্পাদনের জন্য আগমন করতে থাকেন। সেই ঘোষণার পর থেকে কত শত বছর বরং কত হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সেদিনের সেই আহ্বানে “লাব্বায়িক” বলে সাড়া দানকারীগণ আজও বাইতুল্লাহর মুসাফির হয়ে হজ্জ ও উমরার নিয়তে পবিত্র বাইতুল্লাহর পানে অবিরাম ছুটে চলেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকবে। তাদের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের যুগে যেমন বাইতুল্লাহর সফরকারী বিদ্যমান ছিলেন, তেমনি তার পরের সকল নবী ও তাদের মুমিন উম্মতগণ ব্যাপকভাবে বাইতুল্লাহর সফরকারী

ছিলেন। এমনকি জাহেলীযুগের মুশরিকরাও গুরুত্ব দিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফে এসে হজ্জ পালন করতো। আর উম্মাতে মুহাম্মাদী তো বরাবরই বাইতুল্লাহর মুসাফির। এভাবে করে বাইতুল্লাহ শরীফে গমনকারীদের পরিসংখ্যান নিরূপণ দুঃসাধ্য।

বলাবাহুল্য, সত্যের আওয়াজ যখন ইখলাসের সঙ্গে সহীহ তরিকায় উচ্চারিত হয়, তখন তা আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়ে যায়। আর এর ফলে তার প্রভাব ও ফল সুদূরপ্রসারী হয়। যেমন, এই যুগে হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর প্রবর্তিত দাওয়াতুল হক এবং তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর মেহনতের ফসল তাবলিগী জামা‘আত ব্যাপকভাবে দীনের খেদমত আনজাম দিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ এর মাধ্যমে সর্বত্র সহীহ দীনের দীক্ষা পেয়ে দলে দলে এতে शामिल হচ্ছে।

এরপর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, হজ্জের এই সফর তাদেরই উপকারের জন্য। হজ্জের পরকালীন অসংখ্য উপকারের একটি উল্লেখযোগ্য উপকার হলো, যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ করে এবং হজ্জের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে মুক্ত থাকে, সে এমন নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে যে, তার মা যেন সেদিনই তাকে জন্মদান করলো। (বুখারী, মুসলিম)

আর পার্থিবভাবেও এতে প্রভূত উপকার হয়। তন্মধ্যে একটি হলো, সহীহভাবে হজ্জ সম্পাদনকারী কখনো দরিদ্র ও নিঃস্ব হন না। ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যায় না যে, হজ্জ কার্যে ব্যয় করার কারণে মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেছে। অথচ অন্যান্য কাজে



হজ্জের চেয়ে কম ব্যয় করেও সর্বস্বান্ত হওয়ার নথির ভুরি ভুরি বিদ্যমান। (তফসীরে মা'রিফুল কুরআন)

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হজ্জ আদায় করা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর ফরয করা হয়েছে। হজ্জ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান। তাই সামর্থ্যবান সকল মুসলমানের জন্য বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ ও যিয়ারত নসীব করুন। আর সকলকে তার সত্যিকার আশেক হয়ে জীবনযাপন করার তাওফীক দান করুন। এটা হজ্জ ও উমরার পরম উদ্দেশ্যও বটে। বাস্তবিকই হজ্জকারীরা আল্লাহর আশেক-পাগল। এজন্যই হাজী সাহেবান আশেক ও পাগলের ন্যায় শুধু দুটি চাদর পরে ইহরাম বেঁধে তাওয়াফ, সাযী, উকূফ, রমী প্রভৃতি আদায় করেন। কেউ কেউ তো মাশাআল্লাহ সত্যিকার অর্থেই “আল্লাহর পাগল” হয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন। আর বাকিদের সেটা সম্ভব না হলেও অন্তত পাগলের নকল বেশ ধারণ করেন। আর আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হলো, তিনি তাঁর নিজ দয়ায় নকল আশেকদেরও আসল আশেকদের সঙ্গে মিলিয়ে কবুল করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর আশেকদের কাতারে शामिल করে নিন। আমিন।

উপসংহার

পবিত্র কাবা-বাইতুল্লাহ শরীফ আল্লাহ তা'আলার একটি অপূর্ব নিদর্শন। কাবা শরীফ ভৌগোলিকভাবে পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। এতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষের গমনাগমনে সমান সুযোগ লাভ হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আগে কাবা শরীফের নির্মাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আগে করা হয়েছে। আর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পর কাবা শরীফের পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গে আল্লামা সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী রহ. বলেন, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পরে তিনবার বাইতুল্লাহর পুনর্নির্মাণ হয়েছে।

১. কুরাইশ কর্তৃক জাহেলীযুগে:

এই নির্মাণে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন যুবক। নির্মাণের এক পর্যায়ে হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপনের বিষয়টি নিয়ে চরম বিবাদ সৃষ্টি হয়। এমনকি যুদ্ধের আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম কৌশলে গোটা আরব একটি ভয়াবহ রক্তপাত থেকে রেহাই পায় এবং ব্যাপারটির উত্তম মীমাংসা হয়ে যায়।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কর্তৃক নির্মাণ:

তিনি শাসক থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছার প্রতিফলন করে কাবা শরীফকে হাতিমসহ নির্মাণ করেছিলেন। আর পূর্ব ও পশ্চিমদিকে দুটি দরজা তৈরি করেছিলেন এবং সহজে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সুবিধার্থে দরজাগুলো নিচুতে তৈরি করেছিলেন।

৩. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কর্তৃক নির্মাণ:

তিনি শাসক থাকাকালে ক্রোধ ও হিংসাবশত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর নির্মিত কাবাঘর ভেঙ্গে পুনরায় হাতিমের অংশ বাদ দিয়ে উঁচু করে এক দরজা বিশিষ্ট কাবা নির্মাণ করেন। এটাই অদ্যাবধি বিদ্যমান। (তাফসীরে রুহুল মা‘আনী)

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর কোন কোন শাসক পুনরায় কাবাঘরকে হাতিমসহ নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন মুসলিমবিশ্বের ইমাম (অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব) হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ., এভাবে যে যার খেয়াল-খুশিমতো খানায়ে কাবার ভাঙ্গা-গড়াকে নাজায়েয ও খানায়ে কাবার বেহরমতি বলে ফতোয়া প্রদান করেন। তার এই ফতোয়া সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। যার ফলে তখন তাতে হাত দেওয়া হয়নি। এরপর পরবর্তী বিভিন্ন যুগেও সেই ফতোয়ার কারণে কেউ কাবা পুনর্নির্মাণের সাহস করেননি। তবে যুগে যুগে কাবার প্রয়োজনীয় ছোটখাট সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। তা জরুরতের ভিত্তিতে হওয়ায় শরী‘আতের দৃষ্টিতে এতে কোন অসুবিধা নেই।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের জীবন উম্মতের জন্য শিক্ষা
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝

অর্থঃ উত্তম দীন তার চেয়ে আর কার হতে পারে, যে তার মস্তক আল্লাহর জন্য অবনত করেছে আর সে উত্তম আমলকারী এবং সে একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়েছেন। (সূরা নিসা, আয়াত: ১২৫)

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার একনিষ্ঠ বান্দা ও প্রিয় নবী ছিলেন। আল্লাহর হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন সর্বনিবেদিত। দুনিয়ার কোনকিছুই আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে



তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তাই তিনি আল্লাহ তা‘আলার অতিপ্রিয় পাত্র ও বন্ধু হয়েছিলেন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৩১)

শিরোনামের আয়াতে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের এই অনন্য মর্যাদা তুলে ধরে তাঁর অনুসৃত পথে আল্লাহ তা‘আলার হুকুমের সামনে বান্দাদের অবনত মস্তক হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের মিল্লাত বা তরীকাকে আদর্শ সাব্যস্ত করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আদর্শ জীবন মানবজাতির জন্য অনুকরণীয়। তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের জীবনের বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় দিক উল্লেখ করে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ঐ ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম সালায়ার পরিধান করেন, দীনের খাতিরে পিতা থেকে পৃথক হন, আল্লাহর হুকুম পালনে খাৎনা করেন (তখন তার বয়স ছিল ১২০ বছর), অপূর্ব মেহমানদারি করেন, আল্লাহর নির্দেশে হজ্জের ঘোষণা করেন এবং তিনি আল্লাহ তা‘আলার সকল পরীক্ষায় তথা জন্মভূমি ত্যাগ, পুত্র কুরবানী করা, ঈমানের জন্য আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া ইত্যাদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যার ফলে তিনি “খলীল” উপাধিতে ভূষিত হন।

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যেভাবে নিজেকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে সকলকিছু আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্যই করেছেন এবং আল্লাহর দীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করেছেন

আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে নিয়ম-নীতি অবলম্বন করেছেন, তার সেই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এ মর্মে তার জীবন থেকে আমাদের জন্য বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হলো,

১. কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ তা‘আলার কথা স্মরণ রাখা। যেমন, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নমরুদ কর্তৃক ভয়াবহ আগুনকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও আল্লাহ তা‘আলারই প্রতি নিবদ্ধ ছিলেন এবং অন্যকারো মুখাপেক্ষী হননি। (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত: ৬৯; তাফসীরে মাযহারী, ৬:১৩৫)

২. ঈমান রক্ষার জন্য প্রয়োজনে পিতা-মাতাসহ আত্মীয়স্বজন থেকেও বিচ্ছিন্ন হওয়া। যেমন, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম স্বীয় পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ঈমান রক্ষার জন্য অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ৪১; ৪৮)

৩. পরিপূর্ণ দীন মানার জন্য প্রয়োজনে জন্মভূমি ত্যাগ করা। যেমন, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নির্বিঘ্নে দীন পালনের জন্য জন্মভূমি দামেশক বা বাবেল (ইরাক) ত্যাগ করে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত: ৭১)

৪. সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুম মাথা পেতে মেনে নেওয়া। যেমন, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম প্রতিটি ক্ষেত্রে এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৪; সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০৪)

৫. দীনের প্রচারকার্যে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রয়োগ করা। যেমন, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যুক্তি ও প্রজ্ঞার সাথে মূর্তিপূজা ও চন্দ্র, সূর্য, তারকা পূজার মোকাবেলা করে এবং নমরুদের জন্ম ও মৃত্যুদানের অসার দাবি খণ্ডন করে দীনের কথা উপস্থাপন

করেছিলেন। (সূরা আনআম, আয়াত: ৭৬-৭৯; সূরা আশ্বিয়া, আয়াত: ৫৭-৬৭; সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৮)

৬. প্রচার ও সংশোধন কাজে সর্বক্ষেত্রে কঠোরতা না করা, বরং অবস্থাভেদে নম্রতার স্থলে নম্রতা ও কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করা। যেমন, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম দীন প্রচারে হেকমত অবলম্বন করেছিলেন। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ৪২-৪৫; (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ১৬-১৯)

৭. কাফের-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না রাখা। যেমন, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম এ ব্যাপারে আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৪৮)

৮. আল্লাহ তা‘আলার হুকুমের সামনে যুক্তি পেশ না করা। যেমন, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যুক্তির পিছনে না গিয়ে সরাসরি আল্লাহর হুকুম মানার দিকে এগিয়ে যান। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০০)

৯. নিজের সর্বাধিক প্রিয় বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত করা। যেমন, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নিজের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী পেশ করেছিলেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১১১)

১০. স্ত্রী-সন্তানের উপরে আল্লাহর হুকুম প্রাধান্য দেওয়া। যেমন, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে স্ত্রী-সন্তানের মায়া ত্যাগ করে তাদের মক্কার মরুপ্রান্তরে রেখে যান। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৭)

১১. বিভিন্ন কাজে পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করা। যেমন, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বিভিন্ন সময় আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ-আরজি পেশ

করেছেন। (সূরা শুআরা, আয়াত: ৮৩-৮৬; (সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৭-১২৯)

এভাবে মানবজাতির জন্য জীবনে অসংখ্য শিক্ষা রেখে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম একশত পঁচাত্তর বছর বয়সে মতান্তরে একশত নব্বই বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিল্লাতে ইবরাহীমীর ধারক বানিয়েছেন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৯; সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৬৪)

তাই তো ইসলামের অনেক বিধান হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের অনুসৃত আদর্শের স্বাক্ষর। সেই হিসাবে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম হলেন মুসলিম জাতির মহান পিতা। (সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৮; সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৬৭-৬৮; সূরা আনআম, আয়াত: ১৬১)

সমাপ্ত

হযরত নুত 'আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com



সূচীপত্র

লুত ‘আলাইহিস সালামের কওমের প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি

কওমে লুতের অবাধ্যতা

লুত ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান

যেভাবে আযাব এলো

আযাবের ধরন

ঘটনা থেকে শিক্ষা

بِسْمِ اللَّهِ

লূত ‘আলাইহিস সালামের কওমের প্রতি

আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
 أَمِينٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۚ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۝

অর্থঃ কওমে লূত (হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়) নবীদের মিথ্যাবাদী বলে উক্তি করেছে। যখন তাদের ভাই হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তাদের বললেন, তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত পয়গাম্বর। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো বিশ্ব পালনকর্তার কাছে রয়েছে। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৬০-১৬১)

হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর পিতার নাম ছিল “হারান”। বাল্যজীবনে হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তাঁর চাচা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নিকট লালিতপালিত হতে থাকেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে তিনি বড় হন।

তাঁদের উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহরে। সেখানে তখন মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বংশধরগণও



মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। সেই জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে পয়গাম্বর করে পাঠান। কিন্তু সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরুদের আগুন পর্যন্ত গড়ায়। আর তাঁর পিতা তাঁকে ঘর থেকে বহিস্কার করার হুমকি দেন।

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নিজ পরিবারের মধ্যে তখন শুধু সহধর্মিণী হযরত সারাহ ও ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম মুসলমান ছিলেন। আর এই দুজনই হলেন মিল্লাতে ইবরাহীমের সর্বপ্রথম মুসলমান। নিম্নোক্ত আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে,

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

অর্থঃ অতঃপর হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তাঁর (হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের) প্রতি ঈমান আনলেন। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে হিজরত করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ২৬)

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সহধর্মিণী হযরত সারাহ ও ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে স্বদেশ ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্ডান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কিনানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। এই এলাকাটি বাইতুল মুকাদাসের কাছাকাছি অবস্থিত।

হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা‘আলা নবুওয়্যাত প্রদান করে জর্ডান ও বাইতুল মুকাদাসের মধ্যবর্তী সাদুম

অঞ্চলের অধিবাসীদের পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এই এলাকায় সাদুম, আমুরা, উমা, সাবুবিম, বালে বা সুগার নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে এগুলোর সমষ্টিতে মু‘তফিকাহ (مُتَفَكِّهَات) ও মু‘তফিকাত (مُتَفَكِّهَات) শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব শহরের মধ্যে সাদুমকেই রাজধানী মনে করা হত। হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম এখানে অবস্থান করেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্য-শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। (আল-বাহরুল মুহীত)

কওমে লূতের অবাধ্যতা

কুরআনে কারীমে মানুষের সাধারণ অভ্যাস বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে,

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ إِنَّ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ۝

অর্থঃ বাস্তবিকই মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। কারণ, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে। (সূরা ‘আলাক, আয়াত: ৬-৭)

বলাবাহুল্য মানুষ যখন দেখে, সে প্রাচুর্যের মধ্যে আছে এবং সে কারো মুখাপেক্ষী নয়, তখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন, সীমালঙ্ঘন ও অবাধ্যতা শুরু করে। তেমনিভাবে লূত ‘আলাইহিস সালামের কওমের সামনেও আল্লাহ তা‘আলা তার নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারা তা পেয়ে মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধন ঐশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কাম-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার চক্র-জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়লো, লজ্জা-শরম ও ভালো-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যও তারা বিস্মৃত হয়ে গেল। এমনকি তারা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিকৃত

ধরনের, প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও অত্যন্ত কদর্য কুকর্মে লিপ্ত হলো। তারা বালকদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হলো। এইজাতীয় পাপাচার হারাম ও মহাপাপ তো বটেই, অধিকন্তু তা সুস্থ স্বভাবের বিরুদ্ধ ও বিকৃত রুচির এমন জঘন্য কর্ম যে, সাধারণ জন্তু-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। তদুপরি তাদের মারাত্মক বেলেল্লাপনার বিষয় ছিল, তারা তাদের এই জঘন্য বদকারীকে কোন অপরাধই মনে করতো না। বরং প্রকাশ্যে গৌরবের সাথে এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হত। এ ছাড়া তারা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ওয়াদাখেলাফি ও বিশ্বাসঘাতকতার মতো বিভিন্ন মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত ছিল। এভাবে তারা তৎকালীন যমানার সবচেয়ে বদকারে পরিণত হয়েছিল।

এই অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তাদের হেদায়াতের জন্য হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করলেন। তিনি তার রিসালাতের কথা ঘোষণা করে উক্ত জাতিকে অন্যায়, পাপাচার ও অশ্লীলতা পরিহার করে ঈমান, তাওহীদ ও তাকওয়ার দিকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানানলেন। তিনি তাদের বললেন, “তোমরা অশ্লীলতা ও কদর্যতা পরিহার করে শায়াফাত ও পবিত্রতার যিন্দেগী ইখতিয়ার করো।”

হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম উক্ত কওমের চরিত্রহীনতা, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে তিরস্কার করে বললেন,

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

অর্থঃ তোমরা কী করে এমন অশ্লীল কাজ করেছো, যা তোমাদের আগে বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেউ করেনি? (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৮০)

উল্লেখ্য, যিনা-ব্যভিচার প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে **إِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً** (নিশ্চয় তা জঘন্য অশ্লীল কর্ম) উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে **فَاحِشَةً** (ফাহিশাতান) শব্দটি আলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে উক্ত শব্দটি **أَفْوَاحِشَةً** (আলফাহিশাতা)-রূপে আলিফ ও লামসহ উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, আলিফ ও লাম যুক্ত করা হয় একে এজাতীয় সকল কিছুর আকর বলে বুঝানোর জন্য। সুতরাং এর দিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই জঘন্য বালক-মৈথুন ও পুং মৈথুন সমস্ত অশ্লীলতার ধারক এবং যিনার চাইতেও জঘন্য অপরাধ।

উল্লিখিত আয়াতে এর পর বলা হয়েছে, “এই নির্লজ্জ কাজ তোমাদের আগে পৃথিবীর বুকে কেউ করেনি।” এ ব্যাপারে হযরত আমর ইবনে দিনার রহ. বলেন, “এই জাতির আগে পৃথিবীতে কখনোই এমন কুকর্ম দেখা যায়নি।” (তাফসীরে মাযহারী)

বস্তুত সেই সাদুমবাসীদের তথা উক্ত সম্প্রদায়ের আগে কোন ঘোরতর বদকার ব্যক্তির চিন্তাও এদিকে যায়নি। তাই উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান রহ. বলেন, কুরআন মাজীদে হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ করা না হলে, আমি কল্পনাও করতে পারতাম না, কোন মানুষ এরূপ জঘন্য কাজ করতে পারে।

উল্লিখিত আয়াতে সেই সম্প্রদায়কে তাদের জঘন্য নির্লজ্জ কাজের কারণে দু’দিক দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

এক. বহু গুনাহ মানুষ পরিবেশের প্রভাবে অথবা পূর্ববর্তীদের দেখাদেখি লিপ্ত হয়ে যায়। যদিও তা অপরাধের দিক দিয়ে কোন অংশে কম নয়, তবে এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অজুহাত থাকে। কিন্তু যে গুনাহ আগে কেউ করেনি এবং পৃথিবীতে যার অস্তিত্ব নেই, সেরূপ গুনাহ লিপ্ত হওয়ার পিছনে তাদের কোন অজুহাতই থাকে না। তাই নিঃসন্দেহে তা অতি মারাত্মক ভয়াবহ অপরাধ, যা অধিক ও কঠিন শাস্তির যোগ্য।

দুই. যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ কিংবা কুপ্রথার উদ্ভাবন ঘটায়, তার নিজের কুকর্মের গুনাহ ও শাস্তি তো রয়েছেই, সেই সাথে কিয়ামত পর্যন্ত যারা সেই কাজ করবে, তাদের সকলের সমপরিমাণ গুনাহ ও শাস্তিও তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

উক্ত সম্প্রদায়ের নির্লজ্জ কুকর্মের বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে দিয়ে হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তাদের সতর্ক করে বলেন,

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

অর্থঃ তোমরা তো যৌনকর্ম চরিতার্থ করার জন্য পুরুষদের কাছে গমন করছো নারীদের ছেড়ে, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৮১)

উপরোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা একটি হালাল ও জায়েয পন্থা নির্ধারণ করেছেন। তা হচ্ছে, নারীদের বিয়ে করা। এই পন্থা ছেড়ে সমকামিতা বা পুং মৈথুনের মতো বিবেকবর্জিত ও বিকৃত পন্থা অবলম্বন করা অতীব ঘৃণ্য কুকর্ম ও মনুষ্যত্বের মারাত্মক সীমালঙ্ঘন। এমনকি তা যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও ভয়াবহ অপরাধ।

এই কারণেই সাহাবা, তাবেঈ ও মুজতাহিদগণ পুং-মৈথুনকে যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও অধিক গুরুতর অপরাধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সেজন্য ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. বলেন, যারা এ কাজ করবে, তাদের ঐ রকম শাস্তিই দিতে হবে, যা হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। যেমন তাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে সেরূপভাবেই এমন ব্যক্তিকে কোন উঁচু পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে তার উপর প্রস্তর বর্ষণ করার মাধ্যমে তাকে চরম পর্যায়ের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুং-মৈথুনকারী সম্পর্কে বলেছেন, “এই কাজে জড়িত উভয়কে হত্যা করো।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

লূত ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান

হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম সেই সম্প্রদায়কে সাবলীল ভাষায় বিনয় ও নম্রতার সাথে বুঝানোর যত পদ্ধতি হতে পারে, তার সবটাই প্রয়োগ করে বুঝিয়েছেন এবং উপদেশ ও নসীহত করেছেন। আর পূর্ববর্তী নাফরমান সম্প্রদায়ের ধ্বংসাত্মক পরিণতি বর্ণনা করে তা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন।

কিন্তু এই বদকারদের উপর সেই নসীহতের কোন প্রতিক্রিয়াই পড়লো না। বরং এতে তারা উল্টো ক্ষেপে গেল এবং হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হলো। তারা হযরত লূত



‘আলাইহিস সালামের নসীহতের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে লাগলো এবং কীভাবে তাকে জব্দ করে পাল্টা জবাব দেওয়া যায়, তার দুরভিসন্ধি আঁটতে লাগলো।

কিন্তু কোন প্রকারেই যখন তারা হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামকে পরাস্ত করতে পারল না, তখন তারা হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামকে সেই এলাকা থেকে বের করে দেওয়ার চক্রান্ত করলো। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ

অর্থঃ তাঁর (হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের) সম্প্রদায়ের এ ছাড়া কোন জবাব হলো না। তারা বলল, বের করে দাও এদের, তোমাদের এলাকা থেকে। এরা খুব পবিত্রতা অবলম্বী মানুষ। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৮২)

হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম পুনরায় এক মজলিসে তাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন,

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ

অর্থঃ তোমরা কি করে পুরুষদের সাথে অশ্লীল কাজ করছো এবং রাহাজানি করছো? আর তোমরা তোমাদের ভরা মজলিসে নির্দিধায় কুকর্মে লিপ্ত হচ্ছে? (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ২৯)

হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম এসব কুকর্মের পরিণতি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে তাদের হুঁশিয়ার করে অনেক বুঝালেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর এই নসীহত শুনে সংশোধন হওয়া এবং আল্লাহর আযাব ও গজবে ভীত হয়ে পাপাচার পরিত্যাগ করার পরিবর্তে উল্টো উত্তেজিত হয়ে উঠলো

এবং ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বলতে লাগলো, “হে লূত, আপনি আপনার উপদেশ ও সতর্কবাণী রাখুন। যদি আমাদের এই সমস্ত কার্যকলাপের কারণে আপনার প্রতিপালক নারাজই হয়ে থাকে, তা হলে আপনি আমাদের যেই শাস্তির কথা বলে বারবার ভয় দেখাচ্ছেন, সেই শাস্তির আগমন ঘটান। বাস্তবিকই যদি আপনি আপনার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকেন তা হলে তা প্রমাণ করুন। আপনার অযথা নসীহত আর শুনতে চাই না। বরং এখন আপনার ও আমাদের মাঝে একটা বুঝা-পড়া হয়ে যাওয়া দরকার।” আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতে এ কথাই বলা ইরশাদ করেছেন,

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعْنَا بَعْدَ أَبِي اللَّهِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

অর্থঃ (হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াতের) জবাবে তার সম্প্রদায়ের কেবল একথাই বললো, আমাদের উপর আল্লাহর আযাব আনুন, যদি আপনি সত্যবাদী হোন। (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ২৯)

এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা হযরত জিবরাইল ‘আলাইহিস সালামসহ কতিপয় ফেরেশতাকে কওমে লূতের উপর আযাব নাযিল করার জন্য প্রেরণ করলেন।

সেই সকল ফেরেশতা যাত্রাপথে প্রথমে ফিলিস্তিনে গিয়ে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নিকট তাঁর স্ত্রীর গর্ভধারণ ও বহু কাঙ্ক্ষিত সন্তান লাভের সুসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হন। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزٍ ۝ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۝ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ ۝

অর্থঃ আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নিকট বিশেষ সুসংবাদ নিয়ে আগমন করলেন। তারা সালাম বললেন। জবাবে তিনিও সালাম বললেন। অতঃপর অল্‌পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভূনাকৃত বাছুর নিয়ে এলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, আহারের দিকে তাঁদের হাত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন সন্দিহান হলেন এবং মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় করতে লাগলেন। তখন তাঁরা বললেন, ভয় পাবেন না। আমরা হযরত লূতের কওমের প্রতি (আযাব নাযিল করার জন্য) প্রেরিত হয়েছি। (সূরা হুদ, আয়াত: ৬৯-৭০)

যেভাবে আযাব এলো

আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন জাতিকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করেন, তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়ায়ই আযাব নাযিল করেন। এক্ষেত্রেও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করে ফেরেশতাদের নওজোয়ান রূপে সেই সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন।

লূত ‘আলাইহিস সালাম তাঁদের দেখে প্রথমে চিনতে পারেননি যে, তাঁরা ফেরেশতা। তাই তাঁরা যখন তাঁর নিকট মেহমানরূপে আগমন করলেন, তখন তিনি তাঁদের মানুষ মনে করে তাঁদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কারণ, মেহমানদের আপ্যায়ন করা এবং তাদের ইজ্জত-সম্মান ও নিরাপত্তা দেওয়া মেজবানের নৈতিক দায়িত্ব। বিশেষ করে নবীগণ তো এ সকল নীতি-নৈতিকতার প্রকৃত সংস্কারকারী। পক্ষান্তরে তাঁর সম্প্রদায়ের কু-স্বভাবের কথা তাঁর জানা ছিল। তারা টের পেলে বাছ-বিচার না করেই হামলে পড়ে সর্বনাশ ঘটাবে। এই উভয় সংকটে পড়ে তিনি চিন্তিত হয়ে বললেন, هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ



অর্থঃ আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (সূরা হুদ, আয়াত: ৭৭)

আল্লাহ তা‘আলা এ দুনিয়াকে শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন, যার মধ্যে তার অসীম কুদরত ও অফুরন্ত হেকমতের অপার নিদর্শন রয়েছে। তাই দেখা যায়, মূর্তিপূজারী আযরের ঘরে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ‘আলাইহিস সালামকে পয়দা করেছেন। আবার হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের মতো একজন বিশিষ্ট নবীর স্ত্রী বানিয়েছেন এক পাপিষ্ঠ মহিলাকে, যে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতো।

ফেরেশতাগণ যখন সুদর্শন নওজোয়ানের আকৃতিতে হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের ঘরে উপস্থিত হলেন, তখন লূত ‘আলাইহিস সালামের সেই স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদের খবর দিল, আমাদের ঘরে কয়েকজন অপরূপ নওজোয়ান আগমন করেছে। এই খবর শুনে হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের কওমের লোকেরা হস্তদন্ত হয়ে তাঁর ঘরপানে ছুটে এলো। এ কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

অর্থঃ তাঁর কওমের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর (ঘর) পানে ছুটে আসতে লাগলো। আর পূর্ব থেকেই তারা যাবতীয় কুকর্ম করে আসছিল। (সূরা হুদ, আয়াত: ৭৮)

বস্তুত তারা নানান জঘন্য কুকর্মের প্রভাবে এতদূর নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের বিবেকের এত অধঃপতন হয়েছিল যে, লূত ‘আলাইহিস সালামের নওজোয়ান মেহমানদের সাথেও এহেন কুকর্ম করার জন্য উদ্যত হলো। তারা তাঁর মতো একজন সম্মানিত নবীর সম্মান ও মর্যাদার প্রতিও ভ্রক্ষেপ করলো না।



তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রকাশ্যে লুত ‘আলাইহিস সালামের ঘর অবরোধ করলো। লুত ‘আলাইহিস সালাম তাদের বহুভাবে বুঝালেন। অন্তত তাদের সম্মান রক্ষার জন্য আবেদন জানালেন। কিন্তু তারা কোন কিছুই বুঝতে চাইলো না। তারা নওজোয়ান মেহমানদের তাদের নিকট সোপর্দ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করলো।

সব রকম বুঝিয়েও যখন হযরত লুত ‘আলাইহিস সালাম নিরাশ হয়ে গেলেন এবং দেখলেন, তাদের প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না, তখন বিকল্প সুরত ইখতিয়ার করে হলেও তাদের দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখার জন্য তাদের সরদারদের নিকট স্থায়ী কন্যাদের বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। নিম্নোক্ত আয়াতে এই কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ

অর্থঃ হে আমার কওম, এই আমার কন্যারা রয়েছে, এরা (বিবাহের মাধ্যমে বরণ করলে) আপনাদের জন্য পবিত্রতম। (সূরা হুদ, আয়াত: ৭৮)

তৎকালে কাফের পাত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহবন্ধন বৈধ ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বলবৎ ছিল। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুই কন্যাকে প্রথমে যথাক্রমে উতবা ইবনে আবু লাহাব ও আবুল আস ইবনে রবির কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা উভয়ে কাফের ছিল। পরবর্তীকালে ওহীর মাধ্যমে কাফেরদের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হয়। (আল-জামি‘লিআহকামিল কুরআন-কুরতুবী)



কোন কোন তাফসীরকারের মতে, হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তার কন্যা বলে উক্ত সম্প্রদায়ের কন্যাদের অর্থাৎ তাদের স্ব স্ব স্ত্রীদের অথবা কওমের কন্যাদের বিবাহ করে বৈধ স্ত্রী বানিয়ে নেওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। সেই স্ত্রীরা অবশ্যই তাদের কামভাব চরিতার্থের জন্য পূত-পবিত্র। এক্ষেত্রে নবী লূত ‘আলাইহিস সালাম সেই সম্প্রদায়ের কন্যাদের নিজের কন্যা বলে সম্বোধন করার তাৎপর্য হলো, প্রত্যেক নবী তার উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য, আর তাঁর উম্মতগণ তাঁর রুহানী সন্তানের মতো। যেমন, সূরা আহযাবের ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

অর্থঃ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের সাথে অধিক ঘনিষ্ঠ, তাদের নিজেদের চেয়েও এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা।

এর সাথে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কিরাআতে وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ বাক্যও বর্ণিত আছে। সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে উম্মতের জন্য মাতা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র উম্মতের পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সুতরাং এর ভিত্তিতে হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের কথার অর্থ হলো তোমরা নিজেদের কদাচার থেকে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে বৈধ ও পবিত্রভাবে মিলিত হও। অথবা যাদের স্ত্রী নেই, তারা কওমের কন্যাদের বিবাহ করে পবিত্র ও বৈধভাবে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করো।



অতঃপর লূত ‘আলাইহিস সালাম তাদের আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শন করে বললেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ “তোমরা আল্লাহকে ভয় করো” এবং অনুরোধ করে বললেন, وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي “আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপদস্থ করবে না।” তিনি আরো বললেন, أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ “তোমাদের মাঝে কি কোন বিবেকসম্পন্ন পুরুষ নেই?” (সূরা হুদ, আয়াত: ৭৮)

কিন্তু তাদের মধ্যে নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের লেশমাত্রও ছিল না। তাই তারা একযোগে যা বলে উঠলো, নিম্নোক্ত আয়াতে সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ لَنَا فِي بَنَاتِكُمْ حَقٌّ وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ مَا نُرِيدُ ۝

অর্থঃ তারা বললো, আপনি তো জানেন, আপনার কন্যাদের দিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই। আর আপনি ভালো করেই জানেন, আমরা কি চাই। (সূরা হুদ, আয়াত: ৭৯)

এই পরিস্থিতিতে হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম এক সংকটজনক অবস্থায় পতিত হলেন। নিদারুণ আশাহত হয়ে তিনি বললেন,

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِيَّائِي رُكْنٌ شَدِيدٌ ۝

হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “হায়, তোমাদের প্রতিরোধ করার মতো যদি আমার সম্যক শক্তি থাকতো অথবা আমি কোন শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম!” (সূরা হুদ, আয়াত: ৮০)

এর দিয়ে তিনি এ কথা বুঝিয়েছেন যে, আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হতাম অথবা আমার যদি প্রতাপশালী

আত্মীয়স্বজন এখানে থাকতো তাহলে বলপ্রয়োগ করে এই সংকট থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারতাম।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা‘আলা হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের প্রতি রহম করুন, তিনি নিরুপায় হয়ে সুদৃঢ় জামা‘আতের আশ্রয় কামনা করেছিলেন।

তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের দু‘আর বরকতে পরবর্তীকালে প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তা‘আলা সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী বংশে জন্মদান করেছিলেন। (আল-জামি‘লিআহকামিল কুরআন-কুরতুবী)

ফেরেশতাগণ হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের অস্থিরতা ও উৎকর্ষা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করে যা বললেন, এই আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে,

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ

অর্থঃ ফেরেশতাগণ বললেন, হে লূত, আমরা আপনার পালনকর্তার প্রেরিত ফেরেশতা। তারা কখনো আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না। (সূরা হুদ, আয়াত: ৮১)

ফেরেশতাগণ হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামকে বললেন, আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত ফেরেশতা। আপনি নিশ্চিত থাকুন, তারা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। বরং আযাব নাযিল করে এই পাপিষ্ঠ দুরাচারদের নিপাত করার জন্যই আমরা প্রেরিত হয়েছি।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, দুর্বৃত্তরা যখন লূত ‘আলাইহিস সালামের গরের দরজায় সমবেত হলো, তখন

তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। ফেরেশতাগণ ঘরের ভেতরে অবস্থান করছিলেন। কেবল আড়াল থেকে দুষ্টদের সাথে কথাবার্তা চলছিল। এরপর একপর্যায়ে তারা দেয়াল উপকে ভিতরে প্রবেশ করে এবং কপাট ভাঙতে উদ্যত হয়। এমন নাজুক মুহূর্তে লূত ‘আলাইহিস সালামের যবান থেকে এই বাক্যটি هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (আজ বড় সংকটময় দিন) উচ্চারিত হয়েছিল।

তখন ফেরেশতাগণ তাকে অভয় দান করেন এবং ঘরের দরজা খুলে দিতে বলেন। তাই তিনি দরজা খুলে দেন। তখন জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম সেই লোকদের প্রতি স্বীয় পাখার ঝাঁপটা মারেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে যায় এবং ভেগে চলে যেতে থাকে।

অন্য বর্ণনামতে, হযরত জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম তাদের দিকে একটা ফুক দেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই দুরাচাররা সকলেই অন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের সর্বাস্থে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়। তা ছাড়াও তাদের সমস্ত শরীর কদাকার হয়ে যায়। তখন তারা চিৎকার করতে করতে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

অতঃপর ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ শুনিয়ে হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামকে বললেন,

فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ

অর্থঃ আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ (এই এলাকা ছেড়ে) অন্যত্র চলে যাবেন। আর (সবাইকে সতর্ক করে দিবেন) আপনাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। তবে আপনার স্ত্রী ছাড়া। (সে আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।)

অন্যদের উপর যে আযাব আপতিত হবে, (তার অন্যায়ের দরুন) তাকেও সেই আযাব পাকড়াও করবে। (সূরা হুদ, আয়াত: ৮১)

স্মার্তব্য যে, উল্লিখিত আয়াতে যে বলা হয়েছে, **إِلَّا أَمْرًا** (তবে আপনার স্ত্রী ছাড়া)-এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, আপনার স্ত্রীকে সাথে নেবেন না। দ্বিতীয় অর্থ এটা হতে পারে যে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না। অথবা এটাও হতে পারে যে, সে আপনার হুঁশিয়ারি মেনে চলবে না।

বর্ণিত আছে, তার স্ত্রীও সাথে যাচ্ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার কথা শুনে সে পশ্চাতে ফিরে তাকালো এবং কওমের শোচনীয় পরিণতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রস্তরের আঘাতে সে ধ্বংস হয়ে গেল। (তাফসীরে মায়হারী)

আযাবের ধরন

ফেরেশতাগণ লূত ‘আলাইহিস সালামকে আরো জানিয়ে দিলেন, **إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ** অর্থাৎ, তাদের আযাবের নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে ভোর-সকাল। তখন লূত ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “আরো তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার”। ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, **الْيُسَ الْيُسَ** অর্থাৎ, সকাল কি নিকটবর্তী নয়?

উক্ত আযাবের ধরন সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, **فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ** অর্থঃ অবশেষে যখন আমার হুকুম অর্থাৎ আযাবের বিষয় এসে পৌঁছল, তখন আমি উক্ত জনপদের উপরকে নিচে করে দিলাম

আর তার উপরে কাঁকর-পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রতিটি আপনার রবের নিকট চিহ্নিত ছিল। (সূরা হুদ, আয়াত: ৮২-৮৩)

যখন আযাবের হুকুম কার্যকর করার সময় হলো, তখন তাদের বসতির উপরিভাগকে নিচে করে দেওয়া হলো অর্থাৎ তাদের জনপদকে সম্পূর্ণ উল্টে দেওয়া হলো। আর তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করা হলো, প্রত্যেকটি পাথর এক একজনের নামে চিহ্নিত ছিল।

বর্ণিত আছে, চারটি বড় বড় শহরে কওমে লূত-এর বসতি ছিল। ঐসব জনপদকেই কুরআনে কারীমে আলমু'তাফিকাত (الْمُتَفَكِّتَاتُ) বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত জিবরাঈল 'আলাইহিস সালাম তার পাখা উক্ত শহর চতুষ্টয়ের যমিনের তলদেশে প্রবিষ্ট করে সেগুলোকে এমনভাবে শূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিজ নিজ স্থানে স্থির ছিল, এমনকি পানি ভর্তি পাত্র থেকে এক বিন্দু পানিও গড়াল না বা পড়ল না, আর মহাশূন্য থেকে কুকুর, জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। জিবরাঈল 'আলাইহিস সালাম ঐসব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে অতঃপর সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে উল্টিয়ে যথাস্থানে নিক্ষেপ করলেন। তারা যেহেতু আল্লাহর আইন ও বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছিল, তাই তাদের সম্পূর্ণরূপে উল্টিয়ে মাটিচাপা দিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। তদুপরি এটা তো ছিল দুনিয়ার শাস্তি, এরপর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে সীমাহীন ভয়াবহ আযাব।

এক বর্ণনায় আছে, লূত 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের যে আযাব নাযিল হয়েছিল, তা বড় বড় পাথরের

বর্ষণ নয়, বরং মাটি নির্মিত কঙ্করের বর্ষণ ছিল। প্রত্যেক কঙ্করের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লেখা ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্য কঙ্করটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সে যেকোনো পলায়ন করেছে, কঙ্করও তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে খতম করেছে।

সূরা যারিয়াতের বর্ণনা দিয়ে বোঝা যায়, হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের কওম প্রস্তর-বর্ষণের আঘাতে ধ্বংস হয়েছে। আর সূরা হূদের বর্ণনায় বুঝা যায়, গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে সকলকে মাটিচাপা দিয়ে এবং তার উপর চিহ্নিত পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এই উভয় বর্ণনার মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, এটা সম্ভব যে, উভয় প্রকার আঘাবই নাযিল হয়েছিল, প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছে এবং পরে সমগ্র ভূখণ্ড- উল্টিয়ে ও চিহ্নিত পাথর বর্ষণ করে তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মজীদের বক্তব্য অনুযায়ী, লূত ‘আলাইহিস সালামের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্ডানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট নিচের দিকে একটি বিরাট জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। ইতিহাসে এটা বিরাট এক পরিধিতে বিশেষ এক প্রকার লবণাক্ত ও রক্তবর্ণ পানির আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এজন্যই একে ‘বাহরে মাইয়্যাত’ বা মৃতসাগর (Dead Sea) নামে অভিহিত করা হয়। একে লূত সাগরও বলা হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তেলজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এতে কোন

সামুদ্রিক প্রাণী জীবিত থাকতে পারে না। এ ছাড়া এর পানির ক্ষার সমুদ্রের ক্ষারের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র। সেই কারণে এখানে মানুষ ডোবে না।

ঘটনা থেকে শিক্ষা

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালান-কোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটনক্ষেত্রে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছে। আফসোস, তারা নিছক খেল-তামাশা হিসাবে এসব এলাকা দেখার জন্য সেখানে গমন করে। অথচ এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّئِينَ ۝

অর্থঃ নিশ্চয় এতে মুমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা হিজর, আয়াত: ৭৭)

এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয়। একমাত্র ঈমানদারগণই এই শিক্ষা দিয়ে উপকৃত হয়। আর অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

উল্লিখিত কওমে লূত-এর ধ্বংসের ঘটনায় নাফরমান ও পাপীদের জন্য হুঁশিয়ারি বার্তা রয়েছে। ইহজগতের চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাসে পড়ে দীন ও ঈমান থেকে দূরে থাকা এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনারই নামান্তর। কুরআন মজীদে বর্ণিত এসব ঘটনা আমাদের বারবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করে।



তাই এথেকে আমাদের নসীহত হাসিল করা জরুরী এবং সকল অন্যায় ও নাফরমানী ছেড়ে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান যথাযথভাবে পালন করা কর্তব্য।

সমাপ্ত



হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম

কওমে সামুদ

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com



www.islamijindegi.com



সূচীপত্র

কওমে সামূদের প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি

আল্লাহর উটনী হত্যা

নাফরমানীর শাস্তি

যেভাবে আযাব এলো

কেউ আযাব থেকে রক্ষা পায়নি

ঘটনা থেকে শিক্ষা

بِسْمِهِ تَعَالَى

কওমে সামূদের প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَإِلَىٰ ثُودَ أَخَاهُمْ صُلْحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم
بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

অর্থঃ আমি সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। তিনি বলেন, হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এসেছে। এটা আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন। সুতরাং একে আল্লাহর যমিনে বিচরণ করে খেতে দাও। এতে ক্ষতি করার মানসে স্পর্শ করো না। তা না হলে ভীষণ বেদনাদায়ক আযাব তোমাদের আঁকড়ে ধরবে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৭৩)

সূরা আরাফের উল্লিখিত ৭৩ নং আয়াতে এবং এরপর থেকে ৭৯ নং আয়াত পর্যন্ত মোট সাতটি আয়াতে সালেহ ‘আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন এর আগে এই সূরায়, কওমে নূহ ও কওমে হুদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে,

وَإِلَىٰ ثُودَ أَخَاهُمْ صُلْحًا

অর্থঃ আমি সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছি।

‘আদ ও সামূদ একই দাদার বংশধর দুই ব্যক্তির নাম। তাদের সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে আলাদা দুটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। একটি ‘আদ। অপরটি সামূদ।

তারা আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বসবাস করতো। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল “হিজর”। বর্তমানে একে সাধারণত “মাদায়িনে সালাহ” বলা হয়।

‘আদ জাতির মতো সামূদও বুদ্ধিমান, শক্তিশালী ও বাহাদুর জাতি ছিল। তারা পাথর খোদাই ও রাজমিস্ত্রির কাজে খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশাল বড় বড় দালান নির্মাণ ছাড়াও পাহাড় খোদাই করে তারা নানান ঘর তৈরি করতো। তাদের নির্মাণ কাজের নিদর্শন আজও বিদ্যমান আছে। এগুলোর গায়ে ইরামি ও সামুদি বর্ণমালার শিলালিপি রয়েছে। এক সফরে সেসব নিদর্শন আল্লাহ তা‘আলা আমাকে (লেখক, হযরত ওয়ালা মুফতী মনসুরুল হক দা.বা.কে) দেখার সুযোগ দান করেছেন।

দুনিয়াবী ধন-সম্পদ আর আধিপত্যের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে। ধনীরা আল্লাহ তা‘আলা ও পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। সামূদ জাতির বেলায় তা-ই ঘটেছে।

আল্লাহ তা‘আলা তার চিরন্তন রীতি অনুযায়ী সামূদ জাতির হেদায়েতের জন্য হযরত সালাহ ‘আলাইহিস সালামকে পয়গাম্বর হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি বংশ ও দেশের দিক দিয়ে সামূদ জাতিরই একজন সদস্য এবং সামেরই বংশধর ছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাকে **أَخَاهُمْ صَلَاحٌ** অর্থাৎ, “তাদের ভাই সালাহ” বলে উল্লেখ করা হয়েছে।



হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে পূর্ববর্তী নবীগণের মতো তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেন,

يَقُومُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ

অর্থঃ হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম যৌবনকাল থেকেই তার সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজ করতে করতেই বার্ষিক্যে উপনীত হন।

তার উপর্যুপরি পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করলো, তার কাছে এমন একটি দাবি করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হবেন এবং আমরা তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবো। সেমতে তারা দাবি করলো, আপনি যদি সত্যিই আল্লাহর নবী হোন তা হলে আমাদের “কাতিবা” পাহাড়ের পাথরের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী সবল উটনী বের করে দেখান, যার রঙ হবে সোনালি।

হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন, যদি আমি তোমাদের দাবি পূরণ করে দিই, তবে তোমরা আমার প্রতি এবং আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না? তখন তারা সবাই এই মর্মে অঙ্গীকার করলো।

হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দু‘আ করলেন, “আয় আল্লাহ, আপনার জন্য

কোন কাজই কঠিন না। তাই দু‘আ করছি, তাদের দাবি পূরণ করে দিন।”

সালেহ ‘আলাইহিস সালামের দু‘আর সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে গর্ভধারিণীর মতো স্পন্দন দেখা দিল এবং একটি বিরাট পাথর বিস্ফোরিত হয়ে তার ভিতর থেকে দাবির অনুরূপ দশ মাসের গর্ভবতী স্বাস্থ্যবতী সোনালি রঙের একটি উটনী বেরিয়ে এলো।

হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালামের এই বিস্ময়কর মুজিয়া দেখে সেই সম্প্রদায়ের কিছুলোক সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেল। বাকিরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলো। কিন্তু দেব-দেবীর বিশেষ পূজারি ও মূর্তিপূজার ঠাকুর-ধরনের কিছু সরদার তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। তাই তারা আর মুসলমান হলো না।

শেষ পর্যন্ত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়ের সেই নাফরমান লোকদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কারণ এদের উপর আযাব এসে যেতে পারে। তাই তিনি পয়গাম্বর সুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন, এই উটনীর দেখাশোনা করো। একে কোনরূপ কষ্ট দিয়ো না। এভাবে করে হয়তো তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পারবে। কিন্তু এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ○

অর্থঃ এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব, একে আল্লাহর যমিনে বিচরণ করে খেতে দাও এবং একে ক্ষতি করার নিয়তে স্পর্শ করো না। নতুবা তোমাদের ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।

পৃথিবীর সবকিছুই তো আল্লাহ তা‘আলার! তবু বিশেষভাবে এই উটনীকে “আল্লাহর উটনী” বলার কারণ হলো, এটি আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন এবং সালাহ ‘আলাইহিস সালামের মুজিয়া হিসাবে বিস্ময়কর ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্মও অলৌকিকভাবে হয়েছিল বলে তাকে **وَحْيُ** (আল্লাহর আত্মা) বলা হয়েছে। কিংবা সেই উটনীর মাহাত্ম্য বুঝানোর জন্য তাকে **وَحْيُ** (আল্লাহর উটনী) বলা হয়েছে।

এরপর **وَحْيُ** বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই উটনীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় করতে হবে না। যমিন আল্লাহর এবং এর উৎপন্ন ফসলও আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই তার উটনীকে তার যমিনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে সাধারণভাবে চারণক্ষেত্রে বিচরণ করে নির্বিঘ্নে খেতে পারে।

সামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করতো এবং জন্তুদের পান করাতো, এই উটনীও সেই কূপ থেকেই পানি পান করতো। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উটনী যখন পানি পান করতো, তখন পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলতো এবং এর ভয়ে সম্প্রদায়ের অন্য সব জীব-জন্তু তখন পান করতে আসতো না। এর ফলে সমস্যা দেখা দিল।



তখন হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে ফায়সালা করে দিলেন, একদিন এই উটনী পানি পান করবে এবং অন্যদিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নিবে। অধিকন্তু যেদিন উটনী পানি পান করতো, সেদিন অন্যরা উটনীর দুধ দিয়ে তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত। সূরা কামারে এভাবে পানি বণ্টনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ

অর্থঃ হে সালেহ, আপনি স্বজাতিকে জানিয়ে দিন, তাদের এবং উটনীর মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত, একদিন উটনীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। (সূরা কামার, আয়াত: ২৮)

সূরা শুআরা-এর ১৫৫ নং আয়াতে সে প্রসঙ্গ এভাবে ব্যক্ত হয়েছে,

هَذِهِ نَاقَةٌ لِّهَآ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَّوْمٍ مَّعْلُومٍ

অর্থঃ এটি আল্লাহর উটনী। একদিন এর জন্য পানি বরাদ্দ থাকবে এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের থাকবে।

আল্লাহর উটনী হত্যা

আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাগণ এই বণ্টন-ব্যবস্থা দেখাশোনা করতেন, যাতে কেউ এর খেলাফ করতে না পারে।

এই উটনীর কারণে সামূদ জাতির কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু তারাই যেহেতু এটা আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে এনেছে আর একে কিছু করা হলে তারা আযাবের সম্মুখীন হবে, তাই কিছু করতে সাহস করছিল না। তবু মনে মনে তারা এর ধ্বংস কামনা করতো।

ইতিমধ্যে শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল। তাই তারা নিজেরা সেই উটনীটি হত্যা করার দুঃসাহস না দেখালেও অন্য কোনোভাবে তাকে খতম করার ফন্দি-ফিকির করতে লাগলো।

এক পর্যায়ে সেই সম্প্রদায়ের সাদাকা বিনতে মুখতার ও উনাইয়া নামীয় দুজন নারী ফন্দি আঁটলো। যে প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনা বিলুপ্ত করে দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সেই দুই নারী ছিল পরম সুন্দরী। তারা বাজি ঘোষণা করলো, যে ব্যক্তি এই উটনী হত্যা করবে, সে আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

তখন সম্প্রদায়ের দুই যুবক এই কাজের জন্য তৈরি হলো। তাদের নাম মিসদা ও কাসার। তারা সেই বাজি পাওয়ার নেশায় মত্ত হয়ে উটনী হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়লো।

তারা উটনীর যাতায়াতের পথে একটি বড় পাথরের টুকরার পেছনে গোপনে বসে রইল। তারপর উটনী সামনে আসতেই মিসদা তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো এবং কাসার তরবারির আঘাতে তার পা কেটে তাকে হত্যা করলো।

সূরা শামসে তাকে সামূদ জাতির সবচাইতে বড় হতভাগা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আঘাতে পতিত হয়েছে।

নাফরমানীর শাস্তি

উটনী হত্যার ঘটনা জানার পর সালেহ ‘আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে তোমাদের জীবনকাল মাত্র তিনদিন অবশিষ্ট রয়েছে। এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিবরণ হচ্ছে,

تَبْتَغُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعَدُّ غَيْرٍ مَّكَذُوبٍ

অর্থঃ তোমরা তিনদিন তোমাদের বাড়ি-ঘরে আরাম করে নাও। (এরপরই আযাব নেমে আসবে।) এই ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হবে না। (সূরা হুদ, আয়াত: ৬৫)

কিন্তু যে জাতির বিবেক ও চেতনা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাদের জন্য কোন উপদেশ ও হুঁশিয়ারি কাজে আসে না। তাই তো হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালামের এই কথা শুনে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে বললো, “এই শাস্তি কীভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? এর লক্ষণ কী হবে?”

সালেহ ‘আলাইহিস সালাম বললেন, তা হলে আযাবের লক্ষণও শুনে নাও। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষ সবার মুখমণ্ডল হলোদে ও ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। সেটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন।

হতভাগা জাতি এই কথা শুনেও আল্লাহ তা‘আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে খোদ সালেহ ‘আলাইহিস সালামকেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবলো, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের আগে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দিই। পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক।

সামূদ জাতির এই সংকল্পের কথা কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।



সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছুলোক রাতের আঁধারে সালেহ ‘আলাইহিস সালামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার ঘরপানে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা পশ্চিমমুখী পাথরের বৃষ্টি দিয়ে তাদের ধ্বংস করে দিলেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

অর্থঃ তারা গোপন ষড়যন্ত্র করলো। আমি এমন কৌশল অবলম্বন করলাম, তারা তা জানতেই পারলো না। (সূরা নামল, আয়াত: ৫০)

এরপর বৃহস্পতিবার ভোরে দেখা গেল ঠিকই সালেহ ‘আলাইহিস সালামের কথা অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

প্রথম লক্ষণ সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরেও জালিমরা ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ করলো না। বরং তারা সালেহ ‘আলাইহিস সালামের প্রতি আরো চটে গেল এবং সমগ্র জাতি তাকে হত্যা করার জন্য ঘোরাফেরা করতে লাগলো। তখন আল্লাহ তা‘আলা তার নবী ‘আলাইহিস সালামকে তাদের সকল চক্রান্ত থেকে হেফাজত করলেন।

যেভাবে আযাব এলো

মানুষের মন-মস্তিষ্ক যখন ভ্রান্ত হয়ে যায় তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকো লাভ এবং ভালোকে মন্দ ও মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে। সামূদ জাতির বেলায় তা-ই ঘটলো। আল্লাহ তা‘আলা আযাব দানের বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্ভব ঘটিয়ে তাদের এই অবকাশ দিচ্ছিলেন যে, তারা কুফর ও নাফরমানী ছেড়ে ঈমানের পথে ফিরে আসে কি না। কিন্তু না, সেই হতভাগারা শেষ সুযোগ পর্যন্ত

বেদীনা ও অবাধ্যতার উপর অটল অবিচল থাকলো এবং ঈমানের পথে ফিরে এসে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় অবলম্বন করলো না।

এমনি করেই দ্বিতীয়দিন সালাহে ‘আলাইহিস সালামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয়দিন ঘোর কালো হয়ে গেল। তখন সবাই জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেল এবং অপেক্ষা করতে লাগলো, কোন দিক থেকে কীভাবে আযাব এসে তাদের ধ্বংস করবে।

এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হলো এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। ফলে সবাই বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে যমিনে শুয়ে পরলো।

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, **فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ** অর্থাৎ, ভূ-কম্পন তাদের পাকড়াও করলো। অপর আয়াতে বলা হয়েছে, **فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ** অর্থাৎ, বিকট চিৎকার তাদের আঁকড়ে নিলো।

এতে বুঝা যাচ্ছে তাদের উপর উভয় প্রকার আযাব নাযিল হয়েছিল। নিচের দিক থেকে ভূমিকম্প এবং উপরের দিক থেকে বিকট চিৎকার-এর আযাব তাদের ঘিরে নিয়েছিল। ফলে তাদের কী অবস্থা হয়েছে, সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيِّينَ

অর্থঃ তারা বাড়ি-ঘরে যে যে অবস্থায় ছিল, সেভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। (সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৩৭)

এই ঘটনার প্রধান অংশগুলো কুরআনে কারীমের বিভিন্ন সূরায় রয়েছে। যথা, সূরা আরাফ, আয়াত ৭৩-৭৬; সূরা হুদ,

আয়াত ৬১-৬৮; সূরা শুআরা, আয়াত ১৪১-১৫৯; সূরা নাহলো, আয়াত ৪৫-৪৯; সূরা কমার, আয়াত ২৩-৩১; সূরা শামস, আয়াত ১১-১৫। এ ছাড়াও ঘটনার আরো বিবরণ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজর নামক সেই স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামূদ জাতির উপর আযাব এসেছিলো। তখন তিনি সাহাবীদের নির্দেশ দেন, “কেউ যেন এই আযাববিধ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ না করে এবং কেউ যেন এই এলাকার কূপের পানি ব্যবহার না করে।” (তাফসীরে মাযহরী)

কেউ আযাব থেকে রক্ষা পায়নি

অপর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে সেসময় শুধু “আবু রিগাল” নামক এক ব্যক্তি বেঁচে গিয়েছিল। এ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারেনি। এরপর আবু রিগালকেও গযব পাকড়াও করেছিল। সে মরে মাটিতে দেবে যায়। ঘটনাক্রমে গযব নাযিলের সময় এই লোক মক্কায় এসেছিল। মক্কার হেরেমের সম্মানার্থে আল্লাহ তা‘আলা তখন তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। এরপর যখন সে হেরেম শরীফ থেকে বাইরে যায়, তখন সামূদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও তখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামকে মক্কার বাইরে আবু রিগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেন, “তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়ি মাটিতে দাফন হয়ে গিয়েছে।” তখন সাহাবায়েকেরাম তার কবর খনন করলে সেই ছড়িটি পাওয়া

যায়। এই রেওয়াযাতে আরো বলা হয়েছে, তায়েফের অধিবাসী সাকিফ গোত্র আরু রিগালেরই বংশধর। (তাকসীরে মাযহরী)

ঘটনা থেকে শিক্ষা

আযাবে নিপতিত এই সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ত বস্তুগুলোকে আল্লাহ তা‘আলা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষাস্থল হিসাবে আজও সংরক্ষিত রেখেছেন। কুরআন মজীদে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে, সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান মানুষের শিক্ষার কাহিনী হয়ে বিদ্যমান আছে। এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে সূরা ইউসূফের ১০৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের সতর্ক করেছেন।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাবের ঘটনা বিবৃত করার পর সূরা আরাফে বলা হয়েছে,

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ
النَّصِيحِينَ

অর্থঃ অতঃপর তিনি (সালেহ ‘আলাইহিস সালাম) তাদের নিকট থেকে দূরে চলে যান এবং বলেন, হে আমার কওম, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আমার পরওয়ারদিগারের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দ করো না। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৭৯)

স্বজাতির উপর আযাব নাযিল হওয়ার পর হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম যখন সেই এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান, তখন কোন কোন বর্ণনামতে, তার সংগে চার হাজার মুমিন ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে ইয়ামানের “হাযরামাউত” নামক স্থানে চলে যান। সেখানেই তার ওফাত হয়। আর কোন



কোন রেওয়ায়েত থেকে তার মক্কায় আগমন এবং সেখানে ওফাতের কথাও জানা যায়। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৭৯)

উক্ত আয়াত দিয়ে বুঝা যাচ্ছে, সালেহ ‘আলাইহিস সালাম তার কওমের সেই এলাকা ত্যাগ করার সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন, “হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু আফসোস, তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দই কর না।”

এখানে প্রশ্ন হয়, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদের সম্বোধন করে কথা বলে লাভ কী? এর লাভ হলো, এথেকে অন্যরা শিক্ষা লাভ করতে পারবে। এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশ-সরদারদের এমনিভাবে সম্বোধন করে কিছু কথা বলেছিলেন। অথবা হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালামের এই সম্বোধন আযাব অবতরণের আগেও হতে পারে, যদিও ঘটনার বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনায় নাফরমান ও দীন বিমুখদের জন্য সতর্কবার্তা রয়েছে। পার্থিব দুনিয়ার মোহে পড়ে দীন ও ঈমান এড়িয়ে চলা ধ্বংসের কারণ। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উক্ত সামূদ জাতির ধ্বংস ও বিপর্যের ইতিহাস আমাদের বারবার সেই শিক্ষাই দেয়। এথেকে শিক্ষা নিয়ে সংশোধন হওয়া এবং অন্যায় ও পাপাচার ছেড়ে দীনের পথে চলা আমাদের কর্তব্য।

সমাপ্ত

হযরত ইউসুফ ‘আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com



সূচীপত্র

ইউসুফ আ. এর ঘটনা ও শিক্ষা	
ইউসুফ আ. এর পরিচয়	
ইউসুফ আ. এর স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা	
ইউসুফ আ. কে হত্যার পরিকল্পনা	
পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	
ইউসুফ আ. কে কূপে নিক্ষেপ	
গভীর কূপ থেকে মুক্তি	
ইউসুফ আ. কে ক্রয় করা	
তিন ব্যক্তির বিচক্ষণতা	
ইউসুফ আ. এর প্রতি আযীযে মিসর এর স্ত্রীর আসক্তি	
ইউসুফ আ. এর পক্ষে নবজাতক শিশুর সাক্ষ্য প্রদান	
নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক	
আযীযে মিসরের স্ত্রীর ব্যাপারে নারীদের কুৎসা রচনা	
নারীদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ আ. এর পরিত্রাণ	
দাওয়াতের মূলনীতি হিকমত ও বিচক্ষণতা	
বাদশাহর স্বপ্ন	
স্বপ্নের ব্যাখ্যা	
ইউসুফ আ. এর কারামুক্তি	
আযীয পত্নীর নাম উল্লেখ না করার কারণ	
ইউসুফ আ. এর সাথে যুলাইখার বিবাহ	
মিসরের বাদশাহ ইউসুফ আ.	
ইউসুফ আ. এর সুদক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনা	
ইউসুফ আ. এর ভায়াদের মিসরে আগমন	
বিনয়ামীনকে নিয়ে দ্বিতীয়বার মিসরে আগমন	
ইউসুফ আ. বিনয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিলেন	
ইউসুফ আ. এর প্রতি চুরির অপবাদ	
দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর	
বিনয়ামীনের এর মুক্তির ব্যাপারে বাদশাহর দরবারে আবেদন	
সন্তানের বিরহে ইয়াকুব আ. দুঃখ ও অশ্রু বিসর্জন	
আযীযে মিসরের নামে হযরত ইয়াকুব আ. এর পত্র	
হযরত ইয়াকুব আ. স্বপরিবারে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা	
ইউসুফ আ. এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন	
নবুওয়্যাতের শান	
আলোচিত কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ	

باسمه تعالى

হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা ও শিক্ষা

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْمُتَذَكِّرِينَ ۝ إِذْ قَالَُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَظْهَرُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا ضَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غَيَبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ۝

অর্থঃ ইউসুফ আ. ও তার ভাইদের কাহিনীতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রশংসারীদের জন্য; যখন তারা বললো, অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে রয়েছেন। হয়তো ইউসুফকে হত্যা করো কিংবা তাকে ফেলে রেখে আসো অন্য কোন স্থানে। তাহলে তোমাদের পিতার নেকদৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা (তাওবা করে) ভাল মানুষ হয়ে যাবে। তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং যদি তোমরা কিছু করতেই চাও, তাহলে তাকে কোনো কূপের গভীরে নিক্ষেপ করো, যাতে কোন পখিক তাকে তুলে নিয়ে যায়। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭-১০)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ আ. ও তাঁর ভাইদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ সহ হযরত ইয়াকুব আ. এর বারো জন পুত্র সন্তান ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেরই অনেক সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে।



ইউসুফ আ. এর পরিচয়

হযরত ইয়াকুব আ. এর উপাধি ছিল ইসরাঈল। তাই সেই বারটি পরিবার সবাই ‘বনী ইসরাঈল’ নামে পরিচিত হয়। বারো ছেলের মধ্যে দশজন বড়ছেলে হযরত ইয়াকুব আ. এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যানের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর পর ইয়াকুব আ. লাইয়্যার বোন রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দুই ছেলে ইউসুফ ও বিনয়ামীন জন্মগ্রহণ করেন।

তাই হযরত ইউসুফ আ. এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বিনয়ামীন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাত্রেয় ভাই। এরপর ইউসুফ আ. এর আম্মা রাহীলও বিনয়ামীনের জন্মের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন। (আল-জামি‘লিআহকামিল কুরআন লিল কুরতুবী)

ইউসুফ আ. এর স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা

হযরত ইউসুফ আ. শৈশবে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চাঁদ তাকে সিজদা করছে। এই অভিনব স্বপ্ন দেখে পিতার নিকট ব্যক্ত করলে তিনি নবী সুলভ দূরদর্শীতা দিয়ে বুঝতে পারলেন যে, ইউসুফের ভবিষ্যতে মহা মর্যাদা অপেক্ষা করছে। এমনকি সে নবীও হতে পারে। তাই তিনি তাকে আরো অধিক স্নেহ করতে লাগলেন এবং তার এই সৌভাগ্যের সংবাদ অবহিত হয়ে অন্যান্য ভায়েরা তার প্রতি আরো ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতে পারে এবং তাকে কষ্ট দেয়ার পরিকল্পনা করতে পারে ভেবে তিনি ইউসুফকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, তোমার ভাইদের নিকট এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত মোটেও বর্ণনা করো না, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে। কেননা শয়তান তো মানুষের চিরশত্রু। সে চায়না ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্ক অটুট

থাকুক, শান্তিতে বসবাস করুক। কিন্তু মানুষ যেটা আশংকা করে সেটাই হয়ে থাকে।

হযরত ইউসুফ আ. এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা দেখলো যে, পিতা ইয়াকুব আ. ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মুহাব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথা চড়া দিয়ে ওঠে। এটাও হতে পারে যে, তারা কোনোভাবে ইউসুফ আ. এর স্বপ্নের বিষয়ও জানতে পেরেছিলো, যদ্বন্ধন তারা হযরত ইউসুফ আ. এর বিরূট মাহাত্ম্যের কথা টের পেয়ে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলো।

তখন তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো যে, আব্বাজান দেখি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার ছোট ভাই বিনয়ামীনকে অধিক ভালোবাসেন। অথচ আমরা দশজন তাদের বড় হওয়ার কারণে ঘরের কাজ-কর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় ঘরস্থালির কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হলো, বিষয়টি অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মুহাব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই এসো, আমরা হয় ইউসুফকে হত্যা করি, না হয় তাকে এমন দূরদেশে নির্বাসিত করি, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

ইউসুফ আ. কে হত্যার পরিকল্পনা

পরামর্শের এক পর্যায়ে তাদের একজন এ মত পেশ করলো যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। অন্য একজন বললো, তাকে হত্যা না করে কোনো দূরদেশে ফেলে আসা হোক। এতে করে মাঝখান থেকে এ কাঁটা দূর হয়ে যাবে এবং পিতার সব মনোযোগ আমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তাকে হত্যা কিংবা দেশান্তরের কারণে যে গুনাহ হবে, তার প্রতিকার এই যে,



পরবর্তীকালে তাওবা করে আমরা ভালো হয়ে যাবো। শিরোনামে উল্লিখিত “এবং তারপর ভালো হয়ে যাবো” বাক্যের এক অর্থ তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর আমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা, তখন পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং মনোযোগ আমাদের দিকেই নিবদ্ধ হবে এবং আমরা ভালো পরিগণিত হবো।

সেই মুহূর্তে তাদের মধ্যেরই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বললো, ইউসুফকে হত্যা করা উচিত হবে না। বরং যদি কিছু করতেই হয়, তবে তাকে কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ করা হোক, যেখানে সে জীবিত থাকবে এবং পথিক যখন কূপে আসবে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং চিন্তা করতে হবে না। বরং এমতাবস্থায় কোন পথিকই তাকে দূরদেশে নিয়ে চলে যাবে।

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিলো তাদের বড় ভাই ইয়াকুদা। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল বড়। সে-ই এ অভিমত ব্যক্ত করছিল। এ ব্যক্তি সম্পর্কে সামনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ আ. এর ছোট ভাই বিনয়ামীনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিলো, আমি ফিরে গিয়ে কীভাবে মুখ দেখাবো? তাই আমি আর কেনানে ফিরে যাবো না।

পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

হযরত ইউসুফ আ. এর ভায়েরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিতার কাছে এভাবে আবেদন পেশ করলো যে, আব্বাজান! ব্যাপার কী! আপনি দেখি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের

প্রতি আস্থা রাখেন না! অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সেও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করবো।

তাদের এ আবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, এর আগেও তারা কোনো সময় এ ধরনের আবেদন করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। যদ্বরূপে এবার কিঞ্চিৎ জোর ও পীড়াপীড়ি সহকারে পিতাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে তাদের এ আবেদন সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ۝ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتُحْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝

অর্থঃ তারা বললো, হে আমাদের আব্বা! আপনার কী হয়েছে যে, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? অথচ আমরা তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন। তাহলে সে তৃপ্তিসহ থাকবে এবং খেলাধুলা করবে, আর আমরা অবশ্যই তার হিফায়ত করবো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১১-১২)

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে ভ্রমণে পাঠানোর আবেদন করলো, তখন হযরত ইয়াকুব আ. বললেন, তাকে পাঠানো আমি দু'কারণে পছন্দ করি না। প্রথমতঃ সে নয়নের মণি, আমার সামনে না থাকলে, আমি শান্তি পাই না। দ্বিতীয়তঃ আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।

ইয়াকুব আ. এর এ বক্তব্য কালামে পাকের এ আয়াতে বিবৃত হয়েছে,

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ

অর্থঃ ইয়াকুব আ. বললেন, আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে, অথচ তোমরা তার থেকে অমনোযোগী থাকবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৩)

বাঘের আশঙ্কা হওয়ার কারণ এই যে, তখন কেনানে বাঘের খুব উপদ্রব ছিল। ওদিকে হযরত ইয়াকুব আ. স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নীচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ আ.। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাঁকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু সেগুলোর মধ্য থেকে একটি বাঘ এসে তাঁকে মুক্ত করে দেয়, অতঃপর ইউসুফ আ. মাটির অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেন।

এর ব্যাখ্যা এভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশজন ভাই এবং যে বাঘটি তাঁকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল বড় ভাই ইয়াকুব আ. অথবা রুবীল। আর মাটির অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেয়ার অর্থ, কূপের মধ্যে নিষ্কিণ্ত হওয়া। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকুব আ. স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাদেরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে কথা প্রকাশ করেননি। (আল-জামি'লিআহকামিল কুরআন লিল কুরতুবী)

ভাইয়েরা হযরত ইয়াকুব আ. এর এ কথা শুনে বললো, আপনার এ ভয়-ভীতি অমূলক। আমরা দশজনের শক্তিশালী দল তার

হেফাজাতের জন্য বিদ্যমান রয়েছি। আমাদের সবার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, তাহলে আমাদের অস্তিত্বই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দিয়ে কোন কাজের আশা করা যেতে পারে?

নিম্নোলিখিত আয়াতে ইউসুফ আ. এর ভাইদের সেই কথা বর্ণনা করা হয়েছে,

قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَيْرُُونَ

অর্থঃ তারা বললো, আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৪)

হযরত ইয়াকুব আ. পয়গাম্বরসুলভ গান্ধীর্যের কারণে ছেলেদের সামনে এ কথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করি। কারণ এতে প্রথমতঃ তাদের মনোকষ্ট হতো, দ্বিতীয়তঃ পিতার এরূপ বলার দিয়ে ভাইদের শত্রুতা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোনো সময় কোনো ছলছুতায় তাঁকে হত্যা করার ফিকিরে থাকতো। তাই তিনি তাঁকে নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তবে ভাইদের কাছ থেকে অঙ্গীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে ইউসুফের কোনো রকম কষ্ট না হয়। এ পর্যায়ে বিশেষ করে বড় ভাই ইয়াজদার হাতে তাকে সোপর্দ করে বললেন, তুমি তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে খেয়াল রাখবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে।

ভাইরা পিতার সামনে ইউসুফকে কাঁধে তুলে নিলো এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগলো। কিছু দূর পর্যন্ত হযরত ইয়াকুব আ. ও তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্যে গেলেন।

ইমাম কুরতুবী রহ. ঐতিহাসিক রিওয়ায়েতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তারা যখন হযরত ইয়াকুব আ. এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন তারা ইউসুফ আ. কে নামিয়ে দিল এবং তিনি পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে চলতে অক্ষম হচ্ছিলেন আবার তাকে হত্যা করার ব্যাপারে ভাইদের পরামর্শও টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি এক ভাইয়ের আশ্রয় নিতে চাইলেন। সে কোনোরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় তৃতীয়, চতুর্থ; এমনিভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল যে, তুই যে এগারোটি নক্ষত্র এবং চাঁদ ও সূর্য তাকে সিজদা করতে দেখেছিস, তাদেরকে ডাক দে, তারাই তাকে সাহায্য করবে, আমরা তাকে সাহায্য করতে পারবো না।

ইমাম কুরতুবী রহ. এর ভিত্তিতে বলেন যে, এ থেকে বোঝা যায় ভাইয়ের কোনো না কোনো উপায়ে ইউসুফ আ. এর স্বপ্নের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্ন ইউসুফ আ. এর প্রতি তাদের তীব্র ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল। উক্ত স্বপ্নের কারণেই তারা ইউসুফ আ. এর সাথে হিংসাত্মক আচরণ করেছিল।

অবশেষে ইউসুফ আ. ইয়াহুদাকে বললেন, আপনি সবার বড়। আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনোকষ্টের কথা চিন্তা করে দয়াদ্র হোন। আপনি ঐ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করুন যা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চর হলো এবং তাকে বললো, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, এসব ভাই তোমাকে কোনো কষ্ট দিতে পারবে না।



তখন ইয়াহুদার অন্তরে আল্লাহ তা‘আলা দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বললো, নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহকে ভয় করো এবং বালকটিকে তার পিতার কাছে নিয়ে চলো। তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করবে না। ভাইয়ের উত্তর দিল, আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কী? তুমি পিতার অন্তরে নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। মনে রাখো, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছা পূরণে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করবো।

ইয়াহুদা দেখলো যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে সে একা কিছু করতে পারবে না। তাই সে বললো, তোমরা যদি এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাকো, তবে আমার কথা শোনো, নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। সাপ, বিচ্ছু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণী এখানে বাস করে। তোমরা তাকে সেই কূপে ফেলে দাও। যদি কোনো সাপ ইত্যাদি তাকে দংশন করে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে এবং নিজ হাতে হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, তবে হয়তো কোনো কাফেলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বালতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। আর তারা তাকে সাথে করে অন্য কোনো দেশে পৌঁছে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

ইউসুফ আ. কে কূপে নিক্ষেপ

এ প্রস্তাবে ভাইয়েরা সবাই একমত হলো। তাদের এ বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْعَلُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَّبَتِ الْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

অর্থঃ অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চললো, এবং অন্ধকার কূপের গভীরে নিষ্ক্ষেপ করতে একমত হলো, তখন আমি তাকে ওহী দিয়ে জানিয়ে দিলাম যে, অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা এক সময় স্মরণ করিয়ে দিবে, আর তারা তখন তোমার উঁচু মর্যাদার কারণে তোমাকে চিনবে না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৫)

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, এ ওহী সম্পর্কে দু প্রকার ব্যাখ্যা থেকে পারে। (এক) কূপে নিষ্ক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাঁর সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্য এ ওহী পাঠানো হয়েছিল। (দুই) কূপে নিষ্ক্ষিপ্ত হওয়ার আগে আল্লাহ তা‘আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ আ. কে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জানিয়ে দিয়েছিলেন। এতে আরো বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমন পরিস্থিতি দেখা দিবে যে, তুমি তাদের তিরস্কার করার সুযোগ পাবে। অথচ তারা ধারণা করবে না যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ। কারণ, তখন তুমি অনেক উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করবে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ইউসুফ আ. কে কূপে নিষ্ক্ষেপ করতে উদ্যত হলো। তখন তিনি কূপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। ভাইয়েরা তাঁর জামা খুলে তা দিয়ে তাঁর হাত বাঁধলো। তখন ইউসুফ আ. পুনরায় তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনও তারা আগের মতো সেই উত্তরই দিল যে, যে এগারোটি নক্ষত্র তোকে সিঁজদা করেছিল, তাদেরকে ডাক



দে। তারাই তাকে সাহায্য করবে। অতঃপর ভাইয়েরা তাকে বালতিতে ভরে কূপে ছাড়তে লাগলো। সেটা মাঝপথে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল।

আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং ইউসুফ আ. কে হিফাযত করলেন। যদরূপ পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনোরূপ আঘাত পেলেন না। অতঃপর নিকটেই একখণ্ড ভাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি সুস্থ ও বহাল তবিয়ে তার উপরে বসে রইলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, জিবরাঈল আ. আল্লাহ পাকের আদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়ে দেন। ইউসুফ আ. তিন দিন কূপে অবস্থান করেন। ইয়াহূদা প্রত্যহ গোপনে তাঁর জন্য কিছু খাদ্য আনতো এবং বালতির সাহায্যে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতো। ইউসুফ আ. কে কূপে নিক্ষেপ করার পর তাঁর ভাইয়েরা সন্ধ্যা বেলায় কান্না করতে করতে তাদের পিতার নিকট উপস্থিত হলো। বিষয়টিকে নিম্নোক্ত আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ

অর্থঃ আর তারা রাতের অন্ধকারে কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এলো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৬)

হযরত ইয়াকুব আ. কান্নার শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী! তোমাদের ছাগল পালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসুফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা যা বললো, তা পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ

অর্থঃ তারা বললো, হে আমাদের আব্বা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের আসবাবপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তখন তাকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না; যদিও আমরা সত্যবাদী হই। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৭)

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বাঘই তাঁকে খেয়ে ফেলেছে। পবিত্র কুরআনে তাদের এ প্রতারণার কথা এভাবে বিবৃত হয়েছে,

وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ط

অর্থঃ তারা ইউসুফের জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনলো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৮)

কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাদের মিথ্যা ফাঁস করে দেয়ার জন্য তাদেরকে একটি জরুরী বিষয় থেকে গাফেল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত লাগানোর সাথে সাথে জামাটিও ছিন্ন করে দিত, তবে তারা ইউসুফকে বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করতে পারতো। কিন্তু তারা অক্ষত জামায় ছাগল ছানার রক্ত মাখিয়ে পিতাকে ধোঁকা দিতে চাইলো। ইয়াকুব আ. অক্ষত জামা দেখে বললেন, বাছারা! এ বাঘ কেমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে তো খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু জামার কোনো অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি!

এভাবে হযরত ইয়াকুব আ. এর কাছে তাদের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গেলে তিনি যা বললেন, তা কুরআন মাজীদে ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,



وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۖ قَالَ بَلْ سَوَّكْتُ لَكُمُ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبُّوا جَبِيلًا ۖ
وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝

অর্থঃ ইয়াকুব আ. বললেন, (এটা কারণই নয়;) বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন পূর্ণ ধৈর্য্য ধারণ করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছো, সে সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৮)

গভীর কূপ থেকে মুক্তি

ওদিকে আল্লাহর মেহেরবানীতে একটি কাফেলা সেই অন্ধকার কূপের কাছে এসে উপস্থিত হয়। তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে পড়েছে। তারা পানি সংগ্রহকারীদেরকে পানি খোঁজার জন্য কূপে প্রেরণ করলো। মিসরীয় কাফেলার পথ ভুলে এখানে পৌঁছা এবং এই অন্ধকারকূপের সমুখীন হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যারা সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে ভালো জানেন, তারা জানেন যে, এসব ঘটনা একটি অপরটির সাথে পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। হযরত ইউসুফ আ. এর স্রষ্টা ও রক্ষকই কাফেলাকে তাদের গন্তব্যের পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এবং ইউসুফকে সাহায্য করার জন্য কাফেলার লোকদেরকে এই অন্ধকার কূপে প্রেরণ করেছেন।

পানি আনার জন্য কাফেলার মালিক ইবনে দোবর নামক জনৈক ব্যক্তি সেই কূপে পৌঁছেন এবং বালতি নিষ্ক্ষেপ করলেন। ইউসুফ আ. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি

সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল পানি উত্তোলনকারীর দৃষ্টিতে ভেসে উঠলো।
পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,
وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۚ قَالَ يَبْشُرِي هَذَا غُلْمٌ ۖ وَأَسْرُوهُ
بِضَاعَةٍ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

অর্থঃ একটি কাফেলা এলো। অতঃপর তারা তাদের পানি
সংগ্রাহককে প্রেরণ করলো। সে নিজের বালতি ফেললো।
বললো, কী আনন্দের কথা! এ তো একটি কিশোর! (সূরা
ইউসুফ, আয়াত: ১৯)

অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে ওঠা এই অল্প
বয়স্ক অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক ইবনে দোবর
চিৎকার করে উঠলেন। মুসলিম শরীফে মিরাজ রজনীর হাদীসে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ইউসুফ
আ. এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ তা‘আলা
সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দান করেছেন এবং
অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বণ্টন করা হয়েছে।

কাফেলার লোকেরা তখন তাঁকে একটি মূল্যবান পণ্য মনে করে
গোপন করে ফেললো। আয়াতের পরবর্তী অংশে সে কথা বলা
হয়েছে,

وَأَسْرُوهُ بِضَاعَتًا ۖ

অর্থঃ তারা ব্যবসায়িক পণ্যরূপে তাকে গোপন করে ফেললো।

শুরুতে তো মালেক ইবনে দোবর এ কিশোরকে দেখে অবাক
বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন। কিন্তু পরে চিন্তাভাবনা করে স্থির
করলেন যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে
ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করা যায়।

অথবা এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা ঐ মুহূর্তে সেখানে এসেছিল। তারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাঁকে পণ্যদ্রব্য করে নিলো। যেমন, কোনো কোনো রিওয়ায়েতে আছে যে, ইয়াহুদা প্রত্যহ ইউসুফ আ. কে কূপের মধ্যে খানা পৌঁছানোর জন্য যেতো। তৃতীয় দিন তাঁকে কূপের মধ্যে না পেয়ে সে ফিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলো। অতঃপর সকল ভাই একত্রে সেখানে পৌঁছলো এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাফেলার লোকদের কাছ থেকে ইউসুফকে বের করলো। তখন তারা বললো, এ বালকটি আমাদের গোলাম, পলায়ন করে এখানে এসেছে। তোমরা একে কবজায় নিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছো।

একথা শুনে মালেক ইবনে দোবর ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগলো।

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফের ভাইয়েরা, নিজেরাই ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিলো। ইউসুফ আ. এর মতো একজন মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে ভাইয়েরা ছিল অজ্ঞ। আর তাছাড়া ইউসুফ আ. এর ভাইদের আসল উদ্দেশ্য টাকা উপার্জন ছিল না। আসল উদ্দেশ্যতো ছিলো পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। তাই তারা তাঁকে গুটি কতেক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল।

নিম্নেবর্ণিত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّالِمِينَ

অর্থঃ তারা তাকে বিক্রি করে দিল অতি অল্পমূল্যে-গুণাগুণিত কয়েক দিরহামে। আর তারা ছিল তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২০)

কাফেলার লোকেরা তাঁকে মিসর নিয়ে গেলেন। সেখানে নেয়ার পর ইউসুফ আ. কে বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতেই ক্রেতারা প্রতিযোগিতামূলক ভাবে দাম বলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ আ. এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মৃগনাভি ও সমপরিমাণ রেশমি বস্ত্র দাম সাব্যস্ত হলো।

ইউসুফ আ. কে ক্রয় করা

আল্লাহ তা‘আলা এ রত্ন, আযীযে মিসরের (মিসরের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী) এর জন্য নির্ধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইউসুফ আ. কে ক্রয় করে নেন।

আল্লাহ তা‘আলা মিসরে ইউসুফ আ. কে ক্রয় করার জন্য সে দেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. বলেন, “যে ব্যক্তি হযরত ইউসুফ আ. কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। তার নাম কিতাফীর। কোনো কোনো বর্ণনায় ইতফীরও এসেছে। তৎকালে মিসরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি রাইয়ান ইবনে উসাইদ। তিনি পরবর্তীকালে ইউসুফ আ.এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যু বরণ করেছিলেন।” (তাফসীরে মাযহারী)

ক্রেতা আযীযে মিসর-এর স্ত্রীর নাম ছিল রাঈল কিংবা যুলাইখা। আযীযে মিসর কিতাফীর ইউসুফ আ. সম্পর্কে স্ত্রীকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, নিম্নে বর্ণিত আয়াতে তা-ই বিবৃত হয়েছে,

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ
وَلَدًا

অর্থঃ মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করলো, সে তার স্ত্রীকে বললো, তার সম্মানজনক থাকার ব্যবস্থা করো। হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নিব। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২১)

আয়াতে বর্ণিত “সম্মানজনক থাকার ব্যবস্থা” দিয়ে উদ্দেশ্য ছিল, তাকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও। ক্রীতদাসের মতো রেখো না এবং তার প্রয়োজনাতির সুবন্দোস্ত করো।

তিন ব্যক্তির বিচক্ষণতা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমজন আযীযে মিসর, তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দিয়ে হযরত ইউসুফ আ. এর গুণাবলী সম্বন্ধে অবহিত হয়ে স্ত্রীকে তার উত্তম বন্দোবস্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়জন হযরত শু‘আইব আ. এর ঐ কন্যা, যিনি মূসা আ. সম্পর্কে স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন,

قَالَتْ اِخْذُهَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

অর্থঃ পিতাজী! তাকে মজদুর রেখে দিন। কেননা আপনার উত্তম মজদুর সবল ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই হতে পারে। (সূরা কাসাস, আয়াত: ২৬)

তৃতীয়জন আবু বকর সিদ্দীক রা., তিনি স্বীয় দূরদর্শিতা দিয়ে ফারুককে আযম হযরত উমর রা. কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

ইউসুফ আ. এর প্রতি আযীযে মিসর-এর স্ত্রীর আসক্তি

ইউসুফ আ. আযীযে মিসর-এর ঘরে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে এক পরীক্ষামূলক বিপদ এই দেখা দিল যে, আযীযে মিসর-এর স্ত্রী হযরত ইউসুফ আ. এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লো। এ প্রেক্ষিতে উক্ত মহিলা তার সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাকে ফুসলাতে লাগলো। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَرَاوَدُّهُ الْيَتَّى هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

অর্থঃ যে মহিলার ঘরে ইউসুফ আ. ছিলেন, সে তাকে ফুসলাতে লাগলো এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সেই মহিলা বললো, শোনো! তোমাকে বলছি, এদিকে আসো! তিনি বললেন, আল্লাহ রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আমার মালিক আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। আর অবশ্যই সীমা লঙ্ঘনকারীরা কখনো সফলকাম হয় না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২৩)

উক্ত মহিলা ছিল আযীযে মিসর-এর স্ত্রী। কিন্তু এ স্থলে পবিত্র কুরআনে “আযীযের পত্নী” শব্দ ব্যবহার না করে “যার ঘরে ছিল” এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইউসুফ আ. এর উক্ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরো অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই ঘরে তারই আশ্রয়ে থাকতেন। সুতরাং তার আদেশ উপেক্ষা করা তার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। হযরত ইউসুফ আ. যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গাম্বরসূলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহ

তা‘আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বললেন, **مَعْدُودُ اللَّهِ** (আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি)

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের ওপর ভরসা করেননি, বরং মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। এ ছাড়াও তিনি পয়গাম্বরসুলভ বিজ্ঞতা ও নসীহত পেশ করে স্বয়ং সেই মহিলাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা।

ইউসুফ আ. আরো বললেন যে, আপনার স্বামী আযীযে মিসর আমাকে লালন-পালন করছেন, আমাকে উত্তম আবাসন দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী; অথচ আমি তার ইযযতে হস্তক্ষেপ করবো! এটা জঘন্য অনাচার। আর অনাচারীরা কখনও কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না।

সুন্দী ইবনে ইসহাক রহ. প্রমুখ তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় সেই মহিলা ইউসুফ আ. কে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ইউসুফ আ. এর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছাসিত প্রশংসা করতে লাগলো। সে বললো, তোমার চুল কত সুন্দর! ইউসুফ আ. বললেন, মৃত্যুর পর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর সে বললো, তোমার দুই চোখ কতই না আকর্ষণীয়। ইউসুফ আ. বললেন, মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। সে আরো বললো, তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয়! ইউসুফ আ. বললেন, এগুলো সব মাটির খোরাক।



আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইউসুফ আ. এর মনে পরকালের চিন্তা এত বেশী প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগ-বিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। এভাবে আখিরাতের চিন্তা-ই মানুষকে সব রকম অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে।

আগে আলোচিত হয়েছে যে, আযীযে মিসর-এর স্ত্রী যুলাইখা ঘরের দরজা বন্ধ করে ইউসুফ আ. কে পাপ কাজের দিকে আহ্বান করে। তখন ইউসুফ আ. আল্লাহর নিদর্শন দেখার করার সাথে সাথে যুলাইখার কুমতলবের নাগপাশ ছিন্ন করে বন্ধ দরজাসমূহের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন এবং কোনোরূপ দ্বিধা বা চিন্তার মধ্যে সময় ব্যয় করলেন না। এ সময় হযরত ইউসুফ আ. স্বীয় প্রতিপালকের কী নিদর্শন দেখেছিলেন, পবিত্র কুরআনে সেটা বলা হয়নি। তবে বিভিন্ন রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে তাফসীরবিদগণ এ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যুবাইর, মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী রহ. প্রমুখ বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলার মু‘জিযা হিসেবে এ নির্জন কক্ষে হযরত ইয়াকুব আ. এর চিত্র এভাবে ইউসুফ আ. এর সামনে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে হুঁশিয়ার করেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আযীযে মিসর-এর মুখচ্ছবি তাঁর সামনে ফুটিয়ে তোলা হয়। কেউ বলেন, ইউসুফ আ. এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠতেই সেখানে কুরআন মাজীদেব এর আয়াত লিখিত দেখেন,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

অর্থঃ তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা খুবই জঘন্য নির্লজ্জতা (যা খোদায়ী শাস্তির কারণ) এবং অত্যন্ত গর্হিত পথ। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩২)

কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, যুলাইখার ঘরে একটি মূর্তি ছিল। সেই মুহূর্তে যুলাইখা মূর্তিটিকে কাপড় দিয়ে আবৃত করলো। ইউসুফ আ. এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে সে বললো, এটা আমার উপাস্য, এর সামনে পাপ কাজ করার মতো সাহস আমার নেই। তখন ইউসুফ আ. বললেন, আমার উপাস্য তো আরো বেশী লজ্জা করার উপযুক্ত। কেননা, তাঁর দৃষ্টিকে কোনো পর্দা ঠেকাতে পারে না।

কারো কারো মতে, ইউসুফ আ. এর নবুয়্যাত ও দীনী জ্ঞানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তা সম্পর্কে তাঁর এই দিব্যদৃষ্টির কারণ, যাকে আয়াতে “তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শন” বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীরবিদগণ আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন, কুরআন মাজীদ যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু নিয়ে ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ আ. এমন কিছু দেখেছেন, যদ্বন্ধে তাঁর মন সৎ ও ন্যায়ের পথে আরো দৃঢ়পদ হয়েছে। আর এ বিষয়টি কী ছিল, তাফসীরবিদগণ এ ব্যাপারে যা কিছু উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর যে কোন একটি হতে পারে। তাই নিশ্চিতরূপে কোনো একটি নির্দিষ্ট করা যায় না।

হযরত ইউসুফ আ. এ নির্জন কক্ষে মহান আল্লাহর নিদর্শন দেখার সাথে সাথেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উদ্যত হলেন এবং বন্ধ দরজার দিকেই দৌড় দিলেন। তখন আযীয পত্নী তাঁকে

ধরার জন্য তাঁর জামা টেনে ধরে তাঁকে বাইরে যেতে বাঁধা দিতে চাইলো। কিন্তু ইউসুফ আ. পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ় সংকল্প। তাই থামলেন না, বরং খুব দ্রুত বেগে সামনে ধাবমান হলেন। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে গেল। ইতিমধ্যে ইউসুফ আ. দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তাঁর পিছে পিছে যুলাইখাও সেখানে উপস্থিত হলো।

ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, দরজাগুলো তালাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইউসুফ আ. দৌড়ে দরজায় পৌঁছতেই মহান আল্লাহর কুদরতে আপনা-আপনি তালাগুলো খুলে নীচে পড়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ ইউসুফ আ. বের হয়ে গেলেন।

তারা উভয়ে দরজার বাইরে আসতেই আযীযে মিসরকে সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। আযীযে মিসরকে দেখেই তার স্ত্রী চমকে উঠলো। অতঃপর নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বানিয়ে ইউসুফ আ. এর উপর দোষ চাপিয়ে বলল, “আপনার পরিবারের সাথে যে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি কী হতে পারে এ ছাড়া যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্য কোনো কঠোর শাস্তি দেয়া হবে?

পবিত্র কুরআনে বিষয়টি এভাবে বিবৃত হয়েছে,

وَأَسْتَبْقَى الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْصُصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيْ سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থঃ তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেললো। আর উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বললো, যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রীর সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে এ ছাড়া আর কী শাস্তি

দেয়া যেতে পারে যে, তাকে কারাগারে পাঠানো হবে অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে? (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২৫)

ইউসুফ আ. পয়গাম্বরসূলভ ভদ্রতার খাতিরে হয়তো সেই মহিলার গোপন ইচ্ছার কথা প্রকাশ করতেন না। কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে ইউসুফ আ. এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিল, তখন বাধ্য হয়ে তিনি সত্য প্রকাশ করে বললেন,

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي

অর্থঃ বরং তিনিই স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ফুঁসলিয়েছেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬২)

ইউসুফ আ. এর পক্ষে নবজাতক শিশুর সাক্ষ্য প্রদান

ব্যাপারটি খুবই নাজুক এবং আযীযে মিসর-এর পক্ষে কে সত্যবাদী, তার মীমাংসা করা কঠিন ছিল। কেননা, সেখানে সাক্ষ্য-প্রমাণের কোনো অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ ও পবিত্র রাখেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁদেরকে অশুভ চক্রান্ত থেকে বাঁচিয়ে রাখারও ব্যবস্থা করেন।

সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ কথা বলতে অক্ষম নবজাতক শিশুদেরকে কাজে লাগান। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বান্দাদের পবিত্রতা প্রমাণ করেন। যেমন, হযরত মারইয়ামের প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের নবজাতক শিশু ঈসা আ. কে আল্লাহ তা‘আলা বাকশক্তি দান করে তাঁর মুখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন। তেমনিভাবে বনী ইসরাঈলের জুরাইজ নামক একজন সাধু ব্যক্তির প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে

এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করা হলে, নবজাতক শিশু সেই ব্যক্তির পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করে। অনুরূপভাবে হযরত মুসা আ. এর প্রতি ফির‘আউনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে, ফির‘আউনের স্ত্রীর চুল পরিচর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং সে মুসা আ. কে শৈশবে ফির‘আউনের কবল থেকে রক্ষা করে।

ঠিক তেমনিভাবে ইউসুফ আ. এর ঘটনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু হুরাইরা রা. এর বর্ণনায় রয়েছে, মহান আল্লাহ একটি শিশুকে বিজ্ঞ ও দার্শনিকসুলভ বাক শক্তি দান করলেন। এই কচি শিশু এ ঘরেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে কারো ধারণা ছিল না যে, সে এসব কর্মকাণ্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনাকারীদের সঠিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্য দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু তাঁর গুপ্ত বাহিনী। এরা অপরাধীকে ভালোভাবেই চেনে, তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা প্রকাশও করে দিতে পারে। এ ছোট শিশুটি বাহ্যত জগতের সব কিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়ে ছিল। সে ইউসুফ আ. এর মু‘জিয়া হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুললো, যখন আযীযে মিসর ছিলেন এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত।

এ শিশুটি যদি এতটুকু বলে দিত যে, ইউসুফ আ. নির্দোষ এবং দোষ যুলাইখার, তবে তাও একটি মু‘জিয়ারূপে ইউসুফ আ. এর পক্ষে তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি

উচ্চারণ করালেন এভাবে যে, সে বললো, “ইউসুফ আ. এর জামাটি দেখ; যদি তা সামনের দিকে ছেঁড়া থাকে তবে যুলাইখার কথা সত্য এবং ইউসুফ আ. মিথ্যাবাদী পরিগণিত হবেন। আর যদি জামাটি পেছন দিকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে এতে এ ছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনাই নেই যে, ইউসুফ আ. পলায়নরত ছিলেন এবং যুলাইখা তাঁকে পিছন থেকে আটকে ধরে পলায়নে বাধা দিতে চাচ্ছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউসুফ আ. অবশ্যই সত্যবাদী সাব্যস্ত হবেন এবং যুলাইখা হবে মিথ্যাবাদী।” এটা এজন্য এভাবে উপস্থাপন করা হলো যে, শিশুর অলৌকিক বাকশক্তি ছাড়াও, এ বিষয়টি যেন প্রত্যেকের কাছে যুক্তি সঙ্গত মনে হয় এবং এর কারণে চাক্ষুষ প্রমাণ আযীয়ে মিসর নিজেই পেয়ে যেতে পারেন।

অতঃপর যখন বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটির পেছন দিকে ছেঁড়া দেখা গেল, তখন ইউসুফ আ. এর পবিত্রতা বাস্তবভাবেই প্রতিভাত হয়ে গেল। পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে,

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ
وَإِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْا قَبِيضَهُ قَدْ مِّنْ
دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ۝

অর্থঃ মহিলার পরিবারের একজন সাক্ষী (শিশু) সাক্ষ্য দিল যে, যদি তার জামা সামনের দিক দিয়ে ছেঁড়া থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী হবে। আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী হবে। অতঃপর ঘরস্বামী যখন দেখলো যে, ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া তখন সে বললো, নিশ্চয় এটা

তোমাদের নারীদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা অত্যন্ত ভীষণ। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২৬-২৮)

আযীযে মিসর শিশুটির এভাবে কথা বলার দিয়েই বুঝে নিয়েছিলেন যে, ইউসুফ আ. এর পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যেই এ অস্বাভাবিক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

তদুপরি তার বক্তব্য অনুযায়ী যখন দেখলেন যে, ইউসুফ আ. এর জামাটি পেছন থেকে ছেঁড়া, তখন আযীযে মিসর নিশ্চিত হলেন যে, দোষ যুলাইখার এবং ইউসুফ আ. পবিত্র। তাই তিনি যুলাইখাকে সম্বোধন করে বললেন, “এসব তোমার ছলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে এ ফন্দি এটেছো।”

নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক

উক্ত আয়াতে আযীযে মিসর নারী জাতির ছলনা অত্যন্ত মারাত্মক বলে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবিকই নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বোঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা, তারা বাহ্যত কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। তাই যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথা দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। অথচ এসব ক্ষেত্রে অনেকাংশেই তারা বিবেক-বুদ্ধি ও আল্লাহ ভীতির অভাব বশত মিথ্যা ছলনা করে থাকে এবং কথা বানোয়াট করে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে থাকে। অবশ্য যারা আল্লাহভীরু ও পরহেযগার, তারা কখনও এরূপ ছলনা করে না। (তাফসীরে মাযহারী)

অতঃপর ঘটনার প্রেক্ষিতে আযীযে মিসর ইউসুফ আ. কে যা বললেন, তা পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا

অর্থঃ ইউসুফ! এ ঘটনা উপেক্ষা কর (এবং ব্যাপারটি বলাবলি করো না। যাতে আমার বেইজ্জতি না হয়)। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২১৯)

পরিশেষে তিনি যুলাইখাকে আত্মসংশোধনের জন্য যে উপদেশ দিলেন, তা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ

অর্থঃ তুমি নিজের অন্যায়ের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করো। তুমি তো পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছ। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২৯)

এখানে বাহ্যত বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করতে বলা হয়েছে। আবার এটাও হতে পারে যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। কিংবা এটাও হতে পারে যে, ইউসুফ আ. এর কাছে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে।

আযীযে মিসরের স্ত্রীর ব্যাপারে নারীদের কুৎসা রচনা

অতঃপর এক কান দুকান করে ব্যাপারটি লোক সমাজে জানা জানি হয়ে গেল। তখন নগরের কতিপয় মহিলা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযে মিসর-এর স্ত্রী স্বীয় গোলামকে অবৈধ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ফুঁসলায়! ছিঃ কেমন রুচি! কত নিচু তার মন যে, চাকরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে! কুরআন পাকের নিম্নোল্লিখিত আয়াতে তাদের এ কুৎসা রচনা বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে,

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

অর্থঃ নগরের মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কামনা চরিতার্থ করার জন্য ফুঁসলায়। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩০)

যুলাইখা যখন সেসব মহিলাদের কানাঘুষার কথা জানতে পারলো, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠালো এবং ইউসুফ আ. এর ব্যাপারে তার উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা প্রকাশ করতে চাইলো। নিম্নের আয়াতে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে,

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ

অর্থঃ যখন সে (যুলাইখা) তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে শুনতে পেল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করলো। সে তাদের হেলান দেওয়ার জন্য উন্নত বিছানার ব্যবস্থা করলো এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল। আর ইউসুফ আ. কে বললো, এদের সামনে একটু বের হও। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩১)

উল্লিখিত আয়াতে মহিলাদের কানাঘুষাকে যুলাইখা “চক্রান্ত” আখ্যা দিয়েছে বলে বলা হয়েছে। অথচ বাহ্যত তারা কোনো চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করছিল, তাই যুলাইখা একে চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছে। কেননা, তাদের কোনো আপত্তি থাকলে সামনে বলা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা না করে অগোচরে সমালোচনা করে বেড়াচ্ছে।

অতঃপর মহিলারা যখন ভোজসভায় উপস্থিত হলো, তখন তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল-ফলাদি উপস্থিত করা

হলো। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার মতো ছিল। তাই প্রত্যেককে এক একটি করে চাকু দেওয়া হলো। তারা সেই ফল হাতে নিয়ে চাকু দিয়ে কেটে কেটে খেতে লাগলো।

ইতোমধ্যে অন্য কক্ষে অবস্থানরত ইউসুফ আ. কে কোনো কাজের বাহানায় বললো, এই মহিলাদের এখানে একটু আসো।

ইউসুফ আ. তার কু-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতেন না। আগেই যে যুলাইখার আমন্ত্রিত মহিলারা পাশের কামরায় সমবেত, ইউসুফ আ. তা জানতেন না। তাই মনিবের নির্দেশে স্বীয় কামরা থেকে বের হয়ে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূড় হয়ে গেলেন।

অপরদিকে হযরত ইউসুফ আ. কে দেখামাত্র উপস্থিত মহিলাদের মাঝে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে তা ব্যক্ত করা হয়েছে,

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

অর্থঃ যখন আমন্ত্রিত মহিলারা ইউসুফ আ. কে এক নজর দেখলো, তখন তারা হতভম্ব হয়ে গেল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো। আর তারা বললো, সুবহানাল্লাহ! এ তো মানব নয়, এ তো কোনো সম্মানিত ফেরেশতা! (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩১)

বলাবাহুল্য, উপস্থিত মহিলারা ইউসুফ আ. কে দেখে তাঁর রূপ-সৌন্দর্য অবলোকন করে হতভম্ব হয়ে গেল এবং তখন যে চাকু দিয়ে ফল কেটে খাচ্ছিল, তাতে ফলের পরিবর্তে হাত কেটে ফেললো। আর তারা ইউসুফ আ. কে ফেরেশতা বলে আখ্যায়িত

করলো। কেননা, তারা এরূপ অনন্য রূপ-সৌন্দর্যের অপরূপ নূরানী চেহারার মানুষ কখনও দেখেনি।

অতঃপর যুলাইখা উপস্থিত মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললো,
 قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمُتْنِي فِيهِمْ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ
 يَفْعَلْ مَا أَمَرْتُ لَكُنَّ لَيَسْجَنَ ۖ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝

অর্থঃ এই সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভৎসনা করেছিলে। আর হ্যাঁ, আমি বাস্তবিকই তাকে ফুঁসলিয়ে ছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। তবে ভবিষ্যতে আমি তাকে যে আদেশ দিই, সে যদি তা পালন না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে যাবে ও লাঞ্ছিত হবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩২)

যুলাইখা যখন দেখলো যে, সমাগত মহিলারা তার ব্যাপারটির তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে, এমনকি তাঁকে দেখে নিজেরাও অপ্রকৃতস্থ হয়ে গিয়েছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ আ. কে ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলো যে, ভবিষ্যতে তুমি যদি আমার আদেশ অমান্য করো, তবে অবশ্যই তোমাকে জেলখানায় নিক্ষেপ করা হবে এবং অপদস্থ করা হবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারাও ইউসুফ আ. কে যুলাইখার প্রতি ফুঁসলাতে লাগল যে, তুমি যুলাইখার কাছে অনেক ঋণী। কাজেই তোমার জন্য তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।

ইউসুফ আ. দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও যুলাইখার সুরে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে এবং এ মুহূর্তে তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার ব্যাহ্যিক কোনো উপায় নেই। তখন উক্ত

কঠিন মুহূর্তে তিনি আল্লাহ তা‘আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন
এবং তাঁর দরবারে দু‘আ করে আরজ করলেন,

قَالَ رَبِّ السَّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ
الْيَهُنَّ ۖ وَ أَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের
দিকে আহ্বান করছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে অধিক
পছন্দনীয়। যদি আপনি তাদের চক্রান্তকে আমার উপর থেকে
প্রতিহত না করেন, তাহলে আমি তাদের ফাঁদে আটকে যাবো
এবং জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত:
৩৩)

“জেলখানা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়” এ কথা বলা ইউসুফ
আ. এর বন্দীজীবন প্রার্থনা বা কামনা করা নয়; বরং পাপ
কাজের বিপরীত এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে করারই
বহিঃপ্রকাশ।

কোনো কোনো রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যখন হযরত ইউসুফ
আ. জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে
ওহী এলো “আপনি নিজেকে নিজে জেলে নিক্ষেপ করেছেন।
কারণ, আপনি বলেছিলেন, জেলখানা আমার নিকট অধিক
পছন্দনীয়। এটা না করে আপনি নিরাপত্তা চাইলে, আপনাকে
পুরাপুরি নিরাপত্তা দান করা হত।

নারীদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ আ. এর পরিত্রাণ

আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইউসুফ আ. এর দু‘আ কবুল করলেন
এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন।
নিম্নলিখিত আয়াতে সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ ۝

অর্থঃ অবশেষে তার পালনকর্তা তার দু‘আ কবুল করলেন এবং তার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৪)

আল্লাহ তা‘আলা সেই মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ আ. কে বাঁচানোর জন্য একটি ব্যবস্থা করলেন এই যে, ইউসুফ আ. এর দু‘আ অনুযায়ী তাঁকে জেলে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করলেন। তা এভাবে যে, ইউসুফ আ. এর সৎচরিত্রতা, তাকওয়া ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখে আযীযে মিসর ও তার পরিষদবর্গের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ইউসুফ আ. সৎ ও পবিত্র। কিন্তু শহরময় এ বিষয়ে ব্যাপক কানাঘুসা হতে থাকে। পরিশেষে এ কানাঘুসার অবসান ঘটানোর জন্য এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হয় যে, ইউসুফ আ. কে কিছুদিনের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এর দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এবং জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে যাবে। নিম্নেবর্ণিত আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ,

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدُهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

অর্থঃ অতঃপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাঁকে কিছু দিনের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখা সমীচীন মনে করলো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৫)

পরিশেষে আযীযে মিসর ও তার পরিষদবর্গ কিছুদিনের জন্য ইউসুফ আ. কে জেলে আবদ্ধ করলো। সেখানে ইউসুফ আ. জেলের বন্দীখানায় কালাতিপাত করতে লাগলেন।

হযরত ইউসুফ আ. কারাগারে পৌঁছলে সাথে আরো দুজন অভিযুক্ত কয়েদীও প্রবেশ করলো। তাদের একজন বাদশাহকে শরাব পান করাতো এবং অপরজন বাদশাহর বাবুর্চি ছিল। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. তাফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, তারা উভয়ে বাদশাহর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মুকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

হযরত ইউসুফ আ. কারাগারে প্রবেশ করে পয়গাম্বরসুলভ চরিত্র-দয়া ও অনুকম্পার দ্বারা সকলের মন জয় করেন। তিনি সকল কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতেন এবং যথাসাধ্য তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবায়ত্ন করতেন। কাউকে চিন্তিত ও পেরেশানীযুক্ত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন, ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। এভাবে নিজে কষ্ট করে অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

তাঁর এ অবস্থা দেখে কারাগারের সকল কয়েদী তাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে লাগলো। কারাধ্যক্ষ তাঁর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বললো, আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোনোরূপ কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি। এতটুকু আমার ইখতিয়ারে আছে।

ইউসুফ আ. এর সাথে যে দুজন কয়েদী কারাগারে প্রবেশ করেছিল, তারা একদিন বললো, আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। এ কথা বলে তারা তাঁর নিকট স্বপ্নের কথা প্রকাশ করে তা'বীর জানতে চাইল।



তাদের মধ্যে যে বাদশাহ শরাব পান করাতো সে বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আস্তুর থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ বাবুর্চি বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার মাথা রুটিভর্তি একটি ঝুড়ি রয়েছে আর তা থেকে পাখিরা ঠোকরিয়ে ঠোকরিয়ে আহাৰ করছে। অতঃপর তারা উভয়ে ইউসুফ আ. কে তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানালো। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে,

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِنِي أَخْصِرُ حُبْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

অর্থঃ তাঁর সাথে দুজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করলো। তাদের একজন বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি শরাব নিংড়াচ্ছি। আর অপরজন বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখি ঠোকরিয়ে খাচ্ছে। আপনি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দিন। আমরা আপনাকে নেককার বলেই জানি। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৬)

ইউসুফ আ. এর কাছে তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি পয়গাম্বরসুলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তরদানের আগে তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং তাদের নিকট দীন প্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন।

দাওয়াতের মূলনীতিঃ হিকমত ও বিচক্ষণতা

দাওয়াতের মূলনীতি অনুযায়ী, হিকমত ও বিচক্ষণতাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু'জিয়ার কথা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্যে প্রত্যহ যেই

খাদ্য তোমাদের বাসা, কারাগার কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগে আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ সম্পর্কে বলে দিব। আর এটা কোনো ভবিষ্যৎ কখন, জ্যোতিষবিদ্যা কিংবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেলকি নয়, বরং আমার পালনকর্তা ওহীর মাধ্যমে আমাকে তা বলে দেন বলেই আমি তা তোমাদেরকে বলে দিতে পারি। পবিত্র কুরআনের নিম্নোবর্ণিত আয়াতে এ বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَيْكُمْ رَبِّيَ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

অর্থঃ ইউসুফ আ. বললেন, তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা তোমাদেরকে বলে দিব। এ জ্ঞান আমাকে আমার রব শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৭)

এরপর ইউসুফ আ. প্রথমে তাদের কাছে কুফরের নিন্দা এবং কাফেরদের ধর্মের প্রতি স্থায়ী বিমুখতা বর্ণনা করলেন। অতঃপর আরো বললেন যে, আমি নবী পরিবারেরই একজন এবং তাঁদেরই সত্য দীনের অনুসারী। আমার পিতৃপুরুষ হচ্ছে ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব আ.। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৭-৩৮)

এরপর বললেন যে, আল্লাহ তা‘আলার সাথে খোদায়ী গুণাবলীতে কাউকে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা আমাদের জন্য মোটেই বৈধ নয়। আর এ দীনে হকের তাওফীক অর্জন আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহর তা‘আলার অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

অতঃপর হযরত ইউসুফ আ. কয়েদীদের প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, তোমরাই বলো, অনেক পালনকর্তার উপাসক হওয়া ভালো, নাকি এক আল্লাহর দাস হওয়া ভালো, যিনি সবার উপর পরাক্রমশালী। তারপর অন্য এক পন্থায় মূর্তিপূজার অনিষ্টতা বর্ণনা করে বললেন, তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কিছু সংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তা রূপে গ্রহণ করে নিয়েছো। অথচ এদের মধ্যে এমন কোনো সত্তাগত গুণ নেই যে, এদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ, এরা সবাই যে চেতনা ও অনুভূতিহীন এটা চাক্ষুষ বিষয়। অবশ্য এদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপায় ছিল এই যে, আল্লাহ তা‘আলা এদের উপাসনার জন্য নির্দেশ নাযিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধি যদিও এদের খোদায়ী স্বীকার করে না, কিন্তু আল্লাহ পাকের নির্দেশের কারণে আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও যুক্তি প্রমাণ ছেড়ে তাঁর নির্দেশ পালন করতাম। কিন্তু এখানে এরূপ কোনো নির্দেশও নেই। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা এসব কৃত্রিম উপাস্যের ইবাদত করার ব্যাপারে কোনো যুক্তি-প্রমাণ কিংবা হুকুমও নাযিল করেননি। বরং তিনি একথাই বলেছেন যে, ইবাদত গ্রহণের অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই। অতঃপর হযরত ইউসুফ আ. তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য দীনই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য জানে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে রয়েছে,

يُصَاحِبِي السِّجْنِ عَازِبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَيَّيْتُهِنَّ وَآبَاؤَهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا
لِلَّهِ ۖ أَمَرَ الْأَنْتَعِبُونَ إِلَّا آيَاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

অর্থঃ (ইউসুফ আ. বললেন,) হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! পৃথক
পৃথক অনেক উপাস্য ভালো, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?
তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে কেবল কতগুলো নামের উপাসনা করো,
যে নামগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা সাব্যস্ত করে
নিয়েছ। আল্লাহ তা‘আলা এদের ব্যাপারে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ
করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি
আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা-তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত
করো না। এটাই সরল সঠিক দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা
জানে না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৯-৪০)

দীন প্রচার, দীনী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পন্ন করার পর
ইউসুফ আ. কয়েকদিনের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং
বললেন, তোমাদের একজন মুক্তি পাবে এবং চাকুরীতে
পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহকে শরাব পান করাবে। আর অপরজনের
অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে গুলে চড়ানো হবে। তখন
পাখিরা তার মাথার মগজ ঠোকরিয়ে খাবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ
কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,

يُصَاحِبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خُبْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ
مِنْ رَأْسِهِ ۖ

অর্থঃ ইউসুফ আ. বললেন, হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের
একজন আপন মনিবকে শরাব পান করাবে এবং অপরজনকে

শুলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪১)

বিশিষ্ট তাফসীর বিশারদ আল্লামা ইসমাইল ইবনে কাসীর রহ. বলেন, উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্ধারিত ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহকে শরাব পান করাতো, সে খালাস পেয়ে চাকুরীতে পুনর্বহাল হবে এবং অপরজন তথা বাবুর্চিকে শুলে চড়ানো হবে। কিন্তু ইউসুফ আ. পয়গাম্বরসুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাদের অমুককে শুলে চড়ানো হবে। যাতে সে এখন থেকেই চিন্তাশ্রিত না হয়ে পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে শুলে চড়ানো হবে। সবশেষে ইউসুফ আ. বললেন, আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা নিছক অনুমান-ভিত্তিক নয়; বরং এটাই আল্লাহ তা‘আলার অটল ফয়সালা।

অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ আ. বললেন, যখন তুমি খালাস পেয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌঁছাবে, তখন তুমি বাদশাহর কাছে আমার বিষয়ে আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ে লোকটি মুক্তি পেল। কিন্তু মুক্তি পেয়ে সে ইউসুফ আ. এর কথা ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ আ. এর মুক্তির ব্যাপারটি আরো বিলম্বিত হয়ে গেল। তাতে করে আরো কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হলো। নিম্নেবর্ণিত আয়াতে এ কথাই উল্লেখ করা হয়েছে,

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ
فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝

অর্থঃ তাদের দু'জনের মধ্যে যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে ইউসুফ আ. তাকে বললেন, আপন মনিবের কাছে আমার কথা আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে মনিবের কাছে তার আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তিনি কয়েক বছর কারাগারে কাটালেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪২)

অত্র আয়াতের بَضْعُ শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরও সাত বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে।

বাদশাহর স্বপ্ন

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আ. এর মুক্তির জন্য কুদরতীভাবে এ ব্যবস্থা সৃষ্টি করলেন যে, বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগকুল হয়ে পড়লেন। তাই রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যাদাতা ও অতীন্দ্রিয়বাদীদেরকে একত্র করে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু স্বপ্নটি কারো বোধগম্য হলো না। তাই তারা কেউ বললো, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। আবার কেউ বললো, এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। অন্যরা বললো, আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না।

বাদশাহ স্বপ্নে কী দেখেছেন এবং পরিষদবর্গ উত্তরে কী বলেছেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে,

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَوَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخْرَى يَسْتِطِيعُ أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءُيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ۝ قَالُوا اصْغَتْ
أَحْلَامٌ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِينَ ۝

অর্থঃ বাদশাহ বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটা-তাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুকনো দেখলাম। হে পরিষদবর্গ! তোমরা আমাকে এ স্বপ্ন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দাও, যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাকো। তারা বললো, এটা অর্থহীন কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমরা অবগত নই। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪৩-৪৪)

সেই মুহূর্তে মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর ইউসুফ আ. এর কথা মনে পড়লো। তৎক্ষণাৎ সে বাদশাহর নিকট গিয়ে বললো; আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। আমাকে এজন্য ইউসুফ আ. এর নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝

অর্থঃ বন্দীদ্বয়ের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং লম্বাকাল পর তার (ইউসুফ আ. এর কথা) স্মরণ হলো। সে বললো, আমি আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে পারব। আমাকে ইউসুফ আ. এর নিকট প্রেরণ করুন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪৫)

এ পর্যায়ে সে ইউসুফ আ. এর গুণাবলী, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগার আবদ্ধ থাকার কথাও বর্ণনা করে অনুরোধ করলো যে, যেন তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বাদশাহ সেই লোকের কথা মতো তাকে ইউসুফ আ. এর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। সে ইউসুফ আ. এর কাছে গিয়ে আরজ করলো। পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَوِيَّاتٍ يَأْكُلُهَا سَبْعُ عِجَافٍ وَ سَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خَضْرًى وَأُخْرٍ يُسَيِّتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

অর্থঃ হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটা-তাজা গাভী তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুকনো শীষ। আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে পথনির্দেশ করুন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে অবগত করতে পারি। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪৬)

লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ আ. এর সত্যবাদিতা বা কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার স্বীকৃতি প্রকাশ করলো। অতঃপর আবেদন করলো যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্নটি হচ্ছে, বাদশাহ সাতটি মোটা তাজা গাভী দেখেছেন, যেগুলোকে অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলছে। এ ছাড়াও তিনি সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুকনো শীষ দেখেছেন। আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে আমি ফিরে গিয়ে বাদশাহর কাছে তা বর্ণনা করবো। আর অবশ্যই এতে তিনি আপনার জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে অবগত হবেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

হযরত ইউসুফ আ. উক্ত স্বপ্নের বিবরণ শুনে তার ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে যে, সাতটি মোটা-তাজা গাভী সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছর অতিক্রান্ত হবে। তেমনিভাবে সাতটি শীর্ণ অর্থ হচ্ছে, এরপর দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে।

আর এগুলো সাতটি গাভীতে খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে, প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বীজের জন্য কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে যাবে। কুরআন পাকের নিম্নেবর্ণিত আয়াতে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে,

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَكْتُمُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَخْتُنُونَ ۝

অর্থঃ ইউসুফ আ. বললেন, তোমরা একাধারে সাত বছর উত্তমরূপে ফসল আবাদ করবে। অতঃপর তোমরা যে ফসলাদি উত্তোলন করবে, তার মধ্যে থেকে নিজেদের খাওয়ার জন্য অল্প কিছু রেখে অবশিষ্ট ফসলাদি শীষের মধ্যেই রেখে গুদামজাত করে রাখবে। এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের এমন সাতটি বছর, যা অত্যন্ত কঠিন হবে। তোমরা আগে যা গুদামজাত করে রেখেছিলে, এ সাত বছরে তা থেকে খেতে থাকবে। তবে সামান্য পরিমাণ তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪৭-৪৮)

বাদশাহর স্বপ্নে মূলত এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভালো ফসল হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু ইউসুফ আ. এর সাথে আরো একটু বিষয় যুক্ত করে বললেন,

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ۝

অর্থঃ এরপরেই আসবে এমন একটি বছর, যাতে মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং এতে তারা রস নিংড়াবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪৯)

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বছরগুলো অতিক্রান্ত হয়ে গেলে, এক বছর খুব বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে।

হযরত কাতাদাহ রা. বলেন, আল্লাহ তা‘আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ আ. কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করেছিলেন। যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু জ্ঞান তারা লাভ করে এবং এতে তাঁর জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ পায়। তাতে তার মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে।

তদুপরি ইউসুফ আ. শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞানোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছর যেই অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীষের মধ্যে সংরক্ষিত রাখতে হবে, যাতে পুরোনো হওয়ার পর গমে পোঁকা না লাগে। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোঁকা লাগে না।

ইউসুফ আ. এর কারামুক্তি

বাদশাহ নিজ স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে আশ্বস্ত হলেন এবং ইউসুফ আ. এর জ্ঞান গরিমায় বিমুগ্ধ হয়ে আদেশ দিলেন যে, তাকে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এসো। আদেশের সাথে সাথে বাদশাহর জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌঁছলো।

ইউসুফ আ. সুলতান বন্দিজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহর ফরমানকে সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি সরাসরি তা করলেন না। বরং আল্লাহ পাক স্বীয় পয়গাম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, সেই মর্যাদার আলোকে তাঁদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করার ব্যবস্থা করলেন।

اٰرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۖ اِنَّ رَبِّيْٓ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌۭ

অর্থঃ ফিরে যাও তোমরা মনিবের কাছে এবং তাকে জিজ্ঞেস করো ঐ রমণীদের কী অবস্থা, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল? আমার রব তো তাদের ছলনা সবই অবগত। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫০)

ইউসুফ আ. বললেন, তুমি বাদশাহর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করো যে, যে সকল মহিলারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের ব্যাপারে বাদশাহ জানেন কি না? এবং আমাকে নির্দোষ বলে জানেন কি না?

হযরত ইউসুফ আ. কারাগার থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ পাওয়ার পরও সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন না, বরং আগে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করাতে চাইলেন। তাই বাদশাহ যখন ইউসুফ আ. কে মুক্ত করে রাজদরবারে তার নিকট নেয়ার জন্য দূত পাঠালেন, তখন তাকে বাদশাহর নিকট ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং বলে পাঠান যে, যে মহিলারা ইউসুফ আ. কে দেখে হতভম্ব হয়ে হাত কেটে ছিল, তাদের মাধ্যমে যেন তিনি ঘটনার তদন্ত করে প্রকৃত দোষীকে সনাক্ত করেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِيْ بِهٖ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اٰرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۖ اِنَّ رَبِّيْٓ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌۭ

অর্থঃ বাদশাহ বললেন, ইউসুফকে (মুক্ত করে) আমার নিকট নিয়ে এসো। যখন দূত (এ পয়গাম নিয়ে) ইউসুফ আ. এর নিকটে এলো, তিনি তাকে বললেন, তোমার মনিবের নিকট ফিরে যাও

এবং তাকে জিজ্ঞাসা করো সেই মহিলাদের কী হাল যারা হাত কেটেছিল? নিশ্চয়ই আমার প্রভু তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত।
(সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫০)

আযীয পত্নীর নাম উল্লেখ না করার কারণ

এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ আ. এখানে ঐ সকল মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা হাত কেটেছেন, কিন্তু আযীয পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি। অথচ সে-ই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু।

এর কারণ হচ্ছে, যেহেতু ইউসুফ আ. আযীযঘরে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তাই ভদ্রতার খাতিরে সরাসরি আযীয পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি। তবে তার জানা আছে যে, সেই মহিলাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলেই আযীয পত্নীর কথা এমনিতেই বেরিয়ে আসবে।

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। আর তা এ মহিলাদের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে যেতে পারে এবং তাতে তাদের তেমন কোনো অপমানও নেই। তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দেওয়ার দোষ তাদের ঘাড়ে চাপবে। কিন্তু আযীয পত্নীর অবস্থা এরূপ ছিল না। তাই সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে, তাকে ঘিরেই তদন্তকার্য অনুষ্ঠিত হতো। ফলে তার অপমান বেশী হতো।

তৃতীয় কারণ এই যে, আযীয পত্নী আযীয মিসর-এর নিকট ঘটনা অস্বীকার করে ইউসুফ আ. এর উপর দোষ চাপালেও হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদের নিকট নিজের সব দোষ অকাতরে স্বীকার করেছেন এবং তাদের সামনেই ইউসুফ আ. কে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করলে কঠোর শাস্তি প্রদানের হুমকি দিয়েছেন। সুতরাং হস্ত

কর্তনকারিণী মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই সত্য ঘটনা প্রমাণ হয়ে পড়বে এবং ঘটনার রহস্য আগা-গোড়া সব উদঘাটিত হয়ে যাবে। আর এতে করে ইউসুফ আ. এর নির্দোষিতা তো প্রমাণ হবেই, অধিকন্তু তাঁর সততা, সৎপরায়ণতা ও চারিত্রিক পবিত্রতাও পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

ইউসুফ আ. সাথে সাথে আরো বললেন, “আমার পালনকর্তা তাদের মিথ্যা ও ছল-চাতুরি সম্পর্কে সম্যক অবগত।” সুতরাং আমি চাই যে, বাদশাহও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন এবং তিনি যেন বুঝতে পারেন যে, ইউসুফ আসামী হিসাবে জেলে ছিলেন না, বরং মজলুম হয়ে জেলে ছিলেন।

কুরআন মাজীদে আয়াতের এ অংশে সূক্ষ্মভাবে ইউসুফ আ. এর পবিত্রতার কথাও বর্ণিত হয়েছে। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ ইউসুফ আ. এর দাবী অনুযায়ী হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদেরকে জিজ্ঞাসা করে ঘটনার তদন্ত করলেন। তখন যুলাইখা ও অন্যসব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করলো। পবিত্র কুরআনে নিম্নবর্ণিত আয়াতে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে,

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوُذْتَن يُونُسَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ
قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ ائِنَّ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوُذْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّه لَكَا
الصَّادِقَيْنِ

অর্থঃ বাদশাহ মহিলাদেরকে বললেন, তোমাদের ঘটনা সম্পর্কে কী মূল্যায়ন যখন তোমরা ইউসুফকে কামনা চরিতার্থ করার জন্য ফুঁসলিয়েছিলে? তারা বললো, সুবহানাল্লাহ! আমরা তাঁর সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না। তখন আযীযপত্নী বললো, এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আমিই তাকে স্বীয় কামনা

চরিতার্থের জন্য ফুঁসলিয়েছিলাম এবং নিঃসন্দেহে সে-ই সত্যবাদী। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫১)

স্বীয় পবিত্রতা ও সত্যবাদিতা প্রকাশ হওয়ার পর ইউসুফ আ. আশ্বস্ত হলেন। অতঃপর নিজের এ প্রক্রিয়ার পক্ষে সাফাই প্রকাশ করে বললেন,

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰٓئِنِيْنَ ۝

অর্থঃ আমার এ তদন্ত কামনা এজন্য যে, যাতে আযীযে মিসর জানতে পারেন, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর আল্লাহ তা‘আলা বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তকে এগুতে দেন না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫২)

মিসরের বাদশাহ তখন ইউসুফ আ. এর সততা, সাধুতা ও বিশ্বস্ততায় প্রীত ও সন্তুষ্ট হলেন। তাই পুনরায় দূতকে ইউসুফ আ. এর নিকট পাঠিয়ে বললেন, ইউসুফ আ. কে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত উপদেষ্টা নির্বাচিত করবো।

নির্দেশ অনুযায়ী ইউসুফ আ. কে সসম্মানে কারাগার থেকে রাজ দরবারে নিয়ে আসা হলো। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ফলে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ বললেন, “আপনি আজ থেকে আমাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব।” কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে,

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُونِيْ بِهٖ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِیْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَ اِنِّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَكِيْنٌ ۝ اٰمِيْنٌ ۝

অর্থঃ বাদশাহ বললেন, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের একান্ত সহকারী বানাবো। অতঃপর তিনি যখন তার

সাথে মতবিনিময় করলেন, তখন বললেন, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৪)

ইমাম বাগাবী রহ. বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহর দূত দ্বিতীয়বার কারাগারে ইউসুফ আ. এর কাছে পৌঁছলো এবং বাদশাহর পয়গাম পৌঁছলো, তখন ইউসুফ আ. সব কারাবাসীর জন্য দু‘আ করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি বাদশাহর দরবারে পৌঁছে এই দু‘আ পড়লেন,

حَسْبِيَ رَبِّي مِنْ دُنْيَايَ وَحَسْبِيَ رَبِّي مِنْ خَلْقِهِ، عَزَّ جَارُهُ وَجَلَّ ثَنَاءُهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.

অর্থঃ আমার দুনিয়ার জন্য আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সকল সৃষ্টির মুকাবিলায় আমার রবই আমার জন্য যথেষ্ট। যে তাঁর আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে, তার স্থান সিফাত উচ্চ মর্যাদার হয়ে যায় তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

অতঃপর ইউসুফ আ. আরবী ভাষায় সালাম প্রদান করেন, “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” এবং বাদশাহর জন্য হিব্রু ভাষায় দু‘আ করেন। বাদশাহ অনেক ভাষা জানতেন, কিন্তু আরবী ও হিব্রু ভাষা তার জানা ছিল না। ইউসুফ আ. বলে দেন যে, সালাম আরবী ভাষায় এবং দু‘আ হিব্রু ভাষায় করা হয়েছে।

এ রিওয়ায়েতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাদশাহ ইউসুফ আ. এর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও উপলব্ধির জন্য তাঁর সাথে বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন। ইউসুফ আ. তাকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং সাথে সাথে আরবী ও হিব্রু এই দু‘টি অতিরিক্ত ভাষাও শুনিয়ে দেন। এতে যোগ্যতা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

অতঃপর বাদশাহ বললেন, আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা সরাসরি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। ইউসুফ আ. প্রথমে মূল স্বপ্ন সম্বন্ধে এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ নিজেও কারো কাছে বর্ণনা করেননি। অতঃপর সেই স্বপ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করলেন।

বাদশাহ বললেন, আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় কি করে জানলেন? ইউসুফ আ. বললেন, এটা আমার, আপনার ও সকলের প্রভু-প্রতিপালক মহান আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন।

অতঃপর বাদশাহ পরামর্শ চাইলেন যে, এখন কি করা দরকার? ইউসুফ আ. বললেন, প্রথম সাত বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে, জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে এবং উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছড়ার মধ্যে নিজের কাছে সঞ্চিত রাখতে হবে।

এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভাণ্ডার মজুত থাকবে এবং আপনি তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবেন। এমতাবস্থায় রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিনদেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। কারণ এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূর দেশ অবধি বিস্তৃত। ভিনদেশিরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারি ধনভাণ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগত হবে।



এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন, এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কীভাবে হবে এবং কে করবে? ইউসুফ আ. তাকে যথাবিহিত পরামর্শ দিয়ে বললেন,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ আমাকে দেশের ধনভাণ্ডার নিযুক্ত করুন। আমি (আল্লাহর রহমতে) বিশ্বস্ত রক্ষক ও বেশ অভিজ্ঞ। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৫)

অর্থাৎ জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করতে আমি সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি জ্ঞান আছে। (আল-জামি'লিআহকামিল কুরআন)

একজন অর্থমন্ত্রীর মাঝে যেসব গুণ থাকা দরকার, উপযুক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে ইউসুফ আ. তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিলেন। কেননা, অর্থমন্ত্রীর জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারি ধন-সম্পদ বিনষ্ট থেকে না দেওয়া; বরং পূর্ণ হিফায়ত সহকারে একত্র করা এবং অনাবশ্যক ও ভ্রান্ত খাতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা দরকার, সেখানে সেই পরিমাণ ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোনো কমবেশি না করা। حَفِيظٌ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনীয় গুণ এবং عَلِيمٌ শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় গুণের নিশ্চয়তা বহন করছে।

বাদশাহ যদিও ইউসুফ আ. এর গুণাবলীতে মুগ্ধ ও তাঁর তাকওয়া ও বুদ্ধিমত্তায় পুরোপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি কার্যত তাঁকে অর্থমন্ত্রী পদ সোপর্দ করলেন না, বরং আরো বৃহত্তর উদ্দেশ্যে তাঁকে এক বছর পর্যন্ত একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে রাজ দরবারে রেখে দিলেন।

অতঃপর এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বাদশাহ শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয়, বরং সম্পূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁর নিকট সোপর্দ করে তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে দেন। সম্ভবত এই বিলম্বের কারণ ছিল এই যে, নিকট সান্নিধ্যে রেখে তাঁর চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে বাদশাহর পুরোপুরি অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

ইউসুফ আ. এর সাথে যুলাইখার বিবাহ

কোনো কোনো তাফসীরবিদ লিখেছেন, এ সময়ই যুলাইখার স্বামী আযীযে মিসর কিতফীর মৃত্যু বরণ করেন এবং বাদশাহর উদ্যোগে ইউসুফ আ. এর সাথে যুলাইখার বিবাহ সম্পাদন করা হয়।

তখন ইউসুফ আ. যুলাইখাকে বললেন, তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চাইতে উত্তম নয়? যুলাইখা স্বীয় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাওবা করলেন।

আল্লাহ তা‘আলা সসম্মানে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব সুখ-শান্তিতে তাঁদের দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত হয়। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী, তাঁদের ঔরশে দুজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ছিল ইফরায়ীম ও মানশা।

কোনো কোনো রিওয়ায়েতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহর তা‘আলা ইউসুফ আ. এর অন্তরে যুলাইখার প্রতি এত গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন যে, যুলাইখার অন্তরে ততটুকু ইউসুফ আ.-এর প্রতি ছিল না। এমনকি একবার ইউসুফ আ. যুলাইখাকে অভিযোগের সুরে বললেন, এর কারণ কি যে, আগের ন্যায় আমাকে ভালোবাসো না? উত্তরে যুলাইখা বললেন, আপনার উসিলায় আমি আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসা অর্জন করেছি। এ



ভালোবাসার সামনে অন্য সব সম্পর্ক ও ভাবনা ম্লান হয়ে গেছে।
(তাফসীরে মাযহারী)

তবে উল্লেখ্য যে, তাঁদের এ বিবাহের এসব ঘটনার স্বপক্ষে মজবুত কোনো হাদীস নেই। সুতরাং এর উপর ততটা ইয়াকীন করা যায় না।

মিসরের বাদশাহ ইউসুফ আ.

এক বছর হযরত ইউসুফ আ. রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাদশাহ রাজ দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। সেখানে রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণ আমন্ত্রিত হন। তখন হযরত ইউসুফ আ. কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নয়, বরং গোটা রাজত্ব ইউসুফ আ. এর নিকট সোপর্দ করে বাদশাহ নির্জনবাসী হয়ে যান। (তাফসীরে মাযহারী; তাফসীরে কুরতুবী)

কুরআন মাজীদে নিম্নোলিখিত আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে,

وَكَذَلِكَ مَكْنًا لِّيُؤَسِّفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থঃ এমনি করে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। তিনি তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারতেন। আমি যাকে ইচ্ছা রহমত পৌঁছে দেই এবং আমি নেককারদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৬)

ইউসুফ আ. এর সুদক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনা



দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর হযরত ইউসুফ আ. এমন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেন যে, কারো কোনো অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তাঁর প্রশংসা মুখর হয়ে উঠলো এবং সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল।

রাষ্ট্রের দায়িত্বপালনে ইউসুফ আ. কোনোরূপ বাধা-বিপত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি। সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনার পাশাপাশি তিনি দীন প্রতিষ্ঠার কাজ আঞ্জাম দেন। বিশিষ্ট তাফসীরবিদ আল্লামা মুজাহিদ রহ. বলেন, এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দিয়ে ইউসুফ আ. এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধিবিধান জারী করা এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত করা। তাই তিনি সর্বদা এ ব্যাপারে সজাগ ছিলেন এবং এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। জনগণের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইউসুফ আ. এমন কাজ করেন, যার নজীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যানুযায়ী সুখ-শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ইউসুফ আ. পেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দেন। সবাই বললো, মিসর সম্রাজ্যের যাবতীয় ধন-সম্পদ আপনার কবজায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা? তিনি বললেন, সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সে জন্য এটা করি। সেই সাথে তিনি শাহী বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দেন, দিনে মাত্র একবার দুপুরের খাদ্য রান্না করবে, যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছুটা অংশগ্রহণ করতে পারে।

ইউসুফ আ. যেহেতু পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন যে, দুর্ভিক্ষ সাত বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে তিনি দেশের মজুদ শস্য-ভাণ্ডার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত



রাখলেন। মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত করানো হলো।

দেখতে দেখতে দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়লো এবং চতুর্দিক থেকে বুভুক্ষু জনসাধারণ মিসরে আগমন করতে লাগলো। তাদেরকে ইউসুফ আ. একটি বিশেষ পরিমাণে খাদ্যশস্য দিতেন; এর বেশী দিতেন না। ইমাম কুরতুবী রহ. এর পরিমাণ এক ওয়াসাক অর্থাৎ ষাট সা‘ লিখেছেন, যা আমাদের দেশীয় ওজন অনুযায়ী দুইশ দশ সের (পাঁচ মনের কিছু বেশী হয় বা প্রায় ১৯৫ কেজি হয়)।

তিনি এ কাজটিতে এত গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি নিজেই করতেন। আর তখন শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং দূর-দূরান্ত অঞ্চলও এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল।

হযরত ইয়াকুব আ. এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা ‘খলীল’ নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ আ. এর সমাধি অবস্থিত। এ এলাকাটিও দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকুব আ. এর পরিবারেও অনটন দেখা দেয়।

সে সময় মিসরের এ সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে অনেক খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। তখন হযরত ইয়াকুব আ. এর কানে এ সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের বাদশাহ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি নিজেই স্বয়ং জনসাধারণের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। তাই তিনি পুত্রদেরকে বললেন, তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো।

এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দেওয়া হয় না। তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠানোর মনস্থ করলেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ামীন ছিলেন ইউসুফ আ. এর সহোদর ভাই। ইউসুফ আ. নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে ইয়াকুব আ. এর স্নেহ ও ভালোবাসা তার প্রতিই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার জন্য তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। খাদ্যশস্য আনার জন্য তাকে পাঠালেন না।

ইউসুফ আ. এর ভাইদের মিসরে আগমন

দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌঁছল। ইউসুফ আ. শাহী পোশাকে রাজাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভাইরা তাঁকে পথিক কাফেলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর রিওয়াযাত অনুযায়ী, ইউসুফ আ. শাহী পোশাকে রাজাধিপতির বেশে তাদের সামনে যখন এলেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছর। (তফসীরে মায়হারী)

বলাবাহুল্য, এত লম্বা সময়ে মানুষের আকার-অবয়ব পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর ভাইদের ধারণায়ও একথা ছিল না যে, যেই বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রি করেছিল, সে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী বা বাদশাহ হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ইউসুফ আ. কে চিনলো না। কিন্তু ইউসুফ আ. তাদেরকে চিনে ফেললেন। নিম্নোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে,

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

অর্থঃ ইউসুফ আ. এর ভাইয়ের আগমন করলো। অতঃপর তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। তিনি তাদেরকে চিনে ফেললেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৮)

ইউসুফ আ. এর চিনে নেওয়া সম্পর্কে ইবনে কাসীর রহ. আরো বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই রাজ দরবারে পৌঁছলে ইউসুফ আ. তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমন সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়। যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য কথা ব্যক্ত করে।

প্রথমত জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাতো হিব্রু। এমতাবস্থায় এখানে কীভাবে আসলে। তারা বললো, আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্য এখানে এসেছি।

দ্বিতীয়ত প্রশ্ন করলেন, তোমরা যে সত্য বলছো এবং তোমরা কোনো শত্রুর চর নও, একথা কেমন করে বিশ্বাস করবো? ভাইয়েরা বললো, আল্লাহর পানাহ! আমাদের দিয়ে এরূপ কখনো থেকে পারে না। আমরা আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুব আ. এর সন্তান। তিনি কেনানে বসবাস করেন।

হযরত ইয়াকুব আ. ও তাঁর পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানা এবং ওদের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বিবৃত হোক, তাদেরকে প্রশ্ন করার পেছনে এটাই ছিল ইউসুফ আ. এর মূল লক্ষ্য। তাই এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতার আরো কোনো সন্তান আছে কি?

তারা বললো, আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাঁকে সর্বাধিক আদর

করতেন। এরপর ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। তাই তাকে আমাদের সাথে এ সফরে পাঠাননি।

তাদের সব কথা শুনে ইউসুফ আ. তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন।

আগেই বণ্টনের ব্যাপারে ইউসুফ আ. এর এ রীতি ছিল যে, একবারে কোনো এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন। ভাইদের কাছ থেকে নিজ বাড়ির সব বিবরণ জানার পর তাঁর মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পুনর্বার আসুক। এজন্য একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি ভাইদেরকে বললেন,

اَتُّنُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَيْبِكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

অর্থঃ তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের ছোট সৎভাইকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। কেননা, তোমরাতো দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কীভাবে পুরোপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং উত্তম অতিথি আপ্যায়ন করি। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৯)

এরপর তিনি ভাইদেরকে একটি সাবধান বাণীও শুনিয়ে দিলেন,

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ

অর্থঃ কিন্তু যদি তোমরা সেই সৎভাইকে সাথে নিয়ে না আসো, তাহলে আমি তোমাদেরকে কোনো খাদ্যশস্য দেব না এবং তোমরা আমার কাছেও আসবে না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬০)

ইউসুফ আ. অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি বা অলংকারাদি

জমা দিয়েছিল, সেগুলো গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন। যাতে বাড়ি পৌঁছে তারা যখন আসবাবপত্র খুলবে এবং তাদের প্রদানকৃত মূল্য প্রত্যাশিত দেখতে পাবে, তখন যেন সহজেই পুনরীর খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য আসতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে,

وَقَالَ لِفَتِيلِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

অর্থঃ ইউসুফ স্বীয় কর্মচারীদেরকে বললেন, তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদপত্রের মধ্যে রেখে দাও। এতে হয়ত তারা স্বজনদের কাছে পৌঁছে তা বুঝতে পারবে, যাতে তারা পুনরায় আসতে পারে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬২)

ইউসুফ আ. কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও যেন তাঁর সাক্ষাত ঘটান সুযোগ আসে।

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন করলো, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও বললো, মিসরের বাদশাহ আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেওয়ার জন্য একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, তা না হলে নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বিনয়ামীনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করবেন। এতে আমাদের খাদ্যশস্য লাভের পথ সুগম হবে এবং তার কারণে বর্ধিত খাদ্যশস্য পাবো। আর আমরা আশ্বস্ত

করছি যে, তার পুরোপুরি হিফায়ত করবো। তার কোনো ধরনের কষ্ট হবে না। নিম্নেবর্ণিত আয়াতে বিষয়টি বিবৃত হয়েছে,

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نُّكَتِلُ وَإِنَّا لَهُ

لَحَافِظُونَ ۝

অর্থঃ তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এলো, তখন তারা বললো, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ছাড়া খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব, আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন; যাতে আমরা খাদ্যশস্য বরাদ্দ পেতে পারি। আর আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হিফায়ত করবো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৩)

ছেলেদের আবেদনের জবাবে ইয়াকুব আ. যা বললেন, তা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বিবৃত হয়েছে :

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ

অর্থঃ তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে সেরূপ বিশ্বাস করবো, যেমন এর আগে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৪)

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পয়গাম্বরসুলভ তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে তিনি সম্মতি দিয়ে বললেন,

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলাই উত্তম হিফায়তকারী এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৪)

এতক্ষণ পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা সম্পর্কেই তাদের কথাবার্তা চলছিল। আসবাবপত্র তখনো খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হলো দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ

পরিশোধিত নগদ অর্থকড়ি ও অলংকারাদি আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা অনুভব করতে পারলো যে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের পুঁজি তাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

তখন তারা পিতাকে বললো, আমরা আর কী চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার যাওয়া দরকার। কারণ, এ আচরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মিসরের বাদশাহ আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই চিন্তার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া ভাইকে সঙ্গে নিলে, তার অংশের বরাদ্দ অতিরিক্ত পাবো। কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাটি বিবৃত হয়েছে,

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا مَا نَبِئُكِ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَنَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذُكِّكَ كَيْلٌ
يَسِيرٌ ۝

অর্থঃ যখন তারা তাদের আসবাবপত্র খুললো, তখন তারা তাতে নিজেদের পণ্যমূল্য প্রত্যাপিত পেল। তারা তখন বললো, হে আমাদের আন্না! আমরা আর কী চাই, দেখুন, এই যে, আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য আবার রসদ আনবো। আর আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করবো এবং এক উটের বরাদ্দ খাদ্যশস্য আমরা অতিরিক্ত আনবো। ঐ বরাদ্দ খুবই সহজ। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৫)

তাদের এসব কথা শুনে ইয়াকুব আ. যে উত্তর দিলেন, তা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে,

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ

অর্থঃ তিনি বললেন, তাকে আমি ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৬)

উল্লেখ্য, সত্যশ্রয়ীগণের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কখনো অন্তর্হিত হয় না যে, মানুষ বাহ্যত যত শক্তি-সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহ তা‘আলার শক্তির সামনে তারা নিতান্তই অপারগ ও অক্ষম। তারা কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে? কারণ, তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তাদের নেই।

إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ

অর্থঃ ঐ অবস্থা ছাড়া, যখন (ঘটনাক্রমে) তোমরা সবাই কোনো বেষ্টনীতে আটকে যাও। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৬)

তাফসীরবিদ মুজাহিদ রহ. বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, ঘটনাচক্রে তোমরা সবাই যদি মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাতাদাহ রহ. এর মতে এর অর্থ এই যে, যদি তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়ো। অর্থাৎ সেই অবস্থায় যেহেতু তোমরা অপারগ, তাই তখন বিনয়ামীনকে হেফাযতের দায়িত্বের ব্যাপারে ক্ষমার যোগ্য হবে।

ছেলেরা যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা অঙ্গীকার করলো, তখন ইয়াকুব আ. সার্বিক বিষয় মহান আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করে বললেন, বিনয়ামীনের হেফাযতের ব্যাপারে হলফ নেওয়া ও হলফ করার সে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ হিফাযত করতে পারে এবং কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। নিম্নেবর্ণিত আয়াতে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে,



فَلَمَّا أَتَوْهُ مُوْتَقِعُهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

অর্থঃ অতঃপর যখন তারা তাঁকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিলো, তখন তিনি বললেন, আমরা যা কিছু বলছি, তা আল্লাহরই কাছে সোপর্দ। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৬)

বিনয়ামীনকে নিয়ে দ্বিতীয়বার মিসরে আগমন

ছোট ভাই বিনয়ামীনকে নিয়ে যখন ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা দ্বিতীয়বার মিসর সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো, তখন ইয়াকুব আ. তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর প্রাচীরের কাছে পৌঁছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো। এরূপ উপদেশ এজন্য দিয়েছিলেন যে, তারা ছিল স্বাস্থ্যবান, সুঠামদেহী, সুদর্শন ও রূপ-গুঞ্জুল্যের অধিকারী। এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং পরস্পর ভাই ভাই, তখন কারো বদনজর লেগে তাদের ক্ষতি হতে পারে। অথবা সঙ্গবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

অবশ্য মহান আল্লাহর উপর তাঁর পুরোপুরি ভরসা ছিল। তবে তাওয়াক্কুলের সাথে সাথে আসবাব ইখতিয়ার করাই তো কর্তব্য। তাই তিনি এ উপদেশ দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে,

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَاذْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

অর্থঃ ইয়াকুব আ. বললেন, হে আমার বৎসগণ! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। অবশ্য আল্লাহ তা‘আলার কোনো ফয়সালা থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। ফয়সালা তো কেবল আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত সকল ভরসাকারীর। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৭)

উল্লেখ্য, ইয়াকুব আ. এ সফরে বিনয়ামীনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় তদবীর গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁকে আশাহত হতে হয়েছে। কেননা, অন্য এক ঘটনাসূত্রে বিনয়ামীনকে মিসরে আটকে রাখা হয়েছে। নিম্নেবর্ণিত আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَأْكَانَ يَغْفِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً
فِي نَفْسٍ يَعْذُوبُ قَضَاهَا

অর্থঃ তারা যখন পিতার কথামতো প্রবেশ করলো, তখন আল্লাহ তা‘আলার ফয়সালার বিপরীত তা তাদের কোনো কাজে আসল না। কিন্তু ইয়াকুব আ. তাঁর মনের একটি বাসনা পূর্ণ করেছিলেন মাত্র। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৮)

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে তদবির ব্যর্থ হয়েছে, যদিও আশংকাকৃত কুদৃষ্টি, হিংসা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের যে ঘটনা অনিবার্য ছিল, তা সংঘটিত হয়েছে। তবে তদবিরের এ বাহ্যিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করার বরকতে পরবর্তী সময়ে এ দ্বিতীয় আঘাত প্রথম আঘাতের প্রতিকার প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিণামে পরম নিরাপত্তা ও ইজ্জতের সাথে

ইউসুফ আ. ও বিনয়ামীন এর সাথে ইয়াকুব আ. এর সাক্ষাত লাভ হয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসছে।

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা মিসরে প্রবেশ করে ইউসুফ আ. এর নিকট গেল। ইউসুফ আ. তাদের ছোট ভাই বিনয়ামীনকে সাথে দেখে খুব খুশি হলেন এবং তাদের উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন।

অতঃপর ইউসুফ আ. ছোট ভাই বিনয়ামীনকে বিশেষ একটি হিকমতের মাধ্যমে নিজের সাথে রেখে দিলেন। সেই হিকমত সম্পর্কে বিশিষ্ট তাফসীরবিদ কাতাদাহ রহ. বলেন, সব ভাইদের থাকার ব্যবস্থা করে ইউসুফ আ. প্রতি দুজনকে একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বিনয়ামীন একা থেকে গেল। তখন ইউসুফ আ. তাকে নিজের সাথে অবস্থান করতে বললেন।

সেখানে যখন উভয়েই একান্তে মিলিত হলেন, তখন ইউসুফ, আ. বিনয়ামীনের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ। এখন তোমার কোনো চিন্তা নেই। অন্য ভাইয়েরা এ যাবত যে দুর্ব্যবহার করেছিল, তার জন্য মনে কষ্ট নেয়ার প্রয়োজন নেই। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে,

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُسُفَٰءٍ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থঃ যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো, তখন তিনি আপন ভাইকে নিজের কাছে রাখলেন। আর বললেন, নিশ্চয় আমি তোমার সহোদর ভাই। অতএব, তারা যা করছিল, সেজন্য দুঃখ করো না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৯)

ইউসুফ আ. বিনয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিলেন

এরপর ইউসুফ আ. বিনয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দেয়ার এবং বিনয়ামীনকে ছাড়া-ই ভাইদেরকে বিদায় করার মনস্থ করলেন। সেজন্য এই কৌশল অবলম্বন করলেন যে, যখন সব ভাইকে নিয়ম মাসিক খাদ্যশস্য দেওয়া হলো, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হলো এবং সে সময় বিনয়ামীনের নামে যে খাদ্যশস্য উটের পিঠে উঠানো হলো, তাতে বাদশাহর একটি পাত্র গোপনে রেখে দেওয়া হলো। কুরআন পাক এ পাত্রটিকে এক জায়গায় السَّقَايَةِ শব্দ দিয়ে এবং অন্যত্র صُوعِ الْمَلِكِ শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

السَّقَايَةِ শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং صُوعِ শব্দটিও এমন ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

একে الْمَلِكِ তথা বাদশাহর দিকে সম্পৃক্ত করার ফলে বিশেষভাবে বুঝা গেল যে, এ পাত্রটি বেশ মূল্যবান ছিল। কোনো কোনো রিওয়ায়েতে রয়েছে, পাত্রটি ‘যবরজদ’ পাথর দিয়ে তৈরিকৃত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণনির্মিত এবং কেউ রৌপ্যনির্মিতও বলেছেন।

বিনয়ামীনের রসদপত্রে গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহর সাথে এটি সম্পৃক্ত হওয়ার এর এ বিশেষত্ব প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাদশাহ নিজে এটা ব্যবহার করতেন, কিংবা বাদশাহর আদেশে তা খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হতো।

অতঃপর ইউসুফ আ. এর ভাইদের কাফেলা যখন প্রত্যাবর্তনের জন্য রওয়ানা হলো, তখন জনৈক ঘোষক ডেকে বলল,

কাফেলার লোকজন! আপনারা চোর। কুরআনে হাকীমের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে,

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ
إِنكُم لَسُرِقُونَ ○

অর্থঃ অতঃপর যখন ইউসুফ আ. তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলেন, তখন পানপাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করে বলল, হে কাফেলার লোকজন! আপনারা নিশ্চয় চোর। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭০)

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা ঘোষণাকারীদের ঘোষণা শুনে আশ্চর্য হয়ে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, তোমরা আমাদেরকে চোর বলছো! প্রথমে একথা আমাদেরকে বলো যে, তোমরা কী বস্তু হারিয়েছ? ঘোষণাকারীরা বললো,

نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَسْنَا بِهٖ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ○

অর্থঃ আমরা বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছি এবং যে কেউ তা এনে দেবে, সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে। এ ব্যাপারে আমি এর জামিন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭২)

তখন ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বললো,

تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِينَ ○

অর্থঃ আল্লাহর কসম! আপনার তো অবশ্যই জানেন, আমরা কিছুতেই এতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৩)

তখন রাজকর্মচারীরা জব্দ করে বললো,



قَالُوا فَبِأَظْهَارٍ أَنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ۝

অর্থঃ যদি আপনার মিথ্যাবাদী হন, তাহলে তার শাস্তি কী হবে?
(সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৩)

তখন নিজেদের দেশের কানুন বর্ণনা করে ইউসুফ আ. এর
ভায়েরা বললো,

قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُ ۝ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝

অর্থঃ এর শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া যাবে,
এর প্রতিদান সে নিজেই হবে। এভাবে আমরা জালিমদেরকে
শাস্তি দিই। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৫)

অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব আ. এর শরী‘আতে চোরের শাস্তি এই ছিল
যে, চোর যার মাল চুরি করবে, সে চোরকে গোলাম বানিয়ে
রাখবে।

রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভাইদের মুখ থেকে ইয়াকুবী
শরী‘আত অনুযায়ী চোরের শাস্তি ব্যক্ত করলো, যাতে
বিনয়ামীনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলে, তারা
নিজেরাই ফয়সালা অনুযায়ী বিনয়ামীনকে ইউসুফ আ. এর হাতে
সোপর্দ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর সরকারী কর্মচারীরা ইউসুফ
আ.এর ভাইদের আসবাবপত্র তল্লাশী করতে লাগলো। তারা
তাদের কৌশলের ব্যাপারটিকে আড়াল করার জন্য এবং
সন্দেহের উর্ধ্বে রাখার জন্য প্রথমেই বিনয়ামীনের রসদপত্রে
তল্লাশী করলো না, বরং শুরুতে অন্য ভাইদের রসদপত্রে তল্লাশী
করলো। যাতে এ নিয়ে তাদের মনে কোনো খটকা না লাগে।
অবশেষে বিনয়ামীনের রসদপত্র তল্লাশী করা হলো, তা থেকে
শাহী পাত্রটি বের হলো।



পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে,

فَبَدَأَ أَبُو عِيْتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ ط

অর্থঃ অতঃপর ইউসুফ আ. আপন ভাইদের থলের আগে তাদের (অন্য ভাইদের) থলে তল্লাশী করলেন। অবশেষে আপন ভায়ের থলে তল্লাশী করে সেখান থেকে পানপাত্রটি বের করলেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৬)

তখন ইউসুফ আ. এর ভায়েরা হতভম্ব হয়ে গেল। তাদের বড়গলা রইল কোথায়? তাই লজ্জায় তাদের মাথা নিচু হয়ে গেল এবং তারা বিনয়ামীনকে গালমন্দ করে বললো, তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে!

এ ঘটনার আগেই ইউসুফ আ. বিনয়ামীনকে স্বীয় কৌশলের ব্যাপারে অবগত করেছিলেন। তাই বিনয়ামীন উক্ত ঘটনায় কোনোরূপ বিচলিত হলেন না এবং ভাইদের তিরস্কারের প্রেক্ষিতেও কোনো প্রতি উত্তর করলেন না।

বিনয়ামীনের রসদপত্র থেকে পাত্রটি বের হওয়ায় ইউসুফ আ. ইয়াকুবী শরী‘আত অনুযায়ী বিনয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। তিনি সে দেশের বাদশাহর আইন অনুযায়ী তাকে রাখতে পারতেন না। কেননা, মিসরে আইনে তাকে মারপিট করে এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেওয়ার বিধান ছিল। তাই যাতে তার ক্ষেত্রে ইয়াকুবী শরী‘আত অনুযায়ী ফয়সালা করা যায়, সে জন্য আগেই ভাইদের মুখ থেকে ইয়াকুব আ. এর দেশের রীতি অনুযায়ী ফয়সালা করার অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছিলেন।



সেই অনুযায়ী বিনয়ামীনকে আটকে রাখা বিধিসম্মত হলো।
এভাবে আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় ইউসুফ আ. এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

নিম্নোক্ত আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে,

كَذَلِكَ كِدْنَا يُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ

অর্থঃ এমনিভাবে আমি ইউসুফ আ. এর জন্য বিশেষ কৌশল সৃষ্টি করে দিলাম। তিনি বাদশাহর আইনে কখনো আপন ভাইকে আটকে রাখতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৬)

ইউসুফ আ. এর উপর চুরির অপবাদ

এ পর্যায়ে ইউসুফ আ. এর ভায়েরা স্ফোভ প্রকাশ করে বললো, সে যদি চুরি করে থাকে, তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ, তার এক সহোদর ভাইও এর আগে চুরি করেছিল। নিম্নোক্ত আয়াতে একথা বিবৃত হয়েছে,

قَالُوا إِنِّي سِرْقِي فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ

অর্থঃ তারা বললো, সে যদি চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও তো এর আগে চুরি করেছিল। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৭)

এভাবে ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা স্বয়ং ইউসুফ আ. এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করলো! এতে ইউসুফ আ. এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। সেই ঘটনা হচ্ছে, এখানে বিনয়ামীনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যেভাবে কৌশল করা হয়েছে, তখনও হুবহু এমনিভাবে ইউসুফ আ. এর বিরুদ্ধেও তার অজান্তে চুরির অপবাদ দিয়ে চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই ভাইয়েরা ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত



অভিযোগের ব্যাপারে ইউসুফ আ. সম্পূর্ণ নির্দোষ। বরং যারা অপবাদ দিয়েছে, তারাই কুচক্রী। কিন্তু এখন বিনয়ামীনের প্রতি আক্রোশের বসে সেই ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে ইউসুফ আ. কে তাতে অভিযুক্ত করে দিল।

সেই চুরির অপবাদের ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়াযাত রয়েছে। ইমাম ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদ রহ. এর বরাত নিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইউসুফ আ. এর জন্মের পর কিছু কালের মধ্যেই বিনয়ামীন জন্মগ্রহণ করে। তাকে প্রসবের পর তাদের জননীর মৃত্যু হয়। তাতে ইউসুফ ও বিনয়ামীন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়েন। তখন তাদের লালন-পালন ফুফুর কোলে সম্পন্ন হতে থাকে।

আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইউসুফ আ. কে শিশুকাল থেকেই এমন অপরূপ সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাঁকে যে-ই দেখত, সে-ই তাঁর সীমাহীন স্নেহ-মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেত। ফুফুর অবস্থাও ছিল তা-ই। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না।

এদিকে পিতা ইয়াকুব আ. এর অবস্থাও এর চাইতে কম ছিল না। কিন্তু ছোট শিশু হওয়ার কারণে কোনো মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকা জরুরী। বিধায় তাঁকে ফুফুর হাতে সমর্পণ করে দেন।

অতঃপর ইউসুফ আ. যখন চলাফেরার বয়সে পৌঁছলেন, তখন পিতা ইয়াকুব আ. তাঁকে নিজের কাছেই রাখতে চাইলেন। ফুফুকে একথা জানালে প্রথমে তিনি আপত্তি করলেন। অতঃপর অধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইউসুফ আ. তাঁর পিতার হাতে সমর্পণ করলেন।



কিন্তু বাহ্যত তাকে দিলেও মন থেকে তাকে দূরে রাখতে পারছিলেন না। তাই কোনো কৌশলে তাকে ফেরত নেওয়ার জন্য গোপনে একটি ফন্দি আঁটলেন। ফুফু স্বীয় পিতা হযরত ইসহাক আ. এর কাছ থেকে একটি হার পেয়েছিলেন। এটি অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। ফুফু এই হারটিই এক সময়ে চুপিসারে ইউসুফ আ. এর জামার নীচে কোমরে বেঁধে দিলেন। কিছু সময় পরে হযরত ইউসুফ আ. গেলে, ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার হারটি চুরি হয়ে গেছে। তখন তল্লাশী করার পর ইউসুফ আ. এর কাছ থেকে তা বের হলো। তাতে ইয়াকুবী শরী‘আতের বিধান অনুযায়ী, ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে নিজের নিকট রাখার অধিকার পেলেন।

ইয়াকুব আ. যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, তখন তিনি দ্বিরাঙ্কিত না করে ইউসুফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ইয়াকুব আ. ইউসুফ আ. কে ততদিন ফুফুর কাছে রেখেছিলেন। ফুফুর মৃত্যুর পর ইউসুফ আ. কে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

এ ছিল সেই ঘটনা, যাতে ইউসুফ আ. মিথ্যা চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর বিভিন্ন ঘটনায় সবার কাছেই এ সত্য দিবাালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইউসুফ আ. তো চুরি করেনই নি, এমনকি তাঁর চরিত্র এমন নিষ্কলুষ যে, সে ধরনের কোনো সন্দেহ থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন। বরং ফুফুর আদরই তাঁকে ঘিরে এ চক্রান্তজাল সৃষ্টি করেছিল।

এ সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। তাই ইউসুফ আ. কে কোনো চুরির ঘটনার সাথে জড়িত করা তাদের পক্ষে কিছুতেই উচিত ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে তাদের বৈরিভাব অদ্যাবধি বিরাজমান ছিল।

সেই সাথে তাঁর সহোদর ভাইয়ের (কল্পিত) চুরির ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যার কারণে ইউসুফ আ. এর প্রতি চুরির অপবাদ তাদের মুখ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল।

ইউসুফ আ. ভাইদের কথা শুনে তা মনে মনেই রাখলেন। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে,

فَاسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ

অর্থঃ ইউসুফ আ. (তা শুনেও) প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলেন এবং তাদের কাছে ব্যক্ত করলেন না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৭)

তবে তখন তিনি মনে মনে এ কথা বললেন,

قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ

অর্থঃ তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ। অবশ্যই আল্লাহ খুব অবগত রয়েছেন সে ব্যাপারে, যা তোমরা বর্ণনা করো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৭)

দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়। প্রথম প্রশ্ন হয় এই যে, ইউসুফ আ. বিনয়ামীনকে আটকানোর জন্য এ কৌশল কেন করলেন? অথচ তিনি জানতেন যে, এক তো স্বয়ং তাঁর বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্য অসহনীয় ছিল। এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে রাখলে তার বিচ্ছেদে পিতা আরো শোকাবুত হয়ে যাবেন। সুতরাং তিনি তা কীরূপে বিবেচনা করলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ, তা এই যে, নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা হলো এবং তা প্রমাণে গোপনে

বিনয়ামীনের আসবাবপত্রের মধ্যে বিশেষ পাত্র রেখে দেওয়া হলো, আর প্রকাশ্যে তাদেরকে চোর বলে লাঞ্ছিত করা হলো। অথচ সন্দেহ নেই যে, এসব কাজ সম্পূর্ণ অবৈধ। সুতরাং আল্লাহর পয়গাম্বর ইউসুফ আ. এগুলো কিভাবে করলেন?

এর জবাব আল্লামা কুরতুবী রহ. সহ কোনো কোনো মুফাসসীর এটা বর্ণনা করেছেন যে, বিনয়ামীন যখন ইউসুফ আ. কে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে, তাকে যেন অন্য ভাইদের সাথে ফেরত পাঠানো না হয়; বরং তাঁর কাছে যেন রাখা হয়। তখন হযরত ইউসুফ আ. প্রথমে এ অজুহাত পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করে আটকে রাখা। কিন্তু বিনয়ামীন সেই ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ ধরনের অবস্থাকেও গ্রহণ করে নিল।

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকষ্ট, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর বলা শুধু বিনয়ামীনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না।

তাই কেউ কেউ এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, ঘোষক বোধ হয় ইউসুফ আ. এর অজ্ঞাতসারে এবং তাঁর বিনা অনুমতিতে ভাইদেরকে চোর বলেছিল। কিন্তু এ অভিমত যেমন প্রমাণহীন তেমনি ঘটনার সাথে অসংলগ্ন।

আবার কেউ কেউ কারণ বর্ণনা করে বলেন যে, ভাইয়েরা ইউসুফ আ. কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়।

অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তা-ই যা আল্লামা কুরতুবী, মাযহরী প্রমুখ তাফসীরকারগণ জোরালোভাবে দিয়েছেন। তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে, তা বিনয়ামীনের ইচ্ছার ফলশ্রুতি ছিল না এবং ইউসুফ আ. এর প্রয়াসের ফলও ছিল না; বরং এসব ছিল মহান আল্লাহর নির্দেশে তারই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ। এসব কাজের মাধ্যমে ইয়াকুব আ. এর পরীক্ষায় বিভিন্ন স্তর পূর্ণতা লাভ করছিল। এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে,

كَذَلِكَ كِدْنَا يُوسُفَ ۖ

অর্থঃ আমি ইউসুফের খাতিরে এমনভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করে দিয়েছি। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৬)

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা এ কৌশলকে পরিষ্কারভাবে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহর নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে তখন এগুলোকে অবৈধ বলার কোনো অবকাশ নেই। এ পর্যায়ে এগুলোকে হযরত মূসা আ. এর সামনে হযরত খিজির আ. কর্তৃক নৌকা ভাঙা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতোই শুধু আল্লাহর কাজ ছিল বলেই মূসা আ. সব কাজ আল্লাহর নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার আওতায় করে যাচ্ছিলেন। তদ্রূপ এগুলোও প্রকৃতপক্ষে ইউসুফ আ. এর জন্য গুনাহের কাজ ছিল না। বরং মহান আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন ছিল। হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা একটি নিদর্শন।

বিনয়ামীন এর মুক্তির ব্যাপারে বাদশাহর দরবারে আবেদন
ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা যখন দেখলো যে মুক্তির কোনো উপায়-
ই নেই এবং বিনয়ামীনকে বাদশাহ রেখে দিতেই মনস্থ করেছেন,

তখন অন্যভাবে তারা বিনয়ামীনকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো। তারা বাদশাহর দরবারে আবেদন জানিয়ে বললো,

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

অর্থঃ হে আযীয! তার পিতা খুব বয়োবৃদ্ধ। (তিনি এ ছেলেকে খুব আদর করেন) সুতরাং আপনি তাকে ছেড়ে দিয়ে তার বদলে আমাদের একজনকে রেখে দিন। আমরা তো আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন জ্ঞান করছি। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৮)

ভাইদের আবেদন শুনে ইউসুফ আ. তাদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন,

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ۝

অর্থঃ আল্লাহর পানাহ চাই যে, যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে গ্রেফতার করবো। তাহলে তো আমরা জালিম বলেই গণ্য হবো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৯)

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা যখন বিনয়ামীনের মুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা পরস্পর পরামর্শ করার জন্য একটি পৃথক জায়গায় একত্র হলো। আলোচনার এক পর্যায়ে তাদের বড় ভাই বললো,

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوَثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّظْتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ

فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِلِ آبَائِ أَوْ يُحْكَمَ اللَّهُ بِهِ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

অর্থঃ তোমাদের কি মনে নেই যে, তোমাদের কাছ থেকে বিনয়ামীনকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? আর তোমরা তো এর আগেও ইউসুফের ক্ষেত্রে

একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। সুতরাং আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করবো না যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ তা‘আলা আমার জন্য কোনো ফয়সালা প্রদান করেন। তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮০)

এরপর বড় ভাই বললেন,

إِزْجِعُوا إِلَىٰ أَيْكُمُ فَقُولُوا لِيَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقٌ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۝

অর্থঃ তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং গিয়ে তাকে বলো যে, হে আব্বাজান! আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি, তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা। আর অদৃষ্ট সম্বন্ধে তো আমরা জ্ঞাত ছিলাম না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮১)

আলোচ্য আয়াতে “আর অদৃষ্ট সম্বন্ধে তো আমরা জ্ঞাত ছিলাম না” বাক্যের মর্মার্থ হলো, আমরা আপনার অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বিনয়ামীনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। কিন্তু আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থার বিচার। অদৃষ্টের খবর তো আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব।

আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, আমরা ভাই বিনয়ামীনের যথাসাধ্য হিফায়ত করেছি, যাতে সে কোনোভাবে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালেও অজান্তে সে এমন কাজ করবে এবং আটক হবে, তা আমাদের জানা ছিল না।

কথামতো ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা সেভাবেই পিতাকে গিয়ে বলল। তদুপরি যেহেতু তারা এর আগে পিতাকে একবার ধোঁকা

দিয়েছিল, ফলে তারা জানত যে তাদের এ কথায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবে না এবং তাই তারা তাদের কথাকে জোরালো করার জন্য বললো,

وَسَأَلَ الْقُرَيْةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِمِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ

অর্থঃ আপনি জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের বাসিন্দাদেরকে, যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের কাছে আমরা এসেছি। নিশ্চিতই আমরা সত্যবাদী। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮২)

এর আগে যেহেতু ইউসুফ আ. এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল, তাই এবারও ইয়াকুব আ. তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারলেন না যদিও এবার তারা তাদের জানা অনুযায়ী বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এক্ষেত্রে ইয়াকুব আ. ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা ইউসুফ আ. এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন,

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَبِيلٌ

অর্থঃ কিছুই না, বরং তোমরা মনগড়া একটি কথা সাজিয়ে নিয়ে এসেছ। এখন পূর্ণ ধৈর্যধারণই উত্তম। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৩)

এ ঘটনায় ইউসুফ আ. এর ভাইয়ের সত্য কথা বলা সত্ত্বেও হযরত ইয়াকুব আ. আগের ন্যায় মন্তব্য করলেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, কোনো নবী-রাসূলগণ গায়েব জানেন না।

উল্লিখিত বাক্যটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, মনগড়া কথা বলে ইয়াকুব আ. ঐ কথা বুঝিয়েছেন যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে

বিনয়ামীনকে গ্রেফতার করে নেওয়া হয়েছিল। আর তোমাদের পক্ষ থেকে সেই চুরির সমর্থন যোগান হয়েছিল, যা ছিল মিথ্যা। অবশ্য এক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের বিনিময়ে ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকারে পাওয়ার ব্যাপারে ইয়াকুব আ. আশান্বিত হলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে,

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا

অর্থঃ (ইয়াকুব আ. বললেন) আশা করা যায় যে, সম্ভবত শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দেবেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৩)

সন্তানের বিরহে ইয়াকুব আ. দুঃখ ও অশ্রু বিসর্জন
অতঃপর দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকুব আ. এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যলাপ ত্যাগ করে মহান পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন। আর আগের স্মৃতিচারণ করে ইউসুফ আ. এর জন্য दिलের ব্যাকুলতা প্রকাশ করে বললেন,

يَاسْفَى عَلَى يُوسُفَ

অর্থঃ হায় আফসোস! ইউসুফের জন্য।

এভাবে দুঃখে ও অশ্রু বিসর্জনে তাঁর চক্ষু বিবর্ণ হয়ে গেল। নিম্নোক্ত আয়াতে তা ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

অর্থঃ আর দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৪)

তার চোখ সাদা বর্ণ ধারণ করার অর্থ হচ্ছে তাঁর দৃষ্টিশক্তি
লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল।

তাহসীরবিদ মুকাতিল রহ. বলেন, ইয়াকুব আ. এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টি প্রায় লোপ পেয়েছিল।

فَهُوَ كَظِيمٌ

অর্থঃ “তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।”

অর্থাৎ কারো কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না।

كُظِمُ শব্দটি کظم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ, বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষদে তাঁর মন নির্মোহ হয়ে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারও কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না।

ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা ও ইউসুফের জন্য আকুতি
দেখে বলতে লাগলো,

تَاللّٰهِ تَفْتَوُا۟ اَ تَذْكُرُ يُوۡسُفَ حَتّٰى تَكُوۡنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوۡنَ مِنَ الْهٰلِكِيۡنَ ۝

অর্থঃ আল্লাহর কসম, আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে
নিবৃত্ত হবেন না, যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা
নিঃশেষ না হন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৮৫)

ইয়াকুব আ. ছেলেদের কথা শুনে বললেন,

إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

অর্থঃ আমি তো আমার দুঃখ ও বেদনা আল্লাহ তা'আলার সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর তরফ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৮৬)

মহান আল্লাহর তরফ থেকে নিশ্চয়ই ইয়াকুব আ. ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, “আমি আল্লাহর তরফ থেকে যা জানি, তোমরা তা জানো না।”

এরপর সেই সূত্রেই হযরত ইয়াকুব আ. ছেলেদের বললেন,
 يٰبَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَآئِسُ
 مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ০

অর্থঃ বৎসরা! যাও ইউসুফ ও তাঁর ভাইকে খোঁজ করো এবং আল্লাহ তা‘আলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত থেকে কাফের গোষ্ঠী ছাড়া অন্য কেউ নিরাশ হয় না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৭)

ইয়াকুব আ. এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ করো এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। এর আগে কখনো তিনি এমন আদেশ দেননি। এটা তাকদীরেরই ব্যাপার। এর আগে তাদেরকে পাওয়ার কোনো আভাস তিনি পান নি। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার পর তিনি সেই নির্দেশ দিলেন।

এক্ষেত্রে বিনয়ামীনকে পাওয়ার স্থান তো নির্দিষ্টই ছিল। তা ছিল মিসর, যেখানে তাকে আটক রাখা হয়েছে। সেই সাথে ইউসুফ আ. কেও খোঁজার সিদ্ধান্ত হলো। ওদিকে পরিবারের জন্য খাদ্য আনারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই সব উদ্দেশ্য মিলিয়ে ইয়াকুব আ. ছেলেদেরকে পুনরায় মিসরে পাঠালেন।



কেউ কেউ বলেন, আযীযে মিসর কর্তৃক ছেলেদের রসদপত্রের মধ্যে পণ্যমূল্য ফেরত দেওয়ার ঘটনা থেকে ইয়াকুব আ. প্রথমবার আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এই আযীযে মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি। বিচিত্র নয় যে, তিনিই হয়তো তাঁর হারানো ইউসুফ। দ্বিতীয়ত বিনয়ামনীকে তাঁর রেখে দেওয়ার দ্বারা এ সম্ভাবনা প্রবল হলো।

ইউসুফ আ. ভাইয়েরা যখন পিতার নির্দেশ মুতাবিক মিসরে পৌঁছল এবং আযীযে মিসরের সাথে সাক্ষাত করলো, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করলো এবং নিজের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বললো,

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجِيَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝

অর্থঃ হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিজনবর্গ নিদারুণ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অতি নগণ্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। এমতাবস্থায় আমরা অনুরোধ করছি আপনি আমাদের রসদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা দানকারীদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৮)

এখানে بِبِضَاعَةٍ مُّزْجِيَةٍ “অতি নগণ্য পুঁজি”কে আরেক অর্থে কেউ কেউ “অচল পুঁজি” বলেছেন। অকেজো বস্তুগুলো কি ছিল, কুরআন ও হাদীসে তার কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তবে এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রকম। কেউ বলেন, এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্যমুদ্রা, যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন, ঘরে ব্যবহারযোগ্য কিছু মামুলি আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে مُّزْجِيَةٍ শব্দের ব্যাখ্যা। এর



আসল অর্থ, এমন বস্তু যা নিজে সচল নয়, বরং জোরজবরদস্তি করে সচল করা হয়।

ইউসুফ আ. ভাইদের এহেন মিসকীনসুলভ কথাবার্তা শুনে এবং দুরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ আ. এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধিনিষেধ ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল।

আযীযে মিসরের নামে হযরত ইয়াকুব আ. এর পত্র তাফসীরে কুরতুবী ও তাফসীরে মাযহারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর রিওয়ায়েতে এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় হযরত ইয়াকুব আ. আযীযে মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পত্রটির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ,

“ইয়াকুব সফিউল্লাহ ইবনে ইসহাক যাবীহুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পক্ষ থেকে আযীযে মিসর সমীপে আরজ,

বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পারবারিক ঐতিহ্যের অংশবিশেষ। নমরুদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা ইসহাকেরও কঠোর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তার বিরহ ব্যথায় আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছে।



তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যাথিতের সান্তনার একমাত্র সম্বল, যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গাম্বরগণের সন্তানসন্ততি, আমরা কখনো চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। ওয়াসসালাম।”

পত্র পাঠ করে হযরত ইউসুফ আ. কেঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে পারলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ইউসুফ আ. নিজ ভাইদের প্রশ্ন করলেন,

هَلْ عَلَيْكُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُّوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جُهْلُونَ ۝

অর্থঃ তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছিলে যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞতার মধ্যে? (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৯)

এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ আ. এর ভাইদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আযীযে মিসরের কি সম্পর্ক। অতঃপর তারা এ বিষয়টিও ভেবে দেখলো যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কোনো এক সময় ইউসুফ অনেক উচ্চ মর্তবায় পৌঁছাবে এবং তার সামনে আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব, এ আযীযে মিসরই কি স্বয়ং ইউসুফ। এরপর আরও চিন্তাভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দিয়ে তারা ইউসুফকে চিনে ফেললো এবং বিস্তারিত তথ্য জানার জন্যে জিজ্ঞেস করলো, “সত্যি কি আপনি ইউসুফ।”

জওয়াবে ইউসুফ আ. বললেন, “হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯০)

ভাইয়ের প্রসঙ্গটি এজন্যে জুড়ে দিলেন, যাতে করে তাদের লক্ষ্য অর্জনের পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দুজনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল, তারা উভয়েই এক জায়াগায় বিদ্যমান হয়েছে।

এরপর ইউসুফ আ. আরো বললেন, “আল্লাহ তা‘আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবার করে আল্লাহ পাক এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯১)

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ আ. এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া ইউসুফ আ. এর ভাইদের উপায় ছিল না। তাই তারা সবাই একযোগে বলে উঠলো, “আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে তিনি আপনাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং অবশ্যই আমরা ছিলাম অপরাধী।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯২)

ভাইদের কথার উত্তরে ইউসুফ আ. পয়গাম্বরসুলভ গান্ধীর্যের সাথে বললেন, “আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯২)

অর্থাৎ তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের কথা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমি কোনো অভিযোগ উত্থাপন করবো না।

এ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর তিনি ভাইদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার কাছে ক্ষমার দু‘আ করে বললেন, “আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের (অন্যায়) ক্ষমা

করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান।”
(সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯২)

এরপর ইয়াকুব আ. এর ব্যাপারে মনোনিবেশ করে তিনি বললেন, “তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার আন্ধার চেহারার উপর রেখে দিও, এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৩)

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, তাঁর ভাইদের মধ্যে ইয়াহুদা বললো, এই জামা আমি নিয়ে যাব। কারণ, তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এখন এর ক্ষতিপূরণ আমার হাতেই হওয়া উচিত।

ইউসুফ আ. এর ভাইদের কাফেলা মিশর শহর থেকে বের হতেই ওদিকে কেনানে ইয়াকুব আ., নিকটে উপস্থিত লোকদেরকে বলতে লাগলেন, “যদি তোমরা আমাকে প্রলাপোক্তিকারী মনে না করো, তবে শোনো, আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের দ্বাণ পাচ্ছি।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা অনুযায়ী মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত আট দিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরী রহ. এর বর্ণনা মতে, আশি ফারসাখ অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ তা‘আলা এত দূর থেকে ইউসুফ আ. এর জামার মাধ্যমে তার গন্ধ ইয়াকুব আ. এর মস্তিষ্কে পৌঁছে দেন। এটা অত্যাশ্চর্য



ব্যাপার বটে। অথচ ইউসুফ আ. যখন কেনানেরই এক কূপের ভিতরে তিন দিন পড়ে রইলেন, তখন ইয়াকুব আ. এ গন্ধ অনুভব করেননি। এ থেকেই বুঝা যায় যে, এটা পয়গাম্বরগণের নিজস্ব কর্মকান্ড নয়, বরং সরাসরি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তা তার নির্দিষ্ট সময়েই আসে।

ইয়াকুব আ. এর কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা বললো, “আল্লাহর কসম, আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৫)

ভাইয়েরা কেনানে পৌঁছে যখন স্থায়ী পিতার কাছে ইউসুফ ও বিনয়ামীনকে পাওয়ার সুসংবাদ দিলো এবং ইউসুফ আ. এর জামা ইয়াকুব আ. এর চেহারা মুবারকে রাখলো, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। এ সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা।

এরপর ইয়াকুব আ. বললেন, আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি যা তোমরা জানো না? অর্থাৎ ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে আমি মিলিত হবো। এ আভাস আমি আগেই ওহীর মাধ্যমে পেয়েছি।

নিম্নোল্লিখিত আয়াতে এ কথাটিই ব্যক্ত করা হয়েছে,
 فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
 مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

অর্থঃ অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা এলো, তখন সেই জামাটি তাঁর চেহারায় রাখলো। অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে

পেলেন। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না? (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৬)

বাস্তব ঘটনা যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা স্বীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললো, “হে আব্বাজান! আমাদের জন্য ক্ষমার দু‘আ করুন। আমরা নিশ্চিত অপরাধী ছিলাম।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৭)

ছেলেদের আবেদনের জওয়াবে হযরত ইয়াকুব আ. বললেন, “আমি অতি সত্বর তোমাদের জন্য আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৭)

হযরত ইয়াকুব আ. এখানে তৎক্ষণাৎ দু‘আ করার পরিবর্তে অতিসত্বরই দু‘আ করার ওয়াদা করেছেন। তাফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল, বিশেষ গুরুত্ব-সহকারে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পর দু‘আ করবেন। কেননা, তখনকার দু‘আ বিশেষভাবে কবুল হয়।

কোনো কোনো রিওয়ায়েতে আছে যে, ইউসুফ আ. ভাইদের সাথে দুইশত উটনী বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্যে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে।

হযরত ইয়াকুব আ. স্বপরিবারে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

হযরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে পিতা হযরত ইয়াকুব আ. ছেলেদেরকে ও পরিবারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সকলকে নিয়ে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এক রিওয়াযাত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল বাহাত্তর জন। আরেক রিওয়াযাত অনুযায়ী তিরানব্বইজন পুরুষ ও মহিলা ছিলেন।

ইয়াকুব আ. মিসরে পৌঁছার নিকটবর্তী হলে, ইউসুফ আ. ও মিসরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের অভ্যর্থনার জন্য বাইরে গমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহি ও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে জমায়েত হলো।

হযরত ইয়াকুব আ. সকলকে নিয়ে মিসরের উপকণ্ঠে পৌঁছলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর পর ইউসুফ আ. বাবা-মাকে একান্ত করে নিলেন এবং সবাইকে বললেন, আপনারা আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে নিশ্চিত মনে মিসরে প্রবেশ করুন। অর্থাৎ ভিনদেশীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে স্বভাবত যেসব বিধি-নিষেধ থাকে, সেগুলো থেকে তাদেরকে মুক্ত ঘোষণা করলেন।

কুরআন মাজীদে নিম্নোল্লিখিত আয়াতে একথা বিবৃত হয়েছে,

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ ۝

অর্থঃ তারা যখন ইউসুফ আ. এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ চাহেন তো আপনারা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৯)



ইউসুফ আ. এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন

অতঃপর হযরত ইউসুফ আ. পিতা-মাতাকে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসালেন। এ সময় পিতা-মাতা ও ভাইয়েরা সবাই ইউসুফ আ. এর সামনে সিজদা করলেন। তখন ইউসুফ আ. ইয়াকুব আ. কে বললেন, আব্বাজান! এটাই আমার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমি দেখেছিলাম যে, এগারেটি তারা এবং সূর্য চন্দ্র আমার জন্য সিজদা করছে। পবিত্র কুরআনে এ সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে,

وَرَفَعَ أَبُوتِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ
قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا

অর্থঃ এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন। তখন সবাই তার সামনে সিজদাবনত হলেন। ইউসুফ আ. বললেন, হে আমার আব্বাজান! এ হলো আমাদের আগেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার পালনকর্তা তাকে সত্যে পরিণত করেছেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০০)

উপরোল্লিখিত আয়াতে **رُبِّي** বলে পিতা-মাতা উভয়জনের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইউসুফ আ. এর মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তিকাল করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তারপর ইয়াকুব আ. ইউসুফ এর মাতার বোন লায়্যাকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি ইউসুফ আ. এর খালা হওয়ার দিক দিয়ে মায়ের মতোই ছিলেন, আবার পিতার বিবাহিত স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতাই ছিলেন। তাই আয়াতে তাদেরকে **رُبِّي** (মা-বাবা) বলা হয়েছে।

وَحُرُّوْا لَهُ سَجْدًا “সবাই হযরত ইউসুফ আ. এর সামনে সিজদা করলেন” আয়াতে বর্ণিত উক্ত সিজদা সম্পর্কে রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এ সিজদাটি ছিল কৃতজ্ঞতাসূচক। আর এটা ইউসুফ আ. এর জন্য নয়, বরং আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেন, উপাসনামূলক সিজদা প্রত্যেক পয়গাম্বরের শরী‘আতেই আল্লাহ ছাড়া কারো জন্যেই বৈধ ছিল না। কিন্তু তা‘জীমী বা সম্মানসূচক সিজদা পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের শরী‘আতে বৈধ ছিল। সেই হিসেবে এটা তাঁর জন্য সম্মানসূচক সিজদাও হতে পারে। তবে শিরকের সিঁড়ি হওয়ার কারণে ইসলামী শরী‘আতে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এরপর ইউসুফ আ. পিতা-মাতার সামনে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

এখানে এটা অনুধাবনযোগ্য যে, যতটুকু দুঃখ-কষ্ট হযরত ইউসুফ আ. এর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, ততটুকু দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন যদি কেউ হয় এবং লম্বাদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের পর পিতা-মাতার সাথে মিলন ঘটে, তাহলে সে পিতা-মাতার সামনে নিজের কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করবে, আর কতটুকু কাঁদবে এবং কাঁদাবে তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু এখানে উভয়পক্ষই হচ্ছেন আল্লাহ পাকের পয়গাম্বর ও রাসূল। তাঁদের কার্যপদ্ধতি অনুপম আদর্শে ভাস্বর। তাই তো

ইয়াকুব আ. এর লম্বা বিরহী প্রিয় ছেলে হাজারো দুঃখ-কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন পিতার সাথে মিলিত হলেন, তখন তিনি বললেন, “আল্লাহ তা‘আলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদের সবাইকে গ্রাম থেকে মিসরে নিয়ে এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেওয়ার পরেও।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০০)

হযরত ইউসুফ আ. এর দুঃখ-কষ্ট যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল:

এক. ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন এর দুঃখ-কষ্ট।

দুই. পিতা-মাতার কাছ থেকে লম্বাদিনের বিচ্ছেদ এর দুঃখ-কষ্ট।

তিন. কারাগারের কষ্ট।

আল্লাহ তা‘আলার এ বিশিষ্ট পয়গাম্বর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার প্রসঙ্গ থেকে কথা শুরু করেছেন।

কিন্তু এতেও কারাগারে প্রবেশ করা এবং সেখানকার কষ্ট ক্লেশের বর্ণনা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। বরং জেলখানা থেকে অব্যাহতির কথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসহ বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা অনায়াসে ফুটে উঠেছে যে, তিনি কারাগারে ছিলেন এবং মুক্তি পেয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছেন।

এখানে এ বিষয়টিও প্রাধান্যযোগ্য যে, ইউসুফ আ. কারাগার থেকে বের হওয়ার কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভাইয়েরা যে তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তা এদিক



দিয়েও উল্লেখ করেননি যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে ঐ কূপ থেকে বের করেছেন। কেননা, ভাইদের অপরাধ তো আগেই মাফ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, “আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।” তাই কোনোভাবে কূপের কথা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেওয়া সমীচীন মনে করেননি।

এরপর ছিল পিতা-মাতা থেকে সুলস্বা বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়ায় বর্ণনা করার বিষয়। তিনি এসব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি ও পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতের কথা আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ পাক আপনাদেরকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে দিয়েছেন।

এখানে এই নি‘আমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইয়াকুব আ. এর বাসভূমি ছিল গ্রামে, সেখানে জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা কম ছিল। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁকে শহরে রাজকীয় সম্মানের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন।

এখন শুধু প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট রইলো অর্থাৎ ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন প্রসঙ্গ। একেও শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, আমার ভাইয়েরা এরূপ ছিল না, কিন্তু মালা‘উন শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে কলহ সৃষ্টির এ কাজটি করিয়েছে।

নবুওয়্যাতের শান

এ হচ্ছে নবুওয়্যাতের শান! নবীগণ দুঃখ-কষ্টে শুধু সবরই করেন না, বরং সর্বক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিক প্রতিফলিত করেন। এজন্যই তাদের এমন কোনো অবস্থা

নেই, যেখানে তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি শোকরগুয়ার নন। অথচ সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা এর বিপরীত হয়। তারা আল্লাহ তা‘আলার নি‘আমতরাজি পেয়েও সেই নিয়ামতের কথা উল্লেখ করতে চায় না, কিন্তু কোনো সময় সামান্য কষ্ট পেলে, জীবনভর তা গেয়ে বেড়ায়। কুরআন পাকে এ বিষয়ের প্রতি অভিযোগ করে বলা হয়েছে,

“নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।” (সূরা আদিয়াত, আয়াত: ৬)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, “আমার খুব কম সংখ্যক বান্দাই আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে।”

অতঃপর পিতা-মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন ইউসুফ আ. এর জীবনে শান্তি এলো, তখন তিনি সরাসরি আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দু‘আয় মশগুল হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, “নিশ্চয় আমার রব যা চান, তা নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। হে পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের তা‘বীর শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! আপনিই আমার অভিভাবক ইহকাল ও পরকালে। আপনি আমাকে মুসলিমরূপে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে বিশিষ্ট নেককার বান্দাদের মধ্যে शामिल করুন।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০০-১০১)

হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনায় একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে তাঁর পিতা আল্লাহর নবী ইয়াকুব আ. তাঁর বিরহ ব্যথায় অশ্রু বিসর্জন করতে করতে অন্ধ



হয়ে গেলেন এবং অপরদিকে ইউসুফ আ. স্বয়ং নবী ও রাসূল পিতার প্রতি স্বভাবগত মুহাব্বত ও ভালোবাসা ছাড়া তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু লম্বা চল্লিশ বৎসর সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও পেরেশান পিতাকে কোনো উপায় স্বীয় কুশল-সংবাদ পৌঁছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ তখনও অসম্ভব কোনো বিষয় ছিল না, যখন তিনি গোলাম হয়ে মিসরে পৌঁছলেন। আযীযে মিসরের ঘরে তাঁর সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারো মাধ্যমে পত্র অথবা খবর পৌঁছিয়ে দেয়া তার পক্ষে তেমন কঠিন কোনো ব্যাপার ছিল না। এমনভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক-সেদিক পৌঁছানো যায়, তা সবারই জানা। তারপর বিশেষ করে আল্লাহ তা‘আলা যখন তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে আসে, তখনও নিজে গিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হওয়াটাই তাঁর সর্বপ্রথম কাজ ছিল। এটা কোনো কারণে সমীচীন না হলে, কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেওয়া তো ছিল তাঁর জন্যে নেহায়েত মামুলি ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহর পয়গাম্বর ইউসুফ আ. এরূপ ইচ্ছা করেছিলেন বলেও কোথাও বর্ণিত নেই। নিজে ইচ্ছা করা তো দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য ভাইয়েরা প্রথমবার আগমন করলো, তখনও আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন। অতঃপর তারা দ্বিতীয়বার

আগমন করলে, তখনও আসল ঘটনা বর্ণনা না করে উল্টো বিনয়ামীনকে আটকে রাখলেন।

এমতাবস্থায় কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। অথচ আল্লাহ তা‘আলার মনোনীত পয়গাম্বর হয়ে তিনি তা কীরূপে বরদাশত করলেন?

এর জবাব হচ্ছে, ঘটনার পরস্পরায় একথা স্বাভাবিকভাবেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ পাক বিশেষ হিকমত ও রহস্যের অধীনে হযরত ইউসুফ আ. কে এসব প্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। তাফসীরে কুরতুবীতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে যে, আল্লাহ তা‘আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ আ. কে নিজের সম্পর্কে কোনো সংবাদ ঘরে প্রেরণ নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

বিশ্ব পালনকর্তার প্রকৃত রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা উপলব্ধি করা অসম্ভব। তবে মাঝে মাঝে কোনো বিষয় কারো বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যত ইয়াকুব আ. এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এজন্যই ঘটনার শুরুতে যখন ইয়াকুব আ. বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসুফ আ. কে বাঘে খায়নি, বরং এটা তার ভাইদের কারসাজি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌঁছে সরেযমীনে তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য ছিল কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর দিলকে এদিকে যেতে দেননি। অতঃপর হঠাৎ করে লম্বাদিন পর তিনি নিজ ছেলদেরকে বললেন, “তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ করো। বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে

দেন। সুতরাং ঘটনার পূর্বাপর সবই মহান আল্লাহর হুকুমে তাঁরই কুদরতের রহস্য বাস্তবায়নের জন্য হয়েছে বলে বিশ্বাস করতে হবে।

সূরা ইউসুফের সর্বশেষ আয়াতে আলোচিত কাহিনী সম্পর্কে পরিশিষ্টরূপে ইরশাদ হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا هَادِينَ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ
الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

অর্থঃ তাদের (পয়গাম্বরগণের) কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশের উপাদান রয়েছে। এ কুরআন কোনো মনগড়া কথা নয়, বরং তা আগেকার গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সব কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত ঈমানদারদের জন্য। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১১১)

উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উল্লিখিত পয়গাম্বরগণের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশের উপাদান রয়েছে। এর দ্বারা সব পয়গাম্বরের কাহিনীও উদ্দেশ্য হতে পারে যা এই সূরায় এ যাবত বর্ণিত হয়েছে।

এখানে উপদেশের উপাদান বিশেষত এই যে, আলোচিত ঘটনায় এ বিষয়টি পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে কীভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন এবং কৃপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে বসান আর অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চ মর্তবার শিখরে কীভাবে পৌঁছে দেন। পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীদেরকে পরিণামে কীরূপ অপমান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন করেন।

উল্লেখিত আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে যে, এ কাহিনীতে কোনো মনগড়া কথা নয়, বরং আগে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের সমর্থনকারী। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, তাওরাত ও ইনজীলেও কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যেমন বর্ণিত হয়েছে কুরআনে। এ সম্পর্কে হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাঈহ রহ. বলেন, “পৃথিবীতে যতগুলো আসমানী কিতাব ও সহীফা নাযিল হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই ইউসুফ আ. এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।” (তাফসীরে মাযহারী)

শাইখ আবু মানসূর রহ. বলেন, সম্পূর্ণ সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাসাল্লী, সান্তনা প্রদান করা যে, কাফিরদের হাতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করেছেন, পূর্ববর্তী নবীগণও আ. তদ্রূপ কষ্ট ভোগ করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক বেদীনদের মুকাবিলায় পয়গাম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটি ও সেরূপই হবে।

আলোচিত কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা ও জীবন কাহিনী থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ হচ্ছেঃ

১. ইউসুফ আ. ভাইয়েরা যখন অশ্রুত অবস্থায় তাঁর জামা পিতার কাছে নিয়ে এসেছিল, তখন হযরত ইয়াকুব আ. ইউসুফ আ. এর জামা অশ্রুত থাকার দিয়ে নিজ ছেলেদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বিচারকের জন্য উচিত উভয় পক্ষের দাবী-দাওয়া ও যুক্তি-

প্রমাণের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আলামতের প্রতিও লক্ষ্য রেখে বিচার করা।

২. যুলাইখা যখন একটি নির্জন কক্ষে ইউসুফ আ. কে স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলাতে শুরু করেছিল, তখন ইউসুফ আ. সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে দৌড়ে বের হয়ে পড়েছিলেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যে স্থানে গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে স্থানকেই পরিত্যাগ করা উচিত। আর এক্ষেত্রে নিজের সম্ভাব্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। যেমনটি হযরত ইউসুফ আ. করেছিলেন।

৩. আল্লাহ তা‘আলার হুকুম-আহকাম পালনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য, যদিও বাহ্যত এর ফলাফল দেখা না যায়। ফলাফল তো আল্লাহর হাতে। বান্দার কাজ হলো, স্বীয় চেষ্টা-সাধনাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে দাসত্বের পরিচয় দেয়া। যেমন, ইউসুফ আ. সব দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এবং ঐতিহাসিক রিওয়াযাত অনুযায়ী তালাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করেছেন। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে গায়েবী সাহায্যের আগমনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়।

বস্তুত বান্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে, তখন আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য সাফল্যের পথ উন্মুক্ত করে দেন। যেমন, হযরত ইউসুফ আ. কে সমস্ত দরজা কুদরতীভাবে খুলে দিয়ে তাকে বের হওয়ার পথ তৈরী করে দিয়েছেন।



৪. কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, ইউসুফ আ. যখন জেলে প্রেরিত হন, তখন আল্লাহর তরফ থেকে ওহী আসে, আপনি নিজেকে জেলে নিষ্ক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন, “হে আমার পালনকর্তা এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে এর চাইতে জেলখানা আমার নিকট অধিক পছন্দ।” তখন আপনি জেলখানা পছন্দ করা ছাড়া অন্য কোনো নিরাপত্তা চাইলে, আপনাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো।

এ থেকে বুঝা গেল যে, কোন বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দু’আর ক্ষেত্রে সেই বিপদের তুলনায় অমুক ছোট বিপদকে আমি ভালো মনে করি, এরূপ বলা সমীচীন নয়। বরং ছোট বড় প্রত্যেক বিপদাপদ ও মুসীবত থেকে আল্লাহ তা’আলার কাছে পরিপূর্ণ মুক্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

৫. আলোচিত কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেলখানায় দু’জন কয়েদী যখন হযরত ইউসুফ আ. এর কাছে স্বপ্নের তা’বীর জিজ্ঞেস করেছিল, তখন তিনি তাদের স্বপ্নের তা’বীর বর্ণনা করার আগে ঈমান আমল ও তাওহীদের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে তাদের কাছে দীনী দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এ থেকে বুঝা গেল যে, কোনো মুসলমানদের কাছে কেউ কোনো বিষয় নিয়ে উপস্থিত হলে এবং সে দীন থেকে গাফিল থাকলে, প্রথমে তার নিকট ঈমান আমল সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে তাকে দীনের দাওয়াত দেয়া কর্তব্য। অতঃপর তার উক্ত বিষয় সমাধা করে দেওয়া উচিত।



৬. হযরত ইউসুফ আ. বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার পর তাকে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ সময় যখন এ জরুরতের তাকাজা এসেছিল যে, এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কীভাবে হবে এবং কে করবে? তখন ইউসুফ আ. উত্তর দিয়েছিলেন, “জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আপনি আমাকে নিযুক্ত করুন।”

আয়াতের এ অংশ থেকে বুঝা যায় যে, যদিও নিজের জন্য কোনো পদ প্রার্থনা করা সাধারণভাবে নিষেধ, কিন্তু যদি কখনো এমন পর্যায়ে আসে যে, তার জানা থাকে যে, সুষ্ঠুভাবে অপর কেউ সেই কাজ আনজাম দিতে পারবে না, সেই অবস্থায় সেই কাজ আনজাম দানের জন্য বা দেশ ও জাতির নিরঙ্কুশ সেবার জন্য নিজেকে পেশ করতে পারে।

তেমনিভাবে কোনো বিশেষ পদ সম্বন্ধে যদি জানা যায় যে, অন্য কোনো ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না এবং নিজে ভালোরূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে এবং তার মধ্যে কোনো গুনাহে লিপ্ত হওয়ারও আশঙ্কা না থাকে, তাহলে দেশ ও জনগণের বৃহৎ কল্যাণের জন্য তার পক্ষে উক্ত পদের প্রার্থী হওয়া জায়েয।

তবে শর্ত এই যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির মোহে নয়, বরং উক্ত পদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের খিদমত ও ইনসারফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং তা সেভাবেই আনজাম দিতে হবে, যেমন, হযরত ইউসুফ আ. এর দিয়ে হয়েছিল। আর



যেখানে এরূপ অবস্থা না হয়, সেক্ষেত্রে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো পদ প্রার্থনা করতে বা প্রার্থী থেকে নিষেধ করেছেন। বরং যদি কেউ কোনো পদের জন্য আবেদন করেছে, তিনি তাকে সেই পদ দেননি।

৭. হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা যদি এমন চরমে পৌঁছে যে, সরকার কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে অনেক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তখন সরকার এ ধরনের দ্রব্যসামগ্রীকে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্যশস্যের উপযুক্ত মূল্যও নির্ধারণ করে দিতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া সরকারের জন্য ঠিক নয়।

অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সিন্ডিকেট করে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে অধিক মুনাফা লুটতে থাকে, সরকার তাকে বা তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করবে এবং বাজারে দ্রব্যের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. ইউসুফ আ. এর ভায়েরা যখন দ্বিতীয়বার মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল, তখন ইয়াকুব আ. তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ করার ব্যাপারে একটি বিশেষ উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর প্রাচীরের কাছে গিয়ে আলাদা হয়ে যেয়ো এবং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো। কারণ এতে কারো কুদৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা আছে। এ দিয়ে জানা গেল যে, বদ নজর লাগা

সত্য ও বাস্তব বিষয়। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার ন্যায় এবং এর প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে তদবীর করার ন্যায় এ বদ নজর থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এর কুপ্রভাব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এর কুপ্রভাব থেকে মুক্তির জন্য তদবীর করারও সমভাবে শরী‘আতসিদ্ধ।

৯. এ থেকে আরও বুঝা গেল যে, যদি কেউ অন্য কারো সম্পর্কে দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার আশঙ্কা পোষণ করে, তবে তাকে সে ব্যাপারে অবহিত করা এবং দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বলে দেওয়া উচিত, যেমন ইয়াকুব আ. তার ছেলেদের অর্থাৎ ইউসুফ আ. ভাইদের ব্যাপারে করেছিলেন।

১০. হযরত ইয়াকুব আ. নিজ ছেলেদেরকে কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার তদবীর বাতলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছিলেন যে, আমি জানি, এ তদবীর আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। হুকুম একমাত্র তাঁরই চলে। তবে মানুষের উপর বাহ্যিক চেষ্টা-তদবীর করার নির্দেশ করি না, বরং একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার উপরই ভরসা করি। অর্থাৎ এ তদবীরের দিয়ে কিছুই হবে না। তবে আল্লাহ যদি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের হিফায়ত করেন, তবেই তোমরা হেফাজতে থাকতে পারবে।

হযরত ইয়াকুব আ. এর এ বক্তব্যে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে, প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহ পাকের উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়াদিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী

বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করবে। ইয়াকুব আ. তা-ই করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শিক্ষাই দিয়েছিলেন।

১১. আলোচিত ঘটনায় হযরত ইয়াকুব আ. এর অবস্থা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানমাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোনো মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট দেখা দিলে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, সবর ইখতিয়ার করে আল্লাহ তা‘আলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং ইয়াকুব আ. ও অন্যান্য পয়গাম্বরের আ. অনুসরণ করা।

১২. আলোচ্য কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ আ. কে যখন তাঁর ভাইয়েরা চিনে ফেললো, তখন তারা অতিরিক্ত কিছু তথ্য জানার জন্য তাকে প্রশ্ন করলো, “সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ?” উত্তরে ইউসুফ আ. বললেন, “হ্যাঁ আমিই ইউসুফ আর এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই।” অতঃপর তিনি আরও বললেন, “আল্লাহ তা‘আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ পাক এমন সৎকর্মীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।” এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো যে, হযরত ইউসুফ আ. হাজারো দুঃখ কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন ভাইদের সাথে পরিচিত হলেন, তখন পূর্ববর্তী কোনো বিপদাপদের কথাই তিনি উল্লেখ করলেন না বরং আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নি‘আমতসমূহের কথাই শুধু স্মরণ করলেন এবং উল্লেখ করলেন।



এ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ যখন কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়, এরপর আল্লাহ পাক যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নি‘আমত দিয়ে ভূষিত করেন, তখন তার উচিত, অতীত বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নি‘আমত ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা। কেননা, বিপদ থেকে মুক্তি ও খোদায়ী নি‘আমত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ-কষ্টের কথা মনে করে হা-হুতাশ করা অকৃতজ্ঞতারই পরিচায়ক। কুরআন মাজীদেদে সূরাহ আদিয়াত এ ধরনের অকৃতজ্ঞতা كُفْرٌ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কানূদ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, নি‘আমত ও অনুগ্রহ স্মরণ না করে শুধু কষ্ট ও বিপদাপদের কথাই স্মরণ করে।

পরিশেষে আমাদের কর্তব্য, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী-রাসূলগণের কাহিনী ও ঘটনা আমাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে আমাদের জীবনের ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়া এবং নবীগণের আদর্শ গ্রহণ করে জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করা। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে নবী-রাসূলগণের ঘটনা আমাদের নিকট এজন্যই উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ রাসূল ‘আলামীন আমাদের সকলকে আলোচিত ঘটনা থেকে শিক্ষা হাসিল করে সর্ব প্রকার চক্রান্ত ও প্রতারণামূলক কার্যকলাপ থেকে দূরে থেকে নবীওয়ালা আদর্শিক চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত

হযরত শু‘আইব ‘আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com



www.islamijindegi.com



সূচীপত্র

শু‘আইব ‘আলাইহিস সালাম এর পরিচয়

হযরত শু‘আইব আ. এর কওমের গুনাহ ও অপরাধ

আপন কওমকে শু‘আইব আ. এর দাওয়াত

শু‘আইব আ. এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান

কওমের বিরুদ্ধাচরণের মোকাবেলা

যেভাবে আযাব এলো

হযরত শু‘আইব আ. এর কওমের ঘটনা থেকে শিক্ষা

শু‘আইব ‘আলাইহিস সালাম এর পরিচয়ঃ

খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০ অব্দে হযরত শু‘আইব আ. জর্ডানের দক্ষিণ দিকে মৃত সাগরের নিকটবর্তী জাযিরাতুল আরবের মাদয়ান জনপদবাসীর প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। যাদেরকে আসহাবে আইকাও বলা হতো। আইকা অর্থ বিশেষ ধরণের গাছ। তারা উক্ত গাছের এলাকায় বসবাস করার কারণে তাদেরকে আসহাবে আইকা বা আইকার অধিবাসী বলা হতো।

ফিরআউনের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য নবুওয়্যাত প্রাপ্তির আগে মূসা আ. মিসর ছেড়ে মাদয়ান গমন করেন। সেখানকার এক বুয়ুর্গ ব্যক্তি হযরত মূসা আ. এর ঘটনা শ্রবণ করে তার কর্মতৎপরতা আর আমানতদারীতে মুগ্ধ হয়ে ৮/১০ বছর বকরী চরানোর শর্তে নিজ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তার সাথে বিবাহ দেন।

এই বুয়ুর্গ কে ছিলেন? সে বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ! প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তিনি ছিলেন মাদয়ানবাসীদের প্রতি প্রেরিত নবী হযরত শু‘আইব আ.। তবে বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এবং আল্লামা তবারী রহ. এর মতে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কথা হলো, পবিত্র কুরআনে করীমে (সূরা কাসাস- ২২- ৩৫) এ ঘটনা বর্ণিত হলেও সেখানে তার নাম উল্লেখ হয়নি। হাদীসের যে রেওয়ায়েতগুলোতে নাম উল্লেখ হয়েছে, তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই আসলে তিনি কে ছিলেন তা‘আল্লাহ তা‘আলাই ভালো জানেন।



আল্লাহ তা‘আলা শু‘আইব আ. কে ভাষার বাগ্মীতা প্রদান করেছিলেন। এ কারণে তাকে খতীবুল আশ্বিয়া বলা হয়।

হযরত শু‘আইব আ. এর কওমের গুনাহ ও অপরাধঃ
হযরত শু‘আইব আ. এর কওম বিভিন্ন ধরনের গুনাহ এবং অপরাধে লিপ্ত ছিলো। যথাঃ

- তারা আল্লাহর ইবাদত করার পরিবর্তে নিজেদের মূর্তিপূজক পূর্বপুরুষদের অনুসরণে মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলো।
- তারা অন্যকে লেনদেনের সময় মাপে কম দিতো।
- তারা পথিকদের পথ আটকে ডাকাতি করতো।

আপন কওমকে শু‘আইব আ. এর দাওয়াতঃ
হযরত শু‘আইব আ. আপন কওমকে বিজ্ঞোচিত ভাষায় দাওয়াত প্রদান করেন। হযরত শু‘আইব আ. তার কওমকে লক্ষ্য করে বলেন,

يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَ الْبَيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ
وَ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝

অর্থঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো!
তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মাবুদ নেই। তোমাদের কাছে
তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে।
সুতরাং মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে ও মানুষের

মালিকানাধীন বস্তুসমূহে তাদের অধিকার খর্ব করবে না। আর দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি বিস্তার করবে না। এটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর পথ, যদি তোমরা (আমার কথা) মেনে নাও। মানুষকে ধমকানোর জন্য এবং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দান ও তাতে বক্রতা সন্ধানের উদ্দেশ্যে পথে-ঘাটে বসে থাকবে না। এবং তোমরা স্মরণ করো ঐ সময়কে যখন তোমরা সংখ্যায় নগন্য ছিলে, আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন, এবং তোমরা লক্ষ করো বিশৃংখলাকারীদের পরিণাম কি হয়েছে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৮৫-৮৬)

শু'আইব আ. এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানঃ

কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, হযরত শু'আইব আ. এর কওম তাঁর এ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের দাস্তিক সর্দারগণ বললো,

لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا^ط

অর্থঃ হে শু'আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, তা না হলে তোমাদের সবাইকে আমাদের দীনে ফিরে আসতে হবে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৮৮)

তারা হযরত শু'আইব আ. এর দাওয়াতকে কেবল প্রত্যাখ্যানই করলো না; বরং সাথে সাথে উপহাস করে বললো,

يُشْعَيْبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتَّكِمَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ^ط



অর্থঃ হে শু‘আইব! তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ করছে যে, আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের ইবাদত করতো, আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করবো এবং নিজেদের অর্থসম্পদে যা ইচ্ছা হয় তা করবো? (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৮৭)

অবাধ্য সম্প্রদায় এখানেই থেমে থাকেনি; বরং তারা একধাপ আগে বেড়ে আগের চেয়ে বেশী ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বললো,

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

অর্থঃ (হে শু‘আইব!) তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের উপর আকাশের একটি খন্ড ফেলে দাও। (সূরা শু‘আরা, আয়াত: ১৮৭)

এমনকি এই হঠকারী সম্প্রদায় হযরত শু‘আইব আ. কে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দিয়ে বললো,

يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِيْنَا ضَعِيفًا ۚ وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝

অর্থঃ হে শু‘আইব! তোমার অনেক কথাই আমাদের বুঝেই আসে না। আমরা দেখছি, আমাদের মধ্যে তুমি একজন দুর্বল লোক। তোমার খান্দান না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে ধ্বংস করতাম। আমাদের বিপরীতে তুমি মোটেও শক্তিমান নও। (সূরা হুদ, আয়াত: ৯১)

কওমের বিরুদ্ধাচরণের মোকাবেলাঃ

কওমের এই বিরুদ্ধাচরণ, উপহাস, ঔদ্ধত্য ও হুমকির জবাবে হযরত শু‘আইব আ. অত্যন্ত জোরালো যুক্তিতে দরদী ভাষায় দাওয়াত প্রদান করেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় মহান আল্লাহ তা‘আলা অত্যন্ত সুন্দর বর্ণনায় উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত নিয়ে উল্লেখ করা হলো।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْنَؤُا الْعِبَادُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

অর্থঃ আর মাদয়ানের কাছে তাদের ভাই শু‘আইবকে (পাঠালাম)। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। সুতরাং মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে ও মানুষের মালিকানাধীন বস্তুসমূহে খর্ব করবে না। আর দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি বিস্তার করবে না। এটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর পথ, যদি তোমরা (আমার কথা) মেনে নাও। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৮৫)

وَيَقَوْمٍ لَا يُجْرِمَتَكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمٍ ضَلُّوا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝

অর্থঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার সাথে যে জিদ দেখাচ্ছ তা যেন তোমাদেরকে এমন পরিণতিতে না পৌঁছায় যে নূহের সম্প্রদায় বা হুদের সম্প্রদায় কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর যেমন মুসিবত অবতীর্ণ হয়েছিল, তোমাদের উপরও সে রকম মুসিবত অবতীর্ণ হয়ে যায়। আর লুতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে বেশী দূরেও নয়। (সূরা হুদ, আয়াত: ৮৯)

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝

অর্থঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তারপর তারই দিকে রুজু হও। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়। (সূরা হুদ, আয়াত: ৯০)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى ۝

অর্থঃ আমি একাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো সেই সত্তা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, যিনি বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন। তোমরা মাপে পুরোপুরি দিও। যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ওজন করো সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। মানুষকে তাদের মালামাল কমিয়ে দিও না এবং যমীনে অশান্তি বিস্তার করে বেরিও না। এবং সেই সত্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকেও। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৮০-১৮৪)

যেভাবে আযাব এলোঃ

হযরত শু‘আইব আ. এর কওমের এই প্রত্যাখ্যান, উপহাস এবং নবীকে হত্যার মনোভাবের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর তিন ধরনের আযাব প্রেরণ করেন। ভূমিকম্প, বিকট আওয়াজ এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসের মেঘ থেকে আগুনবৃষ্টি।

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে কারীমে তিন স্থানে হযরত শু‘আইব আ. এর কওমের উপর আপতিত আযাবের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثِيْنٍ ۝

অর্থঃ অতঃপর তারা ভূমিকম্পে আক্রান্ত হলো এবং তারা নিজেদের বাড়িতে অধঃমুখে পড়ে থাকলো। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৯১)

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا ۙ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۖ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثِيْنٍ ۝ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۖ أَلَا بُعْدًا لِّلْمُذِنِّ ۚ كَمَا بَعْدَتْ ثُؤَدُ ۝

অর্থঃ এবং (পরিশেষে) যখন আমার হুকুম এসে গেলো, আমি শু‘আইবকে এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছিলো তাদেরকে আমার বিশেষ রহমতে রক্ষা করি আর যারা জুলুম করেছিলো তাদেরকে এক প্রচন্ড আযাব এসে পাকড়াও করলো। ফলে তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতে এমনভাবে অধঃমুখে থাকলো, যেন তারা কখনও সেখানে বসবাসই করেনি। স্মরণ রেখ, মাদয়ানেরও সেইভাবে বিনাশ ঘটলো, যেভাবে বিনাশ হয়েছিলো ছামুদ জাতি। (সূরা হুদ, আয়াত: ৯৪)

فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

অর্থঃ মোটকথা, তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। পরিণামে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করলো। নিশ্চয় তা ছিলো এক ভয়ানক শাস্তি। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৮৯)

মুফাসসিরীনে কেরাম এ আয়াতত্রয়ের এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, একটি মেঘখন্ড তাদেরকে ছায়া প্রদান করলে তারা তার আশ্রয়ে গমন করে। কিন্তু মেঘখন্ড থেকে পানি



বৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে আগুনবৃষ্টি হতে লাগলো এবং সাথে সাথে প্রচন্ড এক আওয়াজে তারা সবাই মূহূর্তেই ধ্বংস হয়ে গেলো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩:৪৯২)

হযরত শু‘আইব আ. এর কওমের ঘটনা থেকে শিক্ষা

১. হক এবং সত্যের দাওয়াতকে গ্রহন করা। নতুবা অচিরেই তার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২. নিজের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যেভাবে আমরা সচেতন থাকি, তেমনি অন্যের অধিকার আদায়ের ব্যাপারেও তার চেয়ে বেশি সতর্ক এবং সজাগ থাকতে হবে।

৩. লেনদেন এবং কায়কারবারে হালাল-হারামের শরঈ বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে, কাউকে ঠকানো বা ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে আল্লাহর শাস্তি থেকে হিফায়ত করুন। আমীন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১:২২৪-২৩২; মা‘আরিফুল কুরআন, ৩:২১৩; কাসাসুল কুরআন, হিফজুর রহমান সিওহারবী কৃত, ১:২৬৯-২৭০)

সমাপ্ত

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর

www.darsemansoor.com

www.islamijindagi.com



সূচীপত্র

ফেরাউন ও তার কওমের নাফরমানীর শাস্তি

মুসা ‘আলাইহিস সালামের পরিচয়

মুসা ‘আলাইহিস সালাম যেভাবে লালিত-পালিত হলেন

মুসা ‘আলাইহিস সালামকে মিসর ছাড়তে হলো

দীনের দাওয়াত নিয়ে ফেরাউনের দরবারে মুসা ‘আলাইহিস সালাম

মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিয়া

মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিয়া ও ফেরাউনের যাদু

যাদুকরদের পরাজয় ও ঈমান গ্রহণ

ফেরাউনের দীনবিমুখতা ও ভয়-আতঙ্ক

ফেরাউন ও তার কওমের উপর আপতিত আযাব

ফেরাউনের কওমের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব

ফেরাউনের কওম ঈমান গ্রহণে বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করলো

আযাব যেভাবে ফেরাউনের কওমকে ধ্বংস করলো

ফেরাউনের ঘটনা পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা

বালআম বাউরার শাস্তি : মুমিনদের জন্য শিক্ষা

বালআম বাউরার দু‘আ ও তার পরিণতি

যিনার কারণে যেভাবে আযাব এলো

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গ: এক

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গ: দুই

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গ: তিন

বালআম বাউরার ঘটনা থেকে শিক্ষা

بِسْمِهِ تَعَالَى

ফেরাউন ও তার কওমের নাফরমানীর শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جئتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ إِن كُنْتَ جئتَ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝ وَنَزَعْنَا يَدَ إِدْرِيسَ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ۝

অর্থঃ অতঃপর আমি তাদের পরে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে পাঠালাম নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন ও তার সভাসদদের নিকট। তখন তারা সেই নিদর্শনাবলীর সাথে কুফরী করলো। সুতরাং লক্ষ্য করো, কী পরিণতি হয়েছে অনাচারীদের। মুসা ‘আলাইহিস সালাম বললেন, হে ফেরাউন, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একজন রাসূল। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি তোমাদের নিকট প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং তুমি বনী ইসরাইলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। সে (ফেরাউন) বললো, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো, তবে তা উপস্থিত করো, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো। তখন তিনি তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা জ্যান্ত এক অজগর হয়ে গেল। তিনি তার হাত বের করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা দর্শকদের



চোখে ধবধবে উজ্জ্বল শুভ্রে পরিণত হলো। (সূরা আরাফ, আয়াত: ১০৩-১০৮)

আয়াতে “তাদের পরে” বলে হযরত নূহ, হুদ, সালেহ, লূত ও শুআইব ‘আলাইহিমুস সালামের পরে অথবা তাঁদের সম্প্রদায়ের পরে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের আগমন তাদের পরে হয়েছিল। আয়াতে যে বলা হয়েছে, “আমি মুসাকে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছি”, এখানে নিদর্শন দিয়ে আসমানী কিতাব তাওরাতও হতে পারে কিংবা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিয়াসমূহও হতে পারে।

মুসা ‘আলাইহিস সালামের পরিচয়

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের পিতার নাম ইমরান। আর মাতার নাম ইউকাবাদ। তার পিতার বংশপরম্পরা নিম্নরূপ; ইমরান বিন কামেত বিন লাবি বিন ইয়াকুব ‘আলাইহিস সালাম।

হযরত হারুন ‘আলাইহিস সালাম, মুসা ‘আলাইহিস সালামের আপন বড় ভাই ছিলেন। সে যুগে ফেরাউন হতো মিসরের সম্রাটদের উপাধি। হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের সময়ে যে ফেরাউন ছিল তার নাম ‘কাবুস’ বলে উল্লেখ করা হয়।

কোন জ্যোতিষী ফেরাউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, ইসরাইল বংশে এমন একটি ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে আপনার রাজ্যের পতন হবে। এজন্য উক্ত ফেরাউন বনী ইসরাইলের নবজাত পুত্রশিশুদের হত্যা করে ফেলতো। তবে যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে এজাতীয় কোন আশঙ্কা ছিল

না, তাই তাদের হত্যা করতো না। দ্বিতীয়ত এতে তার নিজস্ব একটি মতলবও ছিল যে, সেই মেয়েদের দিয়ে পরিচারিকার কাজ করানো যাবে। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

অর্থঃ (স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা) যখন আমি তোমাদের মুক্তিদান করেছিলাম ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে, যারা তোমাদের কঠিন শাস্তি দিতো। তারা তোমাদের পুত্রসন্তানদের জবাই করতো এবং তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখতো। বস্তুত এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা ছিল। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৯)

উপরোক্তভাবে ছেলেসন্তানদের নিধন করার কারণে একসময় দেশে পুরুষ লোকের সংখ্যা আশংকাজনক হারে হ্রাস পেল। তখন ফেরাউন নিয়ম করলো, এক বছরে জন্ম নেওয়া ছেলেদের জীবিত রাখলো এবং পরবর্তী বছরে জন্ম নেওয়া ছেলেদের হত্যা করলো।

এতে করে যে বছর ছেলেদের জীবিত রাখা হতো, সে বছরই হযরত মুসা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জন্মদানের ক্ষমতা আল্লাহ তা‘আলার ছিল, কিন্তু নির্বোধ ফেরাউনের উৎপীড়নমূলক পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা এবং তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় ছেলেসন্তান হত্যার বছরেই আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে তার মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট করালেন।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে ফেরাউনের পুত্রসন্তান হত্যাকারীদের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য মাকে ইলহামের মাধ্যমে এই নির্দেশ দিলেন যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশংকা করো না। আমি তাকে নিজ হেফাজতে রাখবো এবং পুনরায় তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিব। আর তাকে নবী বানাবো।

এব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,
 اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّكَ مَا يُوحٰى ۝ اَنْ اَقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَاُلْقِهٖ اِلَيْمُ
 بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِىْ وَعَدُوْلَهُۥ

অর্থঃ স্মরণ করুন, যখন আমি আপনার মাতাকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলাম, যা জানিয়ে দেওয়ার ছিল, তুমি শিশু মুসাকে সিন্দুকে রাখো, অতঃপর তাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। পরে দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দিবে। এতে তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নিবে। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৩৮-৩৯)

উল্লিখিত আয়াতে اَوْحَيْنَا শব্দটির মূলধাতু হচ্ছে وَحَى (ওহী)। এখানে এ শব্দটি তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এর দিয়ে উদ্দেশ্য এমন গোপন কথা বলা, যা শুধু যাকে বলা হয় সে-ই জানে, অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারো বিশেষ গুণ নয়। নবী-রাসূল, সাধারণ মানুষ, অন্যান্য সৃষ্টিজীব, এমনকি জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত এতে शामिल হতে পারে। যেমন, কুরআনে কারীমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ...

অর্থঃ আপনার পালককর্তা মৌমাছিকে আদেশ দিলেন. . . ।
(সূরা নাহল, আয়াত: ৬৮)

উক্ত আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে পথ চলার নির্দেশনা প্রদানের কথা এই শাব্দিক অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। কাজেই উল্লিখিত আয়াতের ভিত্তিতে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের জননীর নবী অথবা রাসূল হওয়া সাব্যস্ত হয় না। যেমন, হযরত মারিয়াম ‘আলাইহিস সালামের কাছেও আল্লাহর বাণী পৌঁছেছিল, অথচ তিনি নবী কিংবা রাসূল ছিলেন না।

মুসা ‘আলাইহিস সালাম যেভাবে লালিত-পালিত হলেন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মা খোদায়ী ফরমান অনুযায়ী নবজাতক মুসাকে একটি সিন্দুকে ভরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন এবং সাথে সাথে তার কন্যা তথা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বড় বোনকে সিন্দুকের পেছনে পেছনে যেতে বললেন। আর তাকে এদিকে খুব খেয়াল রাখতে বললেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে তার হাতে সংরক্ষণ করার অঙ্গীকার কীভাবে পূরণ করেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

অর্থঃ তিনি (মুসা ‘আলাইহিস সালামের মা) মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোনকে বললেন, তার পেছনে পেছনে যাও। তখন সে দূর থেকে তাদের অজ্ঞাতসারে তাকে দেখে যেতে লাগল। (সূরা কাসাস, আয়াত: ১১)



মায়ের আদেশ মোতাবেক হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোন নদীর তীর ধরে সিন্দুকের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। সিন্দুক ভাসতে ভাসতে একসময় শাহীমহলের ঘাটে ভিড়লে ফেরাউনের পরিবারের এক মহিলা তা দেখে খাদেমের মাধ্যমে বাক্সটি উঠিয়ে রাজদরবারে নিয়ে গেল। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে সে কথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

فَالْتَقَطَهُ الْفِرْعَوْنُ لِيَكُونَ لَّهُمْ عَدُوًّا وَحَرِيبًا

অর্থঃ অতঃপর ফেরাউনের পরিবার হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে কুড়িয়ে নিলো, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। (সূরা কাসাস, আয়াত: ৮)

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোন ব্যাপারটি অবলোকন করে খুব খুশি হলেন এবং পরবর্তী সময়ে কী ঘটে তা জানার জন্য খাদেমদের সাথে রাজদরবারে প্রবেশ করলেন। ইতোমধ্যে ফেরাউনের পরিবারের লোকজন সিন্দুক খুলল। তখন দেখতে পেল, ভিতরে ফুটফুটে সুন্দর একটি শিশু আরামে শুয়ে শুয়ে আঙুল চুষছে। তখন ফেরাউনের কন্যা তাকে অন্দরমহলে নিয়ে গেল।

ফেরাউনের স্ত্রী এত সুন্দর শিশু দেখে খুশিতে বাগ বাগ হয়ে তাকে খুব আদর-যত্ন করতে লাগল। সেসময় রাজপ্রাসাদের জনৈক কর্মচারী বললো, একে তো দেখতে আমাদের চিরশত্রু ইসরাইলী বাচ্চা মনে হচ্ছে। সুতরাং একে হত্যা করে ফেলা জরুরী, যাতে সে আমাদের দুঃস্বপ্ন বাস্তবায়নকারী না হতে পারে। এ কথা শুনে ফেরাউনও তাকে হত্যা করার খেয়াল করলো।

ফেরাউনের স্ত্রী তখন স্বামীর এমন মতি-গতি বুঝতে পেরে বললো, এতো সুন্দর বাচ্চাটা হত্যা করবেন না। কি চমৎকার শিশু! সে আমার ও আপনার চক্ষু শীতলকারী হবে। অথবা আমরা তাকে নিজেদের ছেলেই বানিয়ে নিব। আশাকরি, সে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। এ সম্পর্কে সূরা কাসাসে ইরশাদ রয়েছে,

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

অর্থঃ ফেরাউনের স্ত্রী বললো, এই শিশু আমার ও আপনার নয়নমণি! তাকে হত্যা করবেন না। আশাকরি, সে আমাদের উপকারে আসবে কিংবা তাকে আমরা পুত্র বানিয়ে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে এর পরিণাম সম্পর্কে তারা বুঝতে পারেনি। (সূরা কাসাস, আয়াত: ৯)

পরিশেষে মুসা ‘আলাইহিস সালামকে না মেরে ফেরাউনের পরিবার তাকে নিজেদের ঘরেই রাখলো। আল্লাহর কুদরত কত বিস্ময়কর! বিশ্বপ্রতিপালকের কী অপূর্ব কারিশমা! নিজেদের অজ্ঞতার দরুন অজান্তে তারা আপন শত্রুর লালন-পালন ও দেখাশোনার দায়িত্বভার মাথায় নিলো।

এরপর প্রশ্ন উঠলো বাচ্চাকে দুধ পান করানোর জন্য ধাত্রী নিয়োগের ব্যাপার নিয়ে। কাকে এই দায়িত্বে নিয়োজিত করা যায়? শাহীমহলের ধাত্রীদের ডেকে আনা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মাতার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণার্থে অবুঝ শিশুর মধ্যে এমন স্বভাবের উদ্ভাবন ঘটালেন যে, সে কারো স্তনই মুখে নিচ্ছে না। শাহীমহলের ধাত্রীগণ পেরেশান হয়ে গেলেন। তারা অনেক

চেষ্টা করলেন, কিন্তু হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম তাদের কারো দুধ পান করলেন না। তখন শিশুটিকে দুধ পান করানো নিয়ে তারা সবাই চিন্তায় পড়ে গেল।

এই অবস্থা দেখে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোন তাদের বললেন, যদি অনুমতি হয়, তা হলে আমি এমন একজন ধাত্রীর সন্ধান দিতে পারি, যিনি অত্যন্ত নেককার এবং এই শিশুর খেদমতের জন্য খুবই উপযোগী হবেন। ইচ্ছা করলে আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়েও আসতে পারি। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

অর্থঃ আর আমি পূর্ব থেকেই হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের জন্য ধাত্রীদের স্তন্যপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। সুতরাং মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোন বললেন, আমি আপনাদের এমন এক পরিবারের কথা বলবো কি, যারা আপনাদের পক্ষে একে লালন-পালন করবেন এবং তারা তার হিতাকাঙ্ক্ষী হবেন? (সূরা কাসাস, আয়াত: ১২)

ফেরাউনের স্ত্রী এমন সৎকর্মপরায়ণ ধাত্রীর সন্ধান পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে উপস্থিত করার জন্য বললেন। হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোন আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাকে আনার জন্য নিজ ঘরপানে রওয়ানা হলেন।

ওদিকে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মা ছেলের চিন্তায় খুব অস্থির ও কাতর হয়ে পড়েছিলেন। খোদায়ী ইলহাম পেয়ে নিজ সন্তানকে তো দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে এসেছেন,

কিন্তু মায়ের মমতা তাকে পেরেশান করে তুলেছে। এমনকি অস্থির হয়ে একপর্যায়ে তিনি নিজ বাচ্চাকে সিন্দুকে পুরে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে অহংকারী হলেন, যাতে তার খোঁজ পেতে পারেন।

এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা‘আলা তার উপর স্বীয় করুণা ও রহমতের বারিধারা বর্ষণ করলেন এবং তার অন্তরে সবরের শক্তি সৃষ্টি করে তাকে প্রশান্তি দান করলেন। এক আয়াতে এ কথা বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন,

وَاصْبِرْ فُؤَادُ امْرِئٍ مُّوسَىٰ فَارِعًا ۚ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَّنَا عَلٰی قُلُوبِهَآ لَتَكُوْنَنَّ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অর্থঃ সকালে মুসার জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়লো। যদি আমি তার হৃদয়কে সুদৃঢ় করে না দিতাম, তবে সে মুসার ঘটনাজনিত অস্থিরতার কথা প্রকাশ করেই দিত। আমি তার অন্তর এজন্য মজবুত করে দিলাম, যেন সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত থাকে। (সূরা কাসাস, আয়াত: ১০)

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের জননী অপেক্ষমাণ থাকেন যে, স্বীয় কন্যা কী সংবাদ নিয়ে আসে। এমনি মুহূর্তে তার মেয়ে সংবাদ নিয়ে এসে বললেন, ভাইটি ফেরাউনের ঘরে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু সে কোন ধাত্রীর দুধ পান করছে না। তখন আমি বললাম, ইসরাইল গোত্রের অত্যন্ত ভদ্র ও নেককার একজন মহিলা আছেন, যিনি এই শিশুকে নিজ সন্তানের মতো লালন-পালন করতে পারবেন। ফেরাউনের স্ত্রী এ কথা শুনে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, এখনই তাকে নিয়ে এসো।

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোন আরো বললেন, এটা আমাদের উপর মহান রবের অনেক বড় ইহসান। সুতরাং আপনি এখন চলুন এবং সন্তান বুকে নিয়ে চক্ষু শীতল করুন, আর মহান রাব্বুল ‘আলামীনের শোকর আদায় করুন। তিনি তার অঙ্গীকার পূরণ করেছেন।

এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلَنَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ অবশেষে আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি চিন্তাশ্রিত না থাকেন। আর যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা কাসাস, আয়াত: ১৩)

এভাবে আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে তার জননীর কাছে ফিরিয়ে দেন। তখন তার জননী নিজ হাতে তাকে লালন-পালন করতে থাকেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোন ধাত্রীর দুধ গ্রহণ করতেন, তবে তার লালন-পালন শত্রু ফেরাউনের ঘরে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে হতো। কিন্তু তার মাতা তার বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামও কোন কাফের মহিলার দুধ পেতেন। আল্লাহ তা‘আলার কী কুদরত, তিনি তার নবীকে কাফের মহিলার দুধ থেকেও বাঁচিয়ে নিলেন এবং অপরদিকে তার মাকেও বিরহের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন। আর সেই মুক্তিও এমনভাবে দিলেন,

ফেরাউনের পরিবার তার কাছে ঋণী হয়ে রইলো এবং এত উপটোকন ও উপহার দিল যে, সেগুলোর স্তূপ হয়ে গেলো। আরো সুবিধার বিষয় হলো, নিজেরই প্রাণপ্রিয় সন্তানকে দুধ পান করানোর বিনীময়ে মুসা ‘আলাইহিস সালামের জননী ফেরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও পেতে লাগলেন এবং ফেরাউনের ঘরে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় তাকে থাকতেও হলো না। নিজ ঘরেই তাকে লালন-পালন করতে লাগলেন।

অতঃপর হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম যখন একটু বড় হলেন এবং তার স্তন্যপান ছাড়ার বয়স হলো, তখন মুসা ‘আলাইহিস সালামকে তার মা ফেরাউনের মেয়ের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে এলেন। এরপর থেকে তিনি ফেরাউনের ঘরেই বড় হতে লাগলেন।

মুসা ‘আলাইহিস সালামকে মিসর ছাড়তে হলো

অতঃপর ক্রমান্বয়ে তিনি যখন বড় হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলেন, তখন এ ব্যাপারটি জানতে পারলেন, তিনি মূলত ইসরাইল বংশীয়; ফেরাউনের বংশ বা মিসরীদের সাথে তার কোনরকম আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। সেই থেকে স্ববংশীয় ইসরাইলী লোকদের প্রতি তিনি হৃদয়ের টান অনুভব করতে লাগলেন।

এর পরে একদিনের ঘটনা। হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম শহরের লোকালয় থেকে একপ্রান্তে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি এক ইসরাইলীকে ফেরাউনী বা কিবতী বংশের কাফেরের সাথে লড়াইরত দেখে কিবতীকে ঘুষি মারলেন। ঘটনাক্রমে কিবতীটা সাথে সাথে প্রাণ হারালো।

পরে অবশ্য মুসা ‘আলাইহিস সালাম এজন্য আফসোস করলেন এবং এই কাজটাকে “শয়তানের কাজ” বলে অভিহিত করেন। সেজন্য তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তখন দয়াময় আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম এমন সময় শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল উদাসীন। তখন তিনি সেখানে দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তার গোত্রের এবং অন্যজন তার শত্রু পক্ষের। তখন যে ব্যক্তি তার গোত্রের ছিল, সে তার শত্রু পক্ষের লোকটির মোকাবেলায় তার সাহায্যপ্রার্থনা করলো। তখন মুসা শত্রু পক্ষের লোকটিকে ঘুষি মারলেন। ফলে সে মারা গেল। মুসা বললেন, এটা তো শয়তানের কাজ। নিশ্চয় শয়তান প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। তিনি বললেন, হে আমার রব, আমি নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা কাসাস, আয়াত: ১৫-১৬)

পরের দিন তিনি সেই ইসরাইলীকে আরেকজনের সাথে ঝগড়া করতে দেখলেন এবং সে তখনও মুসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করলো। তিনি তাকে তার ঝগড়াটে স্বভাবের হওয়ার কারণে তিরস্কার করলেন। অতঃপর তাদের বিচার করে শত্রু পক্ষকে প্রতিরোধ করতে যাবেন, এমন সময় সে ভুল বুঝলো যে, তিনি তাকে আঘাত করবেন। তখন সে বাঁচার জন্য গতকালের কিবতীকে মারার ঘটনা ফাঁস করে দিলো।

ফলে মুসা ‘আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলো। তখন তিনি নিরাপত্তার জন্য মিসর থেকে হিজরত করে মাদইয়ান চলে যান। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ۝ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

অর্থঃ এক ব্যক্তি শহরের দূরপ্রান্ত থেকে ছুটে এসে বললো, হে মুসা, রাজ্যের পরিষদবর্গ আপনার সম্বন্ধে পরামর্শ করছে, তারা আপনাকে হত্যা করে ফেলবে। সুতরাং আপনি এখান থেকে চলে যান। নিঃসন্দেহে আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। তখন তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় চারিদিক দেখতে দেখতে বের হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, হে আমার রব, আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করুন। (সূরা কাসাস, আয়াত: ২০-২১)

মুসা ‘আলাইহিস সালাম মাদইয়ান শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছে, সেখানে দেখতে পেলেন, দু’জন কিশোরী তাদের অক্ষমতার দরুন নিজেদের ছাগলকে পানি পান করাতে পারছে না। তারা ছিল একদম অচেনা। আর হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম একজন মুসাফির ছিলেন। কিন্তু অক্ষমদের সেবা করা ভদ্রতা ছাড়াও আল্লাহ তা‘আলার কাছে পছন্দনীয় বিষয় ছিল। তাই তিনি তাদের জন্য কষ্ট স্বীকার করে তাদের ছাগলকে পানি পান করিয়ে দিলেন।

এই কাজের সাওয়াব ও বিনিময় আল্লাহ তা‘আলার কাছে বিরাট। উপরন্তু দুনিয়াতে তার এ কাজটিই প্রবাসজীবনের অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার প্রতিকাররূপে আল্লাহ তা‘আলা সাব্যস্ত করে দিলেন। আর পরবর্তী সময়ে নিজের শান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সুযোগ তিনি এর মাধ্যমেই লাভ করেন।

তা এভাবে হলো, সেই কিশোরীদ্বয়ের পিতা ছিলেন হযরত শু‘আইব ‘আলাইহিস সালাম। তিনি কন্যাদের কাছে ঘটনা শুনে মুসা ‘আলাইহিস সালামকে বিনিময় দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠালেন এবং তার বিস্তারিত কাহিনী শুনে তাকে সন্তুনা দিলেন। পরে তার কাছে তার এক কন্যাকে বিবাহ দিয়ে তাকে জামাতা বানিয়ে নিলেন। আর তার জন্য সেখানে কাজের ব্যবস্থা করেন।

আল্লাহ তা‘আলার মর্জি যে, মুসা ‘আলাইহিস সালাম যৌবনে পদার্পণ করার পর তার মাতাকে তার বিয়ে-শাদির ব্যাপারে যে দায়িত্ব পালন করতে হতো, আল্লাহ তা‘আলা

প্রবাসজীবনে তা একজন নবীর হাতে সম্পন্ন করে দিলেন।
কুরআন মজীদে এই মর্মে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتُ إِلَيَّ مِنَ خَيْرٍ فَاقِرٌ ۝

অর্থঃ যখন তিনি (মুসা ‘আলাইহিস সালাম) মাদইয়ানের পানির কূপের কাছে পৌঁছুলেন, তখন তিনি কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন, তারা নিজ নিজ জন্তুকে পানি পান করানোর কাজে রত। আর তাদের পেছনে দু’জন কিশোরীকে দেখলেন, তারা তাদের জন্তুদের আগলে রেখেছে। তিনি বললেন, তোমাদের কী ব্যাপার? তারা বললো, আমরা আমাদের জন্তুদের পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালেরা তাদের পশুগুলো নিয়ে সরে না যায়। আর আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (তাই তিনি আসতে পারেন না।) তখন মুসা ‘আলাইহিস সালাম তাদের জন্তুদের পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করেছেন, আমি তার প্রতি মুখাপেক্ষী। (সূরা কাসাস, আয়াত: ২৩-২৪)

তখন থেকে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম আট বছর মতান্তর দশ বছর হযরত শু‘আইব ‘আলাইহিস সালামের কাছে মাদইয়ান শহরে অবস্থান করেন। অতঃপর নিজ দেশে যাওয়ার মনস্থ করে সেখান থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। তখন পথিমধ্যে রিসালাত ও নবুওয়্যাতের মহান দায়িত্ব লাভ করলেন।

দীনের দাওয়াত নিয়ে ফেরাউনের দরবারে মুসা ‘আলাইহিস সালাম

নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার বড় ভাই হযরত হারুন ‘আলাইহিস সালাম, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের পক্ষ থেকে মিসর সম্রাট ফেরাউনকে ঈমান ও দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হন।

এই মর্মে আল্লাহ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাদের দাওয়াতের মূলনীতি শিখিয়ে দিলেন,

اِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۝

অর্থঃ আপনারা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যান। সে খুব অহংকারী হয়ে গিয়েছে। অতঃপর আপনারা তাকে নম্র কথা বলুন। হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৪৪)

এখানে বলা হয়েছে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও গলদ চিন্তাধারার অধিকারী হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথপ্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙ্ক্ষীর ভঙ্গিতে নম্রভাবে বিনয়ের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলে সে কিছু চিন্তাভাবনা করতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহ তা‘আলার ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম হারুন ‘আলাইহিস সালামকে নিয়ে আল্লাহ তা‘আলার আদেশ মোতাবেক ফেরাউনের কাছে গেলেন এবং তাকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন আর বনী ইসরাইল সম্প্রদায়কে হিদায়াত করে দীনের পথে আনার উদ্দেশ্যে তাদের অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি

দিয়ে তার সাথে ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا
الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ إِسْرَءِيلَ ۝

অর্থঃ হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম বললেন, হে ফেরাউন, আমি বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত রাসূল। আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি আপনার নিকট প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। সুতরাং আপনি বনী ইসরাইলদের আমার সাথে পাঠিয়ে দিন। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১০৪-১০৫)

ফেরাউন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াতের জবাবে বললো,

قَالَ فَسَنَرَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ

অর্থঃ সে বললো, তা হলে কে তোমাদের রব হে মুসা? এর উত্তরে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম বললেন,

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ

অর্থঃ তিনি বললেন, আমাদের রব সেই মহান সত্তা, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্ত গঠন দান করেছেন। অতঃপর তাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৪৯-৫০)

এই আয়াত দিয়ে বুঝা যায়, মুসা ‘আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা‘আলার ঐ মহান গুণের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্টজগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ

এই গুণের কাজটি নিজে অথবা অন্য কোনো মানব করেছে বলে দাবি করতে পারে না।

ফলে ফেরাউন এই কথার কোন জবাব দিতে পারলো না। সে লা- জবাব হয়ে আবোল- তাবোল প্রশ্ন তুলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল এবং শেষে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে এমন একটি প্রশ্ন করলো, যার সত্যিকার জবাব সাধারণ মানুষ শুনতে পেলো, মুসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে এবং তাদের শ্রদ্ধা ভক্তিও তাঁর প্রতি নষ্ট হয়ে যাবে। প্রশ্নটি হলো,

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى

অর্থঃ সে (ফেরাউন) বললো, তা হলে পূর্ববর্তী কালের লোকদের অবস্থা কি? (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৫১)

অর্থাৎ অতীত যুগে যেসব ব্যক্তি ও জাতি প্রতিমাপূজা করতো, তোমার মতে তারা কিরূপ? তাদের শেষ পরিণাম কী হয়েছে?

ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল, এর উত্তরে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম অবশ্যই বলবেন, তারা সবাই গোমরাহ ও জাহান্নামী। তখন ফেরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে, তুমি তো গোটা বিশ্বকেই বেওকুফ, গোমরাহ ও জাহান্নামী মনে করো। এ কথা শুনে জনসাধারণের, মুসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নষ্ট হয়ে যাবে এবং কুধারণা পোষণ করবে। ফলে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু মুসা ‘আলাইহিস সালাম বিচক্ষণতার সাথে এই প্রশ্নের এমন সুন্দর জবাব দিলেন, যার ফলে ফেরাউনের

পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেল। নিচের এই আয়াতে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের সেই জবাবের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى

অর্থঃ মুসা ‘আলাইহিস সালাম বললেন, তাদের খবর আমার পালনকর্তার কাছে আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার রব বিভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃত হন না। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৫২)

মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা

ফেরাউন উল্লিখিত পন্থায় তার উদ্দেশ্য সাধন করতে ব্যর্থ হয়ে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে প্রমাণ পেশ করার দাবি জানিয়ে বললো,

قَالَ إِنْ كُنْتَ جئتُ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝

অর্থঃ বাস্তবিকই যদি তুমি কোন প্রমাণ নিয়ে এসে থাকো তবে তা উপস্থাপন করো, যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকো। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১০৬)

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম তার দাবি মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন। আর অমনি তা এক বিরাট অজগর সাপে পরিণত হয়ে গেল। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝

অর্থঃ তখন তিনি তার লাঠিখানা নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা জলজ্যান্ত এক অজগর হয়ে গেল। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১০৭)

অতঃপর হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে দ্বিতীয় মুজিয়া দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজের হাতকে বগল থেকে বের করলেন। অমনি তা শুভ্র উজ্জ্বল রূপ ধারণ করলো। নিচের আয়াতে তার এই মুজিয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَنَزَعِيْدُهُ فَاِذَا هِيَ بِيْضَاءُ لِّلنَّاطِرِيْنَ ۝

অর্থঃ আর তিনি তার হাত বের করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তা দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হলো। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১০৮)

মুসা ‘আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাতের পক্ষে ফেরাউনের প্রমাণ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মুসা ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে দুটি মুজিয়া দেখান। প্রথম মুজিয়ার বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে,

فَالْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝

অর্থঃ তখন তিনি নিজের লাঠিখানা নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা জ্যাস্ত এক অজগর হয়ে গেল। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১০৭)

ثُعْبَانٌ বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। সেই সঙ্গে গুণবাচক শব্দ مُّبِيْنٌ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সেই লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোন গোপন ঘটনা ছিল না, যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটেছিল বা যা কেউ কেউ দেখেছিল আর কেউ কেউ দেখেনি। যেমনটা সাধারণত যাদু বা ভেক্সিবাজির বেলায় হয়ে থাকে। বরং সেই ঘটনা এমন প্রকাশ্য স্থানে সাধারণ মানুষের সামনে ঘটেছিল, যা সকলের চোখের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।



এটাই প্রমাণ যে, সেটা কোন চোখের ধাঁধা নয়, বরং বাস্তবভাবে সংঘটিত ঘটনা ছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, সেই অজগর ফেরাউনের প্রতি যখন হা করে মুখ বাড়ালো, তখন সে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের শরণাপন্ন হলো। আর দরবারের বহুলোক ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। (তাফসীরে কাবীর)

লার্ঠি সাপ হয়ে যাওয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়ায়, এটা যে বেশ বিস্ময়কর ব্যাপার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর মুজিয়া বা কারামতের উদ্দেশ্যও থাকে তা-ই। যে কাজ সাধারণ মানুষ করতে পারে না, তা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ বুঝতে পারে, তাদের সঙ্গে খোদায়ী শক্তি বিদ্যমান আছে।

তবে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের লার্ঠি সাপ হয়ে যাওয়া বিস্ময়কর হলেও অস্বীকার করার মতো কোন বিষয় ছিল না। কেননা, এটা প্রত্যক্ষকারীদের দিয়ে চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় দ্বিতীয় যে মুজিয়া পেশ করেন, তা হচ্ছে,

وَنَزَعِيْدُهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِيْنَ ۝

অর্থঃ আর তিনি নিজের হাত বের করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তা দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হলো। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১০৮)

عُزِّي এর মূলধাতু عُزِّي - এর অর্থ হলো একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভেতর থেকে কিছুটা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বের করা। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হলো মুসা 'আলাইহিস সালাম নিজের হাতখানা টেনে বের করলেন।

মুসা 'আলাইহিস সালাম হাতখানা কিসের ভেতর থেকে বের করলেন, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু কুরআনে কারীমের অন্যত্র বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে,

وَاضْمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِن غَيْرِ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرَىٰ

অর্থঃ আর আপনি আপনার হাত বগলে রাখুন। (এরপর তা বের করলে) তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল অবস্থায়। এটা অন্য এক নিদর্শনরূপে প্রদান করা হলো। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ২২)

বস্তুত মুসা 'আলাইহিস সালাম উক্ত হাত তার বগলের নিচে দাবিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলে এই মুজিয়া প্রকাশ পেত অর্থাৎ তখন তা দর্শকদের সামনে সূর্যের মতো ঝলমল করতে থাকতো। (তাফসীরে মাযহারী)

বলাবাহুল্য, ফেরাউনের দাবিতে হযরত মুসা 'আলাইহিস সালাম দু'টি মুজিয়া প্রদর্শন করেছিলেন। একটি হলো লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া। অপরটি হলো নিজের হাত মোবারক বগলের নিচে দাবিয়ে বের করে আনলে তা প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মুজিয়াটি ছিল বিরোধীদের

ভীতিপ্রদর্শন করার জন্য আর দ্বিতীয়টি তাদের আকৃষ্ট করে কাছে আনার উদ্দেশ্যে। এতে এই ইংগিত ছিল যে, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের শিক্ষায় একটি হিদায়াতের জ্যোতি রয়েছে। তাই তার অনুসরণ-অনুকরণই কল্যাণ ও কামিয়াবীর একমাত্র চাবিকাঠি।

মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিয়া ও ফেরাউনের যাদু
হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের এই দুটি মুজিয়া দেখার পরে ফেরাউনের সাজপাঙ্গরা যে মন্তব্য করলো, নিচের আয়াতে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ ۝

অর্থঃ ফেরাউনের কওমের সরদাররা বলতে লাগলো, নিশ্চয় এ একজন বিজ্ঞ যাদুকর। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১০৯)

তারা মুজিয়ার বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর একে যাদু বলে আখ্যায়িত করলো। কিন্তু তারাও এখানে ساحر শব্দের সাথে عليم শব্দটি যোগ করে একথা স্বীকার করলো, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিয়া সম্পর্কে তাদের মনে এই অনুভূতি জন্মেছে যে, এ কাজটি সাধারণ যাদুকরদের কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। সেজন্যই তারা বললো, তিনি বড়ই বিজ্ঞ যাদুকর। সাধারণ যাদুকররা এ ধরনের কাজ দেখাতে পারে না।

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম থেকে উল্লিখিত মুজিয়া প্রকাশ পাওয়ার পরে ফেরাউনের কওমের সরদাররা আরো বলতে লাগলো, মুসা যেহেতু একজন বিজ্ঞ যাদুকর, তাই সে তোমাদের দেশান্তর করে দেশ দখল করে নিবে। পবিত্র

কুরআনের এক আয়াতে তাদের উক্ত কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

অর্থঃ (তারা বললো,) সে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের কী মত? (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১০)

ফেরাউনের সম্প্রদায় একথা শুনে উত্তর দিলো,

أَرْجُهُ وَأَخَافُ وَاسْتَأْذِنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ

অর্থঃ আপনি তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দিন এবং শহরে-বন্দরে লোক প্রেরণ করুন যাদুকরদের সমবেত করার জন্য। তারা আপনার নিকট বিজ্ঞ যাদুকরদের সমাবেশ ঘটাবে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১১)

অর্থাৎ, সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিলো, তিনি যদি যাদুকর হয়ে থাকেন এবং যাদু দিয়েই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তার মোকাবেলা করা আমাদের জন্য কোন কঠিন ব্যাপার নয়। কারণ, আমাদের দেশে বড় বড় অভিজ্ঞ যাদুকর রয়েছেন, যারা তাকে যাদুর মাধ্যমে পরাভূত করে দিবেন। কাজেই আপনি কিছু সৈন্য-সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন, তারা গোটা শহর থেকে ভালো যাদুকরদের খুঁজে ডেকে নিয়ে আসবে।

তখন যাদু-মন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর যাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মুজিয়া এজন্যই দেওয়া হয়েছিল, যাতে তৎকালীন

যাদুকরদের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মুজিয়ার মোকাবেলায় যাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে।

আর আল্লাহ তা‘আলার নিয়মও তাই যে, প্রত্যেক যুগের নবী-রাসূলকে তিনি সে-যুগের জনগণের সাধারণ প্রবণতা অনুযায়ী মুজিয়া দান করেছেন। হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের যুগে গ্রিকবিজ্ঞান ও গ্রিকচিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে ছিল, তাই তাকে মুজিয়া দেওয়া হয়েছিল জন্মান্বকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেওয়া এবং কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করে তোলা। তেমনি মুসা ‘আলাইহিস সালামকে সেই যুগেরই অনুকূল মুজিয়া দিয়েছিলেন।

ফেরাউন তার পরিষদবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে সারাদেশ থেকে বিজ্ঞ যাদুকরদের সমবেত করলো। তারা যে সমস্ত যাদুকরকে একত্র করেছিল, তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক-বর্ণনা রয়েছে। তাদের সংখ্যা বর্ণনাভেদে নয়শ থেকে শুরু করে তিন লক্ষ পর্যন্ত বর্ণিত রয়েছে। তাদের সাথে লাঠি ও দড়ির এক বিরাট স্তূপও ছিল, যা তিনশ উটের পিঠে বোঝাই করে আনা হয়েছিল। (আল-জামি‘লিআহকামিল কুরআন)

ফেরাউনের যাদুকররা প্রথমে এসেই দরকষাকষি করতে শুরু করলো, আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং তাতে জয়ী হলে, আমরা কী পাবো? এমনটি করার কারণ হচ্ছে, যারা দুনিয়াপন্থী, পার্থিব লাভই হলো তাদের মুখ্য। কাজেই যেকোনো কাজ করার আগে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের প্রশ্ন। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে

তাদের এই দরকষাকষির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝

অর্থঃ যাদুকররা ফেরাউনের কাছে এসে উপস্থিত হলো। তারা বললো, আমাদের জন্য কোন পারিশ্রমিক আছে কি, যদি আমরা জয় লাভ করি? (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১৩)

পক্ষান্তরে নবী-রাসূল এবং যারা তাদের নায়েব তথা হক্কানী আলেম, তারা প্রতিপদক্ষেপে ঘোষণা করেন,

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

অর্থঃ আমরা যে সত্যের বাণী আপনাদের নিকট পৌঁছে দিই, আপনাদের কাছে তার কোন প্রতিদান আশা করি না। বরং আমাদের প্রতিদানের বিষয় শুধু আল্লাহ তা‘আলার উপরই ন্যস্ত রয়েছে। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৪৫)

যাদুকরদের পারিশ্রমিক দাবির জবাবে ফেরাউন তাদের বললো, তোমরা পারিশ্রমিক চাচ্ছে? আমি তোমাদের পারিশ্রমিক তো দিবই, উপরন্তু তোমাদের শাহী-দরবারের ঘনিষ্ঠদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নিবো (যা পারিশ্রমিক থেকে হাজারগুণ মূল্যবান)। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে এ কথা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝

অর্থঃ সে (ফেরাউন) বললো, হ্যাঁ, এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১৪)

ফেরাউনের সাথে এসব কথাবার্তা বলে নেওয়ার পর যাদুকররা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান ও সময় সাব্যস্ত করিয়ে নিলো। এক বিস্তৃত ময়দানে এবং এক উৎসবের দিনে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় নির্দিষ্ট হলো। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخْشِرَ النَّاسَ ضُغًى ۝

অর্থঃ হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম বললেন, তোমাদের নির্ধারিত সময় তোমাদের উৎসবের দিন এবং লোকজন যেন পূর্বাহুই সমবেত হয়। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৫৯)

কোন কোন রেওয়াযাতে বর্ণিত আছে, এ সময় যাদুকরদের সরদারের সাথে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম আলোচনা করলেন, আমি যদি তোমাদের উপর বিজয় লাভ করি, তবে তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে তো? তারা বললো, আমাদের কাছে এমন মহাযাদু রয়েছে, যার উপর কেউ জয়ী হতে পারে না। কাজেই আমাদের পরাজয়ের প্রশ্ন উঠতে পারে না। তথাপি যদি আপনি জয়ী হয়ে যান, তা হলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ফেরাউনের চোখের সামনে আমরা আপনার প্রতি ঈমান গ্রহণ করবো। (আল-জামি‘লিআহকামিল কুরআন লিল কুরতুবী)

অতঃপর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে যখন সবাই সমবেত হলো তখন যাদুকররা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছিল, এক আয়াতে সে কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقُونَ ۝



অর্থঃ তারা বললো, হে মুসা, হয় আপনি নিষ্কেপ করুন না- হয় আমরা নিষ্কেপকারী হই। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১১৫)

যাদুকরদের এই উক্তিটি ছিল নিজেদের নিশ্চিততা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন পরোয়াই নেই- প্রথমে আমরা শুরু করবো, না আপনি। কারণ, আমরা নিজেদের যাদুশাস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত। তাদের বর্ণনাভঙ্গিতে একথা বুঝা যায় যে, তারা মনে মনে প্রথম আক্রমণের প্রত্যাশী ছিল। কিন্তু নিজেদের শক্তিমত্তা ও বাহাদুরি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করে নিলো, প্রথমে আপনি আরম্ভ করবেন, না আমরা।

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিজের মুজিয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার দরুন প্রথমে তাদেরই সুযোগ দিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, قَالُوا ۖ “তিনি বললেন, তোমরাই আগে নিষ্কেপ করো।”

আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. তার বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ “তাফসীরুল কুরআনিল আযীমে” একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, যাদুকররা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি আদব প্রদর্শন ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে গিয়েই প্রথম সুযোগ নেওয়ার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তাই এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তবে



আগেই বলা হয়েছে, মুসা ‘আলাইহিস সালাম সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে তাদেরই প্রথমে নিষ্ক্ষেপ করার জন্য বললেন।

সুতরাং যাদুকররা-ই প্রথমে তাদের লাঠি ও দড়িগুলো নিষ্ক্ষেপ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সেসব দিয়ে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, এক আয়াতে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে,

فَلَمَّا الْقَوْاسُ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

অর্থঃ যখন তারা নিষ্ক্ষেপ করলো, তখন তারা লোকদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিলো এবং তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুললো। তারা প্রদর্শন করলো এক মহাযাদু। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১৬)

অর্থাৎ যাদুকররা তাদের লাঠি ও রশিগুলো মাটিতে নিষ্ক্ষেপ করার সাথে সাথে সেগুলো বড় বড় সাপ হয়ে ছোটাছুটি শুরু করলো। এভাবে তারা দর্শকদের নজরবন্দি করে দিয়ে এক মস্তবড় যাদু দেখালো। তাদের যাদু দিয়ে উপস্থিত লোকজন খুবই প্রভাবান্বিত হলো এবং বড় বড় বহুসংখ্যক সাপ দেখে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল।

এই আয়াতের দিয়ে বুঝা যায়, তাদের যাদু ছিল একপ্রকার নজরবন্দি। যাতে দর্শকদের মনে থেকে লাগলো, এই লাঠি ও দড়িগুলো সাপ হয়ে ছোটাছুটি করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আগের মতোই লাঠি ও দড়ি ছিল। বাস্তবে সেগুলো কোন সাপ হয়নি। বস্তুত এটা এক প্রকার সমোহনীশক্তি ছিলো, যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো।

এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা‘আলা তার নবী হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে যে নির্দেশ দিলেন, কুরআন মজীদে এর এক আয়াতে এভাবে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,

وَإِذْ حِينًا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝

অর্থঃ তারপর আমি ওহীর মাধ্যমে মুসা ‘আলাইহিস সালামকে বললাম, আপনার লাঠিখানা নিক্ষেপ করুন। তা নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে সে (মুসা ‘আলাইহিস সালাম এর সাপ), সবগুলোকে (যাদুকরদের সাপগুলোকে) গিলতে লাগলো, যা তারা বানিয়েছিল যাদুর বলে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১৭)

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে মুসা ‘আলাইহিস সালাম তার লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিতেই লাঠিটি সবচেয়ে বড় সাপে পরিণত হয়ে যাদুকরদের সকল সাপ গিলে খেতে শুরু করলো।

ঐতিহাসিক- বর্ণনায় রয়েছে, হাজার হাজার যাদুকরের হাজার হাজার লাঠি ও রশি যখন সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগলো, তখন সমগ্র মাঠ সাপে ভরে গেল এবং সমবেত দর্শকদের মাঝে তাতে এক অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার হলো। এমনকি হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামও কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কুরআনে কারীমে এই দিকেই ইংগিত করে বলা হয়েছে,

فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۝ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۝ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۝

অর্থঃ তাদের যাদুক্রিয়ার প্রভাবে তার মনে হলো, যেন হঠাৎ তাদের রশি ও লাঠিগুলো সাপ হয়ে ছোটোছুটি করছে।

তখন মুসা ‘আলাইহিস সালাম মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। আমি বললাম, ভয় করবেন না, নিশ্চয় আপনিই বিজয়ী হবেন। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৬৬-৬৮)

কিন্তু হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম তার এই ভয় মনের ভেতর গোপন রাখলেন। প্রকাশ হতে দেননি। এই ভয় যদি প্রাণনাশের ভয় হয়ে থাকে, তবে মানুষ হিসাবে এরূপ হওয়া নবুওয়্যাতের পরিপন্থী নয়। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায়, এটা প্রাণনাশের ভয় ছিল না; বরং তিনি আশঙ্কা করছিলেন, এরা লাঠি ও দড়ি ফেলেছে, তাতে সেগুলো সাপ হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় যখন আমি লাঠি ফেলবো, তাও সাপ হয়ে যাবে। তাতে তো সব এক রকমই হয়ে গেল। সুতরাং মানুষ নবুওয়্যাতের মুজিয়ার পার্থক্য করবে কিভাবে!

অপরদিকে তিনি ভাবলেন, আমার সাপ মাত্র একটা হবে, অথচ তাদের সাপের সংখ্যা অনেক বেশি। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ মহাসমাবেশের সামনে যদি যাদুকররা জিতে যায়, তবে নবুওয়্যাতের দাওয়াতের উদ্দেশ্য তো পূর্ণ হতে পারবে না। এর জবাবে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে,

لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى

অর্থঃ আপনি ভয় পাবেন না, আপনিই বিজয়ী হবেন।

এতে আল্লাহর নবী হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, যাদুকররা জয়ী হতে পারবে না। আপনিই তাদের উপর বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবেন। এভাবে তার উপরোক্ত আশঙ্কা দূর করে দেওয়া হয়।

যাদুকরদের পরাজয় ও ঈমান গ্রহণ

এরপর যখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম আপন রবের আদেশ মোতাবেক লাঠিখানা মাটিতে নিক্ষেপ করলেন, তা বিশাল এক অজগরের আকার ধারণ করে যাদুকরদের তৈরীকৃত কৃত্রিম সাপগুলো গিলে খেয়ে ফেললো। এই দৃশ্য দেখে যাদুকররা হতভম্ব হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল, মুসা ‘আলাইহিস সালাম যা দেখালেন, তা কোনক্রমেই যাদু নয়। বরং অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং মুসা ‘আলাইহিস সালাম যে সত্য নবী এবং তার রবের ঈমানের দাওয়াত যে সম্পূর্ণ হক ও সত্য, তা তাদের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। তাই সঙ্গে সঙ্গে তারা ঈমান গ্রহণ করলো এবং এর ঘোষণা দিলো। কুরআনুল কারীমে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَغَلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ۝ وَأَقْبَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۝

অর্থঃ ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং যাদুকররা যা করেছিলো, তা বাতিল প্রতিপন্ন হয়ে গেল। সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং খুবই অপদস্থ হলো। আর যাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল। তারা বললো, আমরা ঈমান এনেছি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি, যিনি হযরত মুসা ও হারুনের প্রতিপালক। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১২-১১৮)

ঐতিহাসিক-বর্ণনায় রয়েছে, যাদুকরদের সরদার মুসলমান হয়ে গেলে, তার দেখাদেখি ফেরাউনের গোত্রের ছয় লক্ষ লোক হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান আনলো

এবং তার ঘোষণা করলো। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিতর্কের আগে তো শুধু হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমা স সালাম ফেরাউনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এর পরে লক্ষ লক্ষ লোকের মুসলমান হয়ে যাওয়ার দরুন একটা বিরাট শক্তি ফেরাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো।

সেসময় ফেরাউনের ব্যাকুল ও আতংকিত হয়ে পড়াটা একেবারে নিরর্থক ছিল না। কিন্তু সে তা গোপন করে একজন ধূর্ত ও বিজ্ঞ রাজনীতিকের ভঙ্গিতে প্রথমে যাদুকরদের উপর বিদ্রোহমূলক অপবাদ আরোপ করে বললো,

اٰمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَدْنٰ لَكُمْ

অর্থঃ তোমরা যে আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই ঈমান নিয়ে এলে? (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১২৩)

তৎসঙ্গে ফেরাউন চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে যাদুকরদের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আরোপ করে বললো, “নিশ্চয় তোমরা মুসা ‘আলাইহিস সালামের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে এ কাজটি দেশ ও জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে করেছ।” পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ هٰذَا لَكُۢرٌّ مَّكْرُوۡنٌ فِىۡ السَّيۡۡۤاتِ

অর্থঃ এটা একটা চক্রান্ত, যা তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে আসার আগেই শহরের ভেতরে নিজেদের মধ্যে স্থির করে রেখেছিলে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১২৩)

উক্ত কৈফিয়তটি ছিল হুমকিস্বরূপ। অনুমতির আগে ঈমান আনার কথা বলে মূলত ফেরাউন তার লোকদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো, আমার কাম্য ছিল, মুসা ‘আলাইহিস

সালামের হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি প্রতীয়মান হয়ে যায়, তা হলে আমিও তাকে মেনে নেব এবং জনসাধারণকেও মুসলমান হওয়ার জন্য অনুমতি দান করবো। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করলে এবং আসল তাৎপর্য না বুঝেই একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মুসলমান হয়ে গেলে!

এই চাতুর্যের মাধ্যমে একদিকে লোকদের সামনে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিয়া এবং যাদুকরদের ঈমান গ্রহণকে একটা ষড়যন্ত্র সাব্যস্ত করে তাদের বিভ্রান্ত করার ব্যবস্থা করলো। অপরদিকে ফেরাউন রাজনৈতিক এই চাল চালল যে, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের কার্যকলাপ ও যাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ শুধু ফেরাউনকে জব্দ করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, জাতি ও জনসাধারণের সাথে যার মোটেই সম্পর্ক ছিল না- একথা বলে সে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলো। এ পর্যায়ে এটাকে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সে যাদুকরদের বললো,

لُتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا

অর্থঃ তোমরা এই ষড়যন্ত্র এই জন্য করেছো যে, তোমরা মিসরের উপর জয়লাভ করে এদেশের অধিবাসীদের এখান থেকে বহিস্কার করতে চাও।

এই চাতুর্যের পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক প্রতিষ্ঠা এবং সরকারের প্রভাব ও ভীতি সঞ্চারিত করার জন্য যাদুকরদের হুমকি দিতে শুরু করলো। প্রথমে সে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বললো,

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

অর্থঃ তোমাদের যে কী পরিণতি হবে, তা তোমরা অচিরেই বুঝতে পারবে।

অতঃপর তা পরীক্ষার করে বললো,

لَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صِلْبَنُكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

অর্থঃ আমি তোমাদের সকলের হাত ও পা বিপরীতভাবে কেটে তোমাদের সকলকে শূলে চড়িয়ে মারব।

বিপরীতভাবে কর্তন করার অর্থ হলো ডান হাত ও বাম পা কর্তন করা, যেন উভয় পার্শ্বে জখমী হয়ে বেকার হয়ে পড়ে।

ফেরাউন এই দুরবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য এবং স্বীয় পরিষদবর্গ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছিল। আর তার উৎপীড়নমূলক শাস্তি আগে থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল, যা অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু ইসলাম ও ঈমান এমন এক দৌলত যে, যখন তা কারো আত্মায় বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন সে গোটা পৃথিবী ও তার যাবতীয় উপকরণের মোকাবেলা করতে তৈরি হয়ে যায়, তথাপি কোনক্রমেই ঈমান ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় না। তাই তো যেসকল যাদুকর কিছুসময় আগেও ফেরাউনকে নিজেদের খোদা বলে স্বীকার করতো এবং অন্যদেরও এই দীক্ষা দিতো, কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে ইসলামের কালেমা পড়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে এমন ঈমানী জয়বা তৈরি হয়ে গেলো, তারা ফেরাউনের যাবতীয় হুমকির উত্তরে বলে উঠলেন,

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ

অর্থঃ অর্থাৎ তুমি যদি আমাদের হত্যা করে ফেলো, তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা আমাদের রবের কাছেই তো চলে যাব, যেখানে আমরা সব রকম সুখ-শান্তি লাভ করবো। সুতরাং তুমি আমাদের ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিতে পার। কুরআন মজীদে যাদুকরদের এই বক্তব্য এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

অর্থঃ অতএব, তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জগতেই (যা করার) করবে। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৭২)

শুধু ঈমানের শক্তি এবং আল্লাহর রাহে জিহাদের সৎসাহসই যে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ই নয়, বরং প্রতীয়মান হচ্ছে, তাদের জন্য সত্য ও প্রকৃত মারেফাত জ্ঞানের দ্বারও উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই ফেরাউনের বিরুদ্ধে এহেন বিবৃতি দেওয়ার সাথে সাথে তারা আল্লাহ তা‘আলার নিকটও প্রার্থনা করলো,

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পরিপূর্ণ ধৈর্য্য দান করুন এবং মুসলমান অবস্থায় আমাদের মৃত্যু দান করুন। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১২৬)

ফেরাউনের দীনবিমুখতা ও ভয়-আতঙ্ক

মুসা ‘আলাইহিস সালামের লাঠি বিরাটকায় অজগর সাপ হয়ে যাওয়া এবং ফেরাউনের যাদুকরদের যাদুর সাপগুলো খেয়ে ফেলা, এই সত্য উপলব্ধি করে যাদুকররা ঈমান

গ্রহণের ঘোষণা দেয়। উক্ত মুজিয়ার বহিঃপ্রকাশের পর ফেরাউন হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমা স সালামের প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তাই তার সমস্ত রোষানল যাদুকরদের উপরেই সীমাবদ্ধ থাকলো। মুসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ফেরাউনের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হলো না। অথচ তিনিই ছিলেন আসল প্রতিপক্ষ। তাই তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলতে লাগলো,

اَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَّاكَ

অর্থঃ আপনি কি মুসা ও তার সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দিবেন, দেশময় ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য এবং আপনাকে ও আপনার দেব-দেবীদের বর্জন করে চলার জন্য। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১২৭)

তখন বাধ্য হয়ে ফেরাউন বললো,

سَنُقَتِّلُ اَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَاَنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

অর্থঃ আমি অতিসত্বর হত্যা করবো তাদের পুত্রসন্তানদের। আর জীবিত রাখবো তাদের মেয়েদের। বস্তুত আমরা তাদের উপর প্রতাপশালী। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১২৭)

মুফাসসিরগণ বলেন, সম্প্রদায়ের এহেন জেরার মুখেও ফেরাউন একথাই বললো, আমরা বনী ইসরাইলের ছেলেসন্তানদের হত্যা করে দিবো, কিন্তু হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমা স সালাম সম্পর্কে তখনও তার মুখ থেকে কোন কথাই বের হলো না। তার কারণ হলো, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের উল্লিখিত মুজিয়া এবং তার পরবর্তী ঘটনা ফেরাউনের মন-মস্তিষ্কে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কঠিন ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছিল।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর রহ. বলেন, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিয়া ফেরাউনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল, যখনই সে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে দেখত, তখনই অবচেতনভাবে তার প্রস্রাব বেরিয়ে যেত।

এই ঘটনার পর ঐতিহাসিক-বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম বিশ বছর যাবত মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদের আল্লাহ তা‘আলার বাণী শোনান এবং আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু বনী ইসরাইল ঈমান আনলেও ফেরাউন ও তার কওম ঈমান আনল না। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি একে একে বিভিন্ন আযাব অবতীর্ণ করেন।

ফেরাউন ও তার কওমের উপর আপতিত আযাব

আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে নয়টি মুজিয়া দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্য পথে আনা। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ...

অর্থঃ আমি মুসা ‘আলাইহিস সালামকে নয়টি প্রকাশ্য মুজিয়া প্রদান করেছিলাম। (সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত: ১০১)

آية শব্দটি মুজিয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, আসমানি কিতাবের আয়াত বা আহকামে ইলাহীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। বহু তাফসীরবিদ এই স্থলে آية - এর অর্থ মুজিয়া নিয়েছেন।

‘নয়’ সংখ্যা উল্লেখ করা হলেও মুসা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিয়ার সংখ্যা আরো বেশি ছিল, কিন্তু এখানে নয়টি মুজিয়ার বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. উক্ত নয়টি মুজিয়া এভাবে গণনা করেছেন, ১. মুসা ‘আলাইহিস সালামের লাঠি, যা যমিনে ফেললেই অজগর সাপ হয়ে যেত। ২. মুসা ‘আলাইহিস সালামের শুভ্র হাত, যা বগলের নিচ থেকে বের করতেই উজ্জ্বল হয়ে চমকাতে থাকতো। ৩. মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুখে তৌতলামি ছিল, যা অলৌকিকভাবে দূর করে দেওয়া হয়েছিল। ৪. বনী ইসরাইলকে নদী পার করানোর জন্য নদী বিভক্ত করে বারোটি রাস্তা করে দেওয়া হয়েছিল। ৫. ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের উপর পঙ্গপালের আযাব এসেছিল। ৬. তাদের প্রতি তুফানের আযাব প্রেরণ করা হয়েছিল। ৭. তাদের শরীরে উঁকুনের আযাব প্রেরণ করা হয়েছিল। ৮. ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৯. তাদের উপর রক্তের আযাব প্রেরণ করা হয়েছিল।

এই নয়টি মুজিয়ার মধ্যে প্রথম দুটি অর্থাৎ লাঠি সাপ হওয়া এবং হাত জ্যোতির্ময় হওয়া ফেরাউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। লাঠি সাপ হয়ে যাওয়ার মুজিয়ার মাধ্যমেই হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম যাদুকরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। আর ৫নং থেকে ৯নং পর্যন্ত বর্ণিত পাঁচটি মুজিয়া ফেরাউন ও তার কওমের উপর আযাব-গজব নাযিল সংক্রান্ত।



ফেরাউনের কওমের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব

অবশ্য এই পাঁচটি আযাব ছাড়াও ফেরাউন ও তার কওমের উপর আরো আযাব অবতীর্ণ হয়েছে বলে বর্ণিত আছে। যেমন, ফেরাউন ও তার কওমের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব নাযিল হওয়ার বিষয়েও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

অর্থঃ আমি পাকড়াও করেছিলাম ফেরাউনের অনুসারীদের দুর্ভিক্ষ ও ফল- ফসলের ক্ষয়- ক্ষতি দিয়ে, যেন তারা হিদায়াত গ্রহণ করে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৩০)

যখন ফেরাউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন হয়েছিল, তখন তাদের ক্ষেতের ফসল ও বাগ- বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পায়। যার দরুন তারা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ঈমান আনার অঙ্গীকার করে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভের দু‘আ করায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসা ‘আলাইহিস সালামের দু‘আয় দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে, পুনরায় তারা অহংকার প্রদর্শন করে এবং ঈমান আনতে অস্বীকার করে। উপরন্তু তারা বলতে শুরু করে, এই দুর্ভিক্ষ মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গী- সাথীদের কুলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল। আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গিয়েছে, তা হলো আমাদের সংকর্মের স্বাভাবিক ফল। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য।

তেমনিভাবে তারা যেকোনো ভালো কিছু পেলে তা নিজেদের কৃতিত্ব মনে করতে থাকে এবং মন্দ ও দুর্দশার সম্মুখীন

হলে সেটা মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের কারণে হয়েছে বলে চালিয়ে দিতে থাকে। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

فَإِذَا جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائَرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ যখন ভালো দিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে, “আমাদের জন্যই তো এটা।” আর যদি কোন অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয়, তবে তার জন্য মুসা ‘আলাইহিস সালাম এবং তার সঙ্গীদের অলক্ষুণে মনে করে। শুনে রাখো, তাদের অলক্ষুণের কথা আল্লাহ তা‘আলারই জানা আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৩১)

বহু প্রচেষ্টার পরও ফেরাউনসম্প্রদায় হিদায়াতের পথে না আসায় আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর একের পর এক নানান আযাব-গজব নাযিল করেন। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفْصَّلَاتٍ

অর্থঃ তখন আমি তাদের উপর পাঠালাম তুফান, পঙ্গপাল, উঁকুন, ব্যাঙ ও রক্ত বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৩৩)

এই আয়াতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আযাব (বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক) বলার তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি আযাবই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবস্থান করে। অতঃপর রহিত হয়ে যায়। এরপর কিছুসময় বিরতি দিয়ে পুনরায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় কিংবা তৎপরবর্তী আযাবগুলো পৃথক পৃথকভাবে আসে।

ইবনে মুনযির, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. - এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, এগুলোর প্রতিটি আযাব ফেরাউনগোষ্ঠীর উপর সাতদিন করে স্থায়ী হয়। শনিবার শুরু হয়ে দ্বিতীয় শনিবারে রহিত হয়ে যেত এবং পরবর্তী আযাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহর অবকাশ দেওয়া হত।

ইমাম বাগাবী রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রথমবার যখন ফেরাউনের কওমের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব আপতিত হয় এবং হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের দু‘আয় তা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু তারা নিজেদের নাফরমানী থেকে বিরত হয় না। তখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম প্রার্থনা করেন, হে আমার পালনকর্তা, এরা এতই অহংকারী যে, দুর্ভিক্ষের আযাবে কোনরূপ প্রভাবিত হয়নি। তারা নিজেদের কৃত ঈমান আনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। সুতরাং তাদের উপর এমন কোন আযাব চাপিয়ে দিন, যা হবে তাদের জন্য বেদনাদায়ক ও আমাদের জাতির জন্য উপদেশ গ্রহণের উপায় এবং যা পরবর্তীদের জন্য হবে সংশোধনমূলক শিক্ষা। তখন আল্লাহ তা‘আলা প্রথমে তাদের উপর তুফানের আযাব নাযিল করেন।

প্রখ্যাত মুফাসসিরগণের মতে, এখানে তুফান অর্থ পানির তুফান। অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাস। তাতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের



সমস্ত ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যায়। না থাকে কোথাও তাদের শোয়া-বসার জায়গা, না থাকে জমি চাষাবাদের কোন ব্যবস্থা।

আশ্চর্যের বিষয় ছিল, ফেরাউন গোত্রের সন্দেহ ছিল বনী ইসরাইলের ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা জলোচ্ছ্বাসে ডুবে গেছে অথচ বনী ইসরাইলের ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা সবই ছিল শুকনো, স্বাভাবিক। সেগুলোর কোথাও জলোচ্ছ্বাসের কোন পানি ছিল না। কিন্তু ফেরাউন সম্প্রদায়ের জমি ছিল অথৈ পানির নিচে।

এই জলোচ্ছ্বাসে ভীত হয়ে ফেরাউনসম্প্রদায় মুসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট আবেদন জানালো, আপনার পালনকর্তার দরবারে দু‘আ করুন, যাতে এই আযাব দূর হয়ে যায়। তা হলে আমরা ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাইলকে মুক্ত করে দিবো। তখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম দু‘আ করলেন। তার দু‘আর ফলে জলোচ্ছ্বাসের তুফান রহিত হয়ে গিয়ে তাদের শস্য-ফসলক্ষেত্র আগের চেয়েও অধিক সুজলা-সুফলা হয়ে উঠলো।

তখন সেই নাফরমানরা বলতে শুরু করলো, আদতে এই তুফান কোন আযাব ছিল না। বরং আমাদের ফায়দার জন্যই তা এসেছিল। যার ফলে আমাদের শস্যভূমির উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়ে গেছে। মুসা ‘আলাইহিস সালামের এতে কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং আমরা ঈমান আনবো না। এসব কথা বলে তারা ঈমান আনার ব্যাপারে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলো।

এমতাবস্থায় তারা মাসাধিকাল সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। মেহেরবান আল্লাহ তাদের চিন্তা-ভাবনার জন্য



অবকাশ দান করেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যের উদয় হলো না। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর পঙ্গপালের আযাব নাযিল করলেন। এই পঙ্গপাল তাদের সমস্ত শস্য-ফসল ও বাগানের ফল-ফলাদি খেয়ে নিঃশেষ করে ফেললো। কোন কোন রেওয়াযাতে এসেছে, কাঠের দরজা-জানালা, ছাদ প্রভৃতিসহ ঘরের ব্যবহার্য আসবাবপত্র পঙ্গপাল খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল।

ফেরাউনের কওম ঈমান গ্রহণে বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করলো এই আযাবের ক্ষেত্রেও হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিয়া পরিলক্ষিত হয় যে, সমস্ত পঙ্গপাল শুধু কিবতী বা ফেরাউনের সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত ও ঘর-বাড়িতে ভরে গিয়েছিল। অথচ পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও ইসরাইলীদের ঘর-বাড়ি, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে।

এবারও ফেরাউনের সম্প্রদায় চিৎকার করতে লাগলো এবং হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট পুনরায় আবেদন জানালো, এবার আপনি আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দু‘আ করে আযাব সরিয়ে দিলে আমরা পাক্ষা ওয়াদা করছি, ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাইলকে মুক্তি দিয়ে দিবো।

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম আবার আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করলেন। তাতে এ আযাব সরে গেল।

উক্ত আযাব সরে যাওয়ার পর তারা দেখলো, আমাদের কাছে এখনও যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য মজুদ রয়েছে তা আমরা আরো বছরকাল খেতে পারবো। এ কথা ভেবে আবার তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলো। তারা ঈমান আনলো না

এবং বনী ইসরাইলকে মুক্তিও দিলো না। উল্টো তারা অহংকার প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হলো।

এই অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তাদের আবার এক মাসের জন্য অবকাশ দান করলেন। কিন্তু অবকাশের সুযোগ পেয়েও তাদের বোধোদয় হলো না। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর কুম্মাল (قُمَّال)-এর আযাব অবতীর্ণ করলেন।

কুম্মাল সেই উকুনকে বলা হয়, যা মানুষের চুলে বা কাপড়ে জন্মে থাকে এবং সেসব পোকা বা কীটকেও বলা হয়, যা কোন কোন সময় খাদ্য-শস্যে পড়ে এবং যাকে সাধারণত ঘূণ ও কেরি পোকা বলা হয়। ফেরাউন সম্প্রদায়ের উপর উকুন-এর আযাবে উক্ত উভয় রকমের পোকাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের খাদ্য-শস্যেও ঘূণ ধরেছিল এবং শরীরে, মাথায় ও কাপড়েও উকুন পড়েছিল বিপুল পরিমাণে।

সেই ঘূণের ফলে খাদ্যশস্যের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, দশ সের গমে তিন সের আটাও হতো না। আর উকুন তাদের চুল; এমনকি ঙ্র পর্যন্ত খেয়ে ফেলছিল এবং তাদের অস্থির করে তুলেছিল।

ফেরাউনের সম্প্রদায় আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো এবং হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের কাছে এসে ফরিয়াদ জানালো, এবার আর আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করবো না। দয়া করে আপনি দু‘আ করুন।

তাদের কথায় হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম দু‘আ করলেন। তার দু‘আয় এই আযাবও চলে গেল। কিন্তু সেই

হতভাগারা নিজেদের জন্য ধ্বংসই টেনে আনতে চাচ্ছিল।
তাই তারা এবারও প্রতিজ্ঞা পূরণ করলো না।

তারপর আবার তাদের এক মাসের অবকাশ দেওয়া হয়।
এ সময় প্রচুর আরাম-আয়েশে তাদের দিন কাটলো। কিন্তু
তারা যখন এই অবকাশেরও কোন মূল্যায়ন করলো না,
তখন তাদের নিকট পাঠানো হলো ব্যাঙ-এর আযাব। তখন
এত অধিক পরিমাণে ব্যাঙ তাদের ঘরে জন্মালো, কোনস্থানে
বসতে গেলে, গলা পর্যন্ত উঠতো ব্যাঙের স্তূপ। শুতে গেলে
তারা ব্যাঙের স্তূপের নিচে তলিয়ে যেত। এই অবস্থায় পার্শ্ব
পরিবর্তন করাও অসম্ভব হয়ে পড়তো। তেমনিভাবে রান্নার
হাঁড়ি, চাল-ডালের মটকা বা টিন সবকিছুই ব্যাঙে ভরে
যেত।

এই আযাবে অস্থির হয়ে ফেরাউন সম্প্রদায় বিলাপ করতে
লাগলো এবং অনেক অনুনয়-বিনয় করে হযরত মুসা
‘আলাইহিস সালামকে দু‘আ করতে অনুরোধ জানিয়ে
বললো, এবার এই অবস্থা কেটে গেলে আমরা অবশ্যই
ঈমান আনবো, এর অন্যথা হবে না।

তাই দয়াপরবশ হয়ে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম দু‘আ
করলেন। তখন সেই আযাব দূর হয়ে গেল। কিন্তু যে জাতির
অন্তর নাফরমানীতে মোহরাঙ্কিত হয়ে যায়, তাদের বুদ্ধি-
বিবেচনা ও জ্ঞান-চেতনা কোন কাজই করে না। তাই তো
এত ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও
হঠকারিতায় লিপ্ত হলো এবং ঈমান গ্রহণ করলো না। উল্টো
তারা বলতে আরম্ভ করলো, এবার আমাদের বিশ্বাস আরো



দৃঢ় হয়ে গিয়েছে, মুসা একজন মহাযাদুকর, আর এসবই তার যাদুর কীর্তি-কাণ্ড।

অতঃপর আরেক মাসের জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাদের অবকাশ দান করলেন। কিন্তু এই সুযোগও তারা গ্রহণ করলো না। তখন তাদের উপর আপতিত হলো রক্তের আযাব। তাদের সমস্ত পানাহারের বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কূপ কিংবা হাউজ ইত্যাদি থেকে পানি তুলে আনলে, তা রক্তে পরিণত হয়ে যেত। খাবার রান্না করার জন্য দ্রব্যাদি তৈরি করে নিলে, তাও রক্ত হয়ে যেত।

কিন্তু এ সমস্ত আযাবের ক্ষেত্রেই হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিয়া বারবার প্রকাশ পেতে থাকে যে, যে কোনো আযাব হতে ইসরাইলীরা থাকে মুক্ত ও নিরাপদ। রক্তের আযাবের সময় কিবতী তথা ফেরাউন গোত্রের লোকেরা বনী ইসরাইলের কারো বাড়ি থেকে পানি চাইতো, কিন্তু তা তাদের হাতে যাওয়া মাত্র রক্তে পরিণত হয়ে যেত। একই দস্তুরখানে বসে কিবতী ও বনী ইসরাইল খাবার খেতে গেলে, যে লোকমাটি বনী ইসরাইলীরা তুলতো, তা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতো, কিন্তু যে লোকমা বা পানির ঢোক কোন কিবতী মুখে তুলতো, তা সঙ্গে সঙ্গে রক্ত হয়ে যেত।

এ আযাবও পূর্ব রীতি অনুযায়ী এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হলো এবং এ সময় সেই দুরাচার জাতি বিলাপ করতে লাগলো। অতঃপর তারা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো এবং অধিকতর দৃঢ়ভাবে

ওয়াদা করলো, এই আযাব দূর হয়ে গেলে তারা ঈমান আনবে।

তাই হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম দু‘আ করলেন। তখন এই আযাব সরে গেল। কিন্তু এরা আগের মতোই গোমরাহিতে অটল থাকলো। ঈমান আনলো না। এ বিষয়ে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝

অর্থঃ তারা আত্মগরিমা প্রদর্শন করতে থাকলো। বস্তুত এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত জাতি। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৩৩)

অতঃপর সপ্তম আযাবের আলোচনার আয়াতে একে রিজয (رَجْزٍ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লেগ রোগকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বসন্ত প্রভৃতি মহামারিকেও রিজয বলা হয়। এক রেওয়াযাতে উল্লেখ রয়েছে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর এমন ভয়াবহ প্লেগের মহামারি চাপিয়ে দেওয়া হয়, এতে তাদের সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে।

তখন আবার তারা মুসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট কাকুতি-মিনতি করে দু‘আ করার জন্য নিবেদন করলো এবং জোরালোভাবে ঈমান আনার ব্যাপারে ওয়াদা করলো।

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম পুনরায় দু‘আ করলেন। যার ফলে প্লেগের আযাব তাদের উপর থেকে সরে গেল।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এবারও তারা আগের মতোই ওয়াদা ভঙ্গ করলো। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে,

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ لَئِن كُشِفَتْ عَنَّا الرِّجْزُ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِلُغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ۝

অর্থঃ যখন তাদের উপর রিজয- এর আযাব আপতিত হলো, তখন তারা বললো, হে মুসা, আমাদের জন্য আপনার পালনকর্তার নিকট সে বিষয়ে দু‘আ করুন, যা তিনি আপনার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি আপনি আমাদের উপর থেকে এ আযাব দূর করে দেন, তা হলে অবশ্যই আমরা আপনার কথা মেনে ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাইলকে আপনার সাথে যেতে দেব। অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিলাম নির্ধারিত সময় পর্যন্ত, যেটুকু পর্যন্ত তাদের পৌঁছানো উদ্দেশ্য ছিল, তখন তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে লাগলো। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৩৪-১৩৫)

আযাব যেভাবে ফেরাউনের কণ্ঠস্বর করলো

ক্রমাগত এতবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরেও যখন ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে বোধোদয়ের সৃষ্টি হয়নি, তখন তাদের উপর আবর্তিত হয় চূড়ান্ত ও সর্বশেষ আযাব এবং তাতে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। তা এভাবে আসে যে, আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে মুসা ‘আলাইহিস সালামও তার সম্প্রদায় ফেরাউন ও তার জাতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেদেশ ছেড়ে রওয়ানা হন। তখন ফেরাউন ও তার সাজপাঙ্গরা

নিজেদের ঘর-বাড়ি, জমি-জমা ও আসবাবপত্র সবকিছু রেখে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাইলের অনুসরণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

এ সম্বন্ধে তাফসিরে রুহুল মাআনীতে বর্ণিত আছে, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে রাতের সূচনাভাগে বনী ইসরাইলকে নিয়ে মিসর থেকে লোহিত সাগরের দিকে অর্থাৎ মিসরের পূর্বস্থ এলাকা শামদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

বনী ইসরাইলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কুরআনে কারিম ও হাদীস থেকে এতটুকু তথ্য প্রমাণিত যে, তাদের বারটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল।

বস্তুত হযরত ইউসুফ ‘আলাইহিস সালামের আমলে বনী ইসরাইল যখন মিসরে আগমন করে, তখন তারা বারো ভাই ছিল। সেই বারো ভাইয়ের বারো গোত্রের এতো বিপুলসংখ্যক লোক মিসর থেকে বের হলো, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়।

ফেরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ সম্বন্ধে অবগত হয়ে নিজ সৈন্যবাহিনীকে একত্র করলো এবং মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়কে পাকড়াও করার জন্য ধাওয়া করলো। ফেরাউনের সাথে সত্তর হাজার কৃষ্ণবর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল।



পিছন দিকে ফেরাউন ও তার সেনাবহর এবং সামনে লোহিতসাগর দেখে বনী ইসরাইল ঘাবড়ে গেল। তাই তারা মুসা ‘আলাইহিস সালামকে বললো,

إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

“আমরা ধরা পড়ে গেলাম”। (সূরা শুআরা, আয়াত: ৬১)

তখন মুসা ‘আলাইহিস সালাম তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

إِن مَّعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

“আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন”। (সূরা শুআরা, আয়াত: ৬২)

এরপর মুসা ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাতে বারোটি রাস্তা নির্মিত হয়ে গেল এবং সাগরের পানি প্রাচীরের মতো দণ্ডায়মান হয়ে থাকলো। তখন বনী ইসরাইলের বারোটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। কুরআনুল কারীমে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۖ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ۖ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ

অর্থঃ অতঃপর আমি মুসা ‘আলাইহিস সালামকে আদেশ করলাম, আপনি নিজের লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করুন। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ্য হয়ে গেল। আর সেখানে অপর দলকে (ফেরাউনের বাহিনী) পৌঁছে দিলাম। আর আমি হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। (সূরা শুআরা, আয়াত: ৬৩-৬৫)



ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সমুদ্রের কাছে পৌঁছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কীভাবে তৈরি হলো? কিন্তু এর পরেও ফেরাউন তার সৈনিকদের সগর্বে বললো, এগুলো আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের স্রোত বন্ধ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এ কথা বলে সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিলো এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে তার পেছনে পেছনে আসার জন্য আদেশ দিলো।

যখন ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সমুদ্রপথের মাঝখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে বাকি রইলো না। অপরদিকে বনী ইসরাইল সমুদ্রের অপর তীরে পৌঁছে গেল। তখন আল্লাহ তা‘আলা সমুদ্রকে রাস্তা বিলীন করে আগের মতো প্রবাহিত হওয়ার হুকুম দিলেন। সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলে গেল। ফলে ফেরাউন ও তার দলবল লোহিতসাগরের মধ্যে পড়ে অথৈ পানি ও স্রোতের গ্রাসে পরিণত হলো। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَاَعْرِضْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا

অর্থঃ তখন আমি তাদের সাগরের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহ এবং এ সম্পর্কে তারা উদাসীন ছিল। আর আমি উত্তরাধিকারী করে দিলাম সেই কওমকে, যাদের দুর্বল মনে করা হতো সেই যমিনের পূর্ব ও পশ্চিমের অংশসমূহের,

যাতে আমি বরকত স্থাপন করেছিলাম। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৩৬-১৩৭)

অতঃপর ফেরাউন যখন সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে আরম্ভ করলো, তখন সে বলে উঠলো, আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, যার উপর বনী ইসরাইল ঈমান এনেছে। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُمُ الْغَرَقُ قَالُوا آمَنَّا إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَّا بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থঃ এমনকি যখন সে (ফেরাউন) নিমজ্জিত থেকে লাগলো, তখন বললো, আমি ঈমান আনলাম, কোন ইলাহ নেই তিনি ছাড়া, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী ইসরাইল। আমি তারই অনুগতদের দলে। (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯০)

তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের ঈমান আনার ঘোষণার উত্তরে বলেন,

أَلَمْ يَكُنْ وَمَقْدُ عَصِيَّتِكَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

অর্থঃ এতক্ষণে ঈমান এনেছ? অথচ এ যাবত নাফরমানী করে চলেছো এবং ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত থেকেছ! (কিন্তু এখন যে ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।) (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯১)

এতে প্রমাণিত হয়, ঠিক মৃত্যুকালে যখন প্রাণ হলোকুমে চলে আসে, সেসময় ঈমান আনা শরী'আত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টির আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সেই

হাদীসের দিয়েও প্রতীয়মান হয়, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বান্দার
তাওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যুর
উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। (তিরমিযী)

ফেরাউনের ঘটনা পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা

মোটকথা, সমুদ্রের গ্রাসের চূড়ান্ত আযাব-গযব দিয়ে
ফেরাউন ও তার দলবল সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। প্রচণ্ড
দাপট, আত্মক্ষমতা ও মহাপ্রতাপের দাবিদার ফেরাউনের
সকল শক্তি ও ঐশ্বর্য খর্ব হয়ে গেল।

তবে ফেরাউনের জীবন খতম হলেও আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা
করলেন, ফেরাউনের মৃতদেহ সংরক্ষিত রেখে দুনিয়াবাসীর
জন্য শিক্ষাগ্রহণের বিষয় বানাতে। এ সম্পর্কে আল্লাহ
তা‘আলা ইরশাদ করেন,

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِدَنِّكَ لِتَتُوءَنَ لِمَن خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَتِنَا
لَغُفُوءُونَ

অর্থঃ অতএব, আজকের দিনে পরিত্রাণ দিচ্ছি আমি তোমার
দেহকে, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য শিক্ষার বিষয়
হতে পারো। আর নিঃসন্দেহে বহুলোক আমার
নিদর্শনসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে না। (সূরা ইউনুস, আয়াত:
৯২)

উক্ত প্রক্রিয়া এভাবে সংঘটিত হয়েছিল যে, সাগর পাড়ি
দেওয়ার পর হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম যখন বনী
ইসরাইলকে ফেরাউনের নিহত হওয়ার সংবাদ দেন, তখন
তারা ফেরাউনের ব্যাপারে এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল যে,

তা অস্বীকার করে বসলো এবং বলতে লাগলো, ফেরাউন সম্ভবত ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সঠিক ঘটনা প্রদর্শন এবং অন্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে একটি টেডুয়ের মাধ্যমে ফেরাউনের লাশটি সাগরের তীরে এনে ফেলে রাখলেন। তখন সবাই তা প্রত্যক্ষ করলো। এতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হলো এবং তার এই লাশ সকলের জন্য শিক্ষাগ্রহণের বিষয় হয়ে রইলো।

তারপর এই লাশের কী পরিণতি হয়েছিল, তা জানা যায়নি। যেখানে ফেরাউনের লাশটি পাওয়া গিয়েছিল, আজও সে স্থানটি ‘জাবালে ফেরাউন’ নামে পরিচিত।

কিছুকাল আগে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে এবং অনেক ঐতিহাসিকও লিখেছেন, ফেরাউনের লাশ অক্ষত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। সাধারণ লোকেরাও তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং আজ পর্যন্ত তা কায়রোর যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এই ফেরাউনই সেই ফেরাউন, যার সাথে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মোকাবেলা হয়েছিল, নাকি অন্যকোনো ফেরাউন। কারণ, ‘ফেরাউন’ নামটি কোন একক ব্যক্তির জন্য খাস নয়, বরং সে যুগে মিসরের সকল বাদশাকেই ‘ফেরাউন’ উপাধি দেওয়া হত।

কিন্তু এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে ডুব- যাওয়া লাশটি শিক্ষার উপকরণ হিসাবে সাগরতীরে আছড়ে ফেলেছিলেন, তেমনিভাবে সেটি আগত বিশ্ববাসীর শিক্ষার জন্য পচা- গলা থেকেও রক্ষা করে থাকবেন এবং এখনও তা বিদ্যমান থাকবে।



উল্লিখিত ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করা জরুরী এবং সবধরনের পাপাচার ও অবাধ্যতা ছেড়ে আল্লাহ তা‘আলার হুকুম ও তার রাসুলের আদর্শ যথাযথভাবে পালন করা কর্তব্য।

বালআম বাউরার শাস্তি: মুমিনদের জন্য শিক্ষা

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ
الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

অর্থঃ আপনি তাদের সেই লোকের বৃত্তান্ত শুনিতে দিন, যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলী দান করেছিলাম; কিন্তু সে তা উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে শয়তান তার পেছনে লেগে গেল। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আমি ইচ্ছা করলে সেইসব নিদর্শনের বদৌলতে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ধাবিত হয়ে গেল এবং স্বীয় রিপুর অনুগামী হলো। তাই তার অবস্থা হলো কুকুরের মতো। যদি তাকে তাড়া করো, তবু হাঁপাতে থাকে আর যদি ছেড়ে দাও, তবু হাঁপাতে থাকে। এই হলো সেইসব লোকের উদাহরণ, যারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহ। অতএব, আপনি বর্ণনা করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা-ফিকির করে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৭৫-১৭৬)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের একজন বিজ্ঞ আলেম ও অনুসরণীয় ব্যক্তির ইলম ও আমলের সুউচ্চ

স্তরে পৌঁছার পর এক পর্যায়ে নীতিচ্যুত হওয়ার কারণে গোমরাহ ও অভিশপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা এবং তার শাস্তির বিবরণ বিবৃত হয়েছে। তাতে মুমিনগণের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

এই আয়াতগুলোতে ঘটনাটি বর্ণনার শুরুতে ও শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি নিজ উম্মতকে সেই ঘটনা শুনিয়ে দিন, বনী ইসরাইলের একজন বড় আলেম ও বুয়ুর্গ আবেদ কামালাতের সুউচ্চ সীমায় পৌঁছেও আল্লাহর অসম্ভবতার একটি কাজ করার কারণে কিভাবে ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হলো। এতে তারা সতর্ক হবে।

কুরআনে কারীমে সেই লোকের নাম বা কোন পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। তাফসীরবিদ সাহাবা ও তাবয়ীগণের মাধ্যমে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন রেওয়াযাতে এসেছে। সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও অধিকাংশ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়াযেত। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই লোকটির নাম বালআম ইবনে বাউরা। সংক্ষেপে বলা বালআম বাউরা। সে সিরিয়ায় বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী কিনআনের অধিবাসী ছিল। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সে বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের লোক ছিল।

সে ‘মুসতাজাবুদ দাওয়াত’ ছিল। অর্থাৎ তার প্রত্যেকটি দু‘আ আল্লাহর দরবারে কবুল হতো। সে ইসমে আজমের মাধ্যমে দু‘আ করতো। আল্লাহ তা‘আলার আগে নাযিলকৃত কোন কোন কিতাবের ইলমও তার ছিল। তার গুণ ও

বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে, **الَّذِي آتَيْنَاهُ الْآيَاتِنَا** “যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলি দান করেছিলাম।” এখানে “আমার নিদর্শনাবলি” দিয়ে তার সেই ইলমের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

বালআম বাউরার দু‘আ ও তার পরিণতি

ফেরাউনের লোহিতসাগরে ডুবে মরা এবং মুসা ‘আলাইহিস সালামের মিসর বিজয়ের পর যখন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাইল কওমকে তৎকালীন জাব্বারিন ও নাফরমান আমালিকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেওয়া হলো, তখন তারা জিহাদের জন্য সেই সম্প্রদায়ের আবাসস্থলের উপকণ্ঠে সিরিয়ায় পৌঁছুলেন। তাতে জাব্বারিন কওমে আমালিকা দেখলো, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম সমস্ত বনী ইসরাইল সৈন্যসহ সিরিয়ায় এসে ঘাঁটি স্থাপন করেছেন।

মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার কওমের মোকাবেলায় প্রচণ্ড শক্তিদ্বারা ফেরাউন সম্প্রদায়ের লোহিতসাগরে নিমজ্জিত হয়ে মরার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল। তাই মুসা ‘আলাইহিস সালামের মোকাবেলা করতে তাদের মনে ভয় জন্মালো।

এজন্য তারা চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে ওই এলাকার সবচেয়ে বড় দু‘আ কবুলে প্রসিদ্ধ বুয়ুর্গ আলেম বালআম ইবনে বাউরার কাছে সমবেত হয়ে বললো, মুসা তার বিপুলসংখ্যক সৈন্যসহ আমাদের হত্যা ও দেশান্তর করার জন্য এসেছে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দু‘আ



করুন, যাতে তিনি তাদের আমাদের মোকাবেলা থেকে ফিরিয়ে দেন।

বালআম বললো, তোমরা এ কী বলছো! তিনি হলেন আল্লাহর নবী, তার সাথে রয়েছেন আল্লাহর ফেরেশতাগণ। আমি আল্লাহর নবী ও তার অনুসারীগণের বিরুদ্ধে কেমন করে বদদু‘আ করতে পারি? অথচ আল্লাহ তা‘আলার দরবারে তার যে মরতবা, আমি তা জানি। আমি যদি এ ধরনের জঘন্য কাজ করি, তা হলে আমার দুনিয়া- আখিরাত সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

তবু তার সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী লোকেরা পীড়াপীড়ি করতে থাকলো। বালআম ইবনে বাউরা বললো, আচ্ছা, তা হলে আমি ইসতিখারা করে দেখি, এ ব্যাপারে দু‘আ করার অনুমতি আছে কিনা? বালআমের নিয়ম ছিল, ইসতিখারা ছাড়া কোন কাজ করতো না। তাই সে নিয়মানুযায়ী বিষয়টি জানার জন্য ইসতিখারা করলো। তাতে স্বপ্নযোগে তাকে এই নির্দেশনা দেওয়া হলো, সে যেন কখনোই নবী ও মুমিনদের বিরুদ্ধে বদদু‘আ না করে।

বালআম তার সম্প্রদায়ের লোকদের স্বপ্নের কথা বললো। বদদু‘আ করতে তাকে বারণ করা হয়েছে। তাই সে কিছুতেই বদদু‘আ করতে পারবে না। তখন সেই সম্প্রদায়ের সমাজপতিরা চিন্তাভাবনা করে তার দরবারে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান উপটৌকন নিয়ে হাজির হলো। তাদের উদ্দেশ্য হলো, এই ঘুষ দিয়ে বশ করে তাকে বদদু‘আ করতে রাজি করানো। তাই যখন সে উক্ত উপটৌকন দেখে লোভ সামলাতে না পেরে সেগুলো গ্রহণ করে নিলো, তখন



সম্প্রদায়ের লোকেরা জোর আবদার জানালো, আপনাকে এ কাজটি করে দিতেই হবে। এভাবে তাদের আবদার- অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি চলতেই থাকলো।

কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী, সে নিজে এসব উৎকোচ গ্রহণ করেনি, বরং তার স্ত্রী উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের এ কাজটি করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এজন্য তাকে বুঝাতে থাকে।

তখন স্ত্রীর সন্তুষ্টি, আবেগ ও সম্পদের মোহ তাকে বিভ্রান্ত করে দিল। ফলে সে বদদু‘আ করার উদ্দেশ্যে গাধার উপর সওয়ার হয়ে জিসতান নামক পাহাড়ের দিকে রওয়ানা দিল, যার নিকটে মুসা ‘আলাইহিস সালাম সৈন্যবাহিনীসহ অবস্থান করছিলেন।

পথিমধ্যে তার গাধাটি বারবার বসে পড়তে লাগলো এবং সামনে অগ্রসর হতে অনীহা প্রকাশ করলো। বালআম তাকে অনবরত চাবুক মেরে উঠাতে লাগলো এবং একটু একটু করে অগ্রসর হতে লাগলো। এমনি করে গাধাটিকে বারবার মারতে মারতে সে পেরেশান হয়ে গিয়েছিল। তখন আল্লাহ তা‘আলা তার কুদরতে গাধার যবান খুলে দিলেন। সে বলে উঠলো, ওরে বেওকুফ বালআম, আপনার উপর আফসোস হয়! আপনি কি একবারও ভেবে দেখেছেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি তো আমাকে সামনে চালানোর জন্য চেষ্টা করছেন, অথচ ফেরেশতারা সামনে দিক থেকে আমাকে পিছন দিকে ধাক্কা দিচ্ছেন।

বালআম তার গাধাকে কুদরতীভাবে এ ধরনের কথা বলতে দেখে বুঝতে পারলো, একে নিয়ে আর সামনে অগ্রসর

হওয়া সম্ভব নয়। তাই সে গাধাটিকে ওখানেই রেখে পায়ে হেঁটে সেই পাহাড়ে পৌঁছুল।

উক্ত পাহাড়ে উঠে সে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাইলের বিরুদ্ধে বদদু‘আ করতে আরম্ভ করলো। সে মুহূর্তে আল্লাহ তা‘আলার কুদরতের অপূর্ব কারিশমা দেখা দিল যে, মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদু‘আ করতে গিয়ে বালআম বাউরা যেইসব বাক্য উচ্চারণ করতে চাইলো, সেসবই তার মুখ দিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই উচ্চারিত হয়ে গেল। তখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা চিৎকার করে বলে উঠলো, বালআম, একি সর্বনাশা কারবার! তুমি যে বনী ইসরাইলের পরিবর্তে উল্টো আমাদের বিরুদ্ধেই বদদু‘আ করছো! তখন বালআম ইবনে বাউরা বললো, “এটা আমার ইচ্ছাকৃত বিষয় নয়। আমি বনী ইসরাইলের বিরুদ্ধেই বলতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার জিহ্বা তোমাদের বিরুদ্ধে বলে ফেলছে, যা রোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।”

শেষে তাদের অন্যায় কৃতকর্মের এই পরিণতি হলো, সেই আমালিকা সম্প্রদায়ের উপর আযাবে ইলাহী নাযিল হলো। আর বালআমের পরকালীন শাস্তি তো রয়েছেই। দুনিয়াতেও তাকে এই শাস্তি দেওয়া হলো যে, তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে সিনার উপর লটকে গেল। এরপর থেকে তার কোন দু‘আই কবুল হলো না।

যিনার কারণে যেভাবে আযাব এলো

অতঃপর বালআম তাওবা ও অনুশোচনা করার পরিবর্তে ইবলীস শয়তানের দিয়ে আরো বেশি প্ররোচিত হয়ে আরো



ধ্বংসের পথে পা বাড়ালো। সে তার সম্প্রদায়কে বললো, আমার তো ইহকাল-পরকাল সবই বরবাদ হয়ে গেল। আর আমার দু‘আও আর চলছে না। এমতাবস্থায় তোমাদের খাতিরে বনী ইসরাইলের ধ্বংসের জন্য আমাকে অন্যকোনো ফন্দি আঁটতে হবে।

এই বলে সে তার সম্প্রদায়ের লোকদের কুপরামর্শ দিয়ে বললো, ‘আমি তোমাদের এমন একটি কৌশল বলে দিব, যার দিয়ে তোমরা মুসা ‘আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে অনায়াসে জয়ী থেকে পারবে। তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদের খুব আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে কোন কিছু বিক্রি করার বাহানায় বনী ইসরাইলের সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। সেই সাথে তাদের একথাও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবে যে, বনী ইসরাইলের সৈন্যরা তাদের সাথে যা-কিছুই করতে চাইবে, জাতির স্বার্থে তারা যেন তা অবোধে করতে দেয়; কোন রকম বাধা যেন না দেয়। এরা মুসাফির, লম্বাদিন যাবত ঘরছাড়া; হয়তো এরা এই অবস্থায় ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়বে। এতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তা‘আলার নিকট ব্যভিচার অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, তাদের উপর আল্লাহর গজব ও অভিসম্পাত পতিত হয়। তারা কখনও বিজয় বা সাফল্য লাভ করতে পারে না। তখন তোমরা-ই বিজয়ী হবে এবং তাদের মোকাবেলা থেকে মুক্তি পাবে।

বালআমের এই পৈশাচিক চালটি আমালিকা সম্প্রদায়ের খুব মনঃপূত হলো। সে মতেই তারা কাজ করলো। তারা তাদের সুন্দরী মেয়েদের খুব আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে বনী

ইসরাইলের সৈন্যদের মাঝে ফেরিওয়ালী হিসাবে পাঠিয়ে দিল।

ঘটনাক্রমে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বনী ইসরাইলের যামযাম ইবনে শালুম নামক এক সরদার এই চালের শিকার হয়ে গেল। হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম তাকে সহ সকলকে এই দুষ্কর্ম থেকে বারণ করলেন এবং শত্রুদের গভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করলেন। কিন্তু সে তার সতর্কবাণীর প্রতি ভ্রক্ষেপ করলো না। বরং কওমে আমালিকার পৈশাচিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হলো।

ফলে সঙ্গে সঙ্গে বনী ইসরাইলের মাঝে খোদায়ী গজবরূপে কঠিন প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়লো। ফলে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাইলী সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

তখন বনী ইসরাইল সম্প্রদায়কে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য হযরত হারুন ‘আলাইহিস সালামের দৌহিত্র ও হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের দেহরক্ষী বীর মুজাহিদ ফাহহাস উক্ত অপকর্ম সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজ অস্ত্রসহ যামযাম ইবনে শালুমের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন এবং সেই পাপাচারী যামযাম ও যার সাথে সে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তাকে হত্যা করে ফেললেন। আর বললেন, আল্লাহ তা‘আলা এই ব্যক্তির কারণে আমাদের সকলকে গজব দিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছেন।

তাদের নিহত হওয়ার পর ইসরাইলীরা ঐ দুজনের লাশ প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখলো, যাতে অন্যরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। অতঃপর তারা সবাই আল্লাহ তা‘আলার দরবারে

কায়মনোবাক্যে তাওবা-ইসতিগফার করলো। তখন সেই প্লেগ গজব দূর হলো।

অতঃপর মুসা ‘আলাইহিস সালাম কওমে আমালিকাকে পরাস্ত করে সেই এলাকাকে নাফরমানী থেকে মুক্ত করলেন।

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গঃ এক

আয়াতে বালআম ইবনে বাউরার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে প্রথমত বলা হয়েছে, **الَّذِي آتَيْنَاهُ الْيَقِينَ** “যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলি দান করেছিলাম।”

অতঃপর বলা হয়েছে, **فَانْسَلَخْ مِنْهَا** “কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গেছে।” (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৭৫)

এই **فَانْسَلَخْ** শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পশুর চামড়া ছাড়ানোর দিয়ে চামড়ার ভেতর থেকে পশুর দেহ বের হওয়া কিংবা সাপের (ছলম ছাড়ানোর ফলে) ভেতর থেকে তার দেহ বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বলা হয়। এখানে আল্লাহর নিদর্শনাবলির জ্ঞানকে একটি পোশাক বা লেবাসের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, এই লোকটি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সেই বেষ্টন থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে গিয়েছে। ফলে শয়তান তাকে কাবু করে ফেলেছে। এর দরুন সে পথ পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। আয়াতের পরবর্তী অংশে সেই কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

অর্থঃ তাই শয়তান তার পেছনে লেগেছে। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৭৫)

এখানে একথা বুঝানো হয়েছে, যে পর্যন্ত আল্লাহর নিদর্শনাবলির জ্ঞান তথা কিতাবের ইলম ও আল্লাহর সুরণ তার সাথে ছিল, সে পর্যন্ত শয়তান তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু স্ত্রীর মুহাব্বতে ও দুনিয়ার সম্পদের মোহে যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন শয়তান তাকে কাবু করে ফেললো। যদ্বারা সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গঃ দুই

কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

অর্থঃ আমি ইচ্ছা করলে, সেই নিদর্শনাবলীর বদৌলতে তাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম। কিন্তু সে পার্থিব জগতের চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে শুরু করেছে।

এই আয়াতে أَخْلَدَ শব্দটি خَلَدٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিংবা কোন স্থান আঁকড়ে ধরা। আর أَرْضُ এর প্রকৃত অর্থ ভূমি। পৃথিবীতে যা-কিছু রয়েছে, সেই যাবতীয় সম্ভার হয়তো সরাসরি ভূমি, না হয় ভূমিসংক্রান্ত বিষয়-বৈভব, যেমন, ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি, কিংবা যমিন থেকেই উৎপন্ন অন্যান্য সামগ্রী, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ জীবন-যাপনের অবলম্বন ও সুখ-শান্তি লাভ করে থাকে। সুতরাং أَرْضُ শব্দ দিয়ে এখানে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ-সম্ভারই বুঝানো হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে, আল্লাহপ্রদত্ত নিদর্শনাবলী ও তার জ্ঞান-ইলমই হলো প্রকৃত ইজ্জত-সম্মান ও সফলতার চাবিকাঠি। কিন্তু যে ব্যক্তি এসব খোদায়ী নিদর্শন ও জ্ঞানের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে এর উপর প্রাধান্য দিবে, তার জন্য এই ইলম-গুণই মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং সে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তা‘আলার কঠিন শাস্তি ও আযাবে নিপতিত হবে।

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গঃ তিন

বালআম ইবনে বাউরার পরকালীন শাস্তি যে কত ভয়াবহ হবে, তা মহান আল্লাহই জানেন। তার প্রতি তাৎক্ষণিক দুনিয়ার যে শাস্তি আরোপিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে,

إِنْ تَحِبُّ عَلَيْهِ يُلْهَثُ وَتَتْرُكُهُ يُلْهَثُ

অর্থঃ তার অবস্থা হলো কুকুরের মতো, যদি তাকে তাড়া করো, তবু হাঁপাবে, আর যদি তাকে ছেড়ে দাও, তবু হাঁপাবে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৭৬)

এই আয়াতে উল্লিখিত يُلْهَثُ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো জিহ্বা বের করে ছেড়ে দিয়ে জোরে শ্বাস নেওয়া।

একথা সর্বজনবিদিত যে, সকল প্রাণীই নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভেতরের উষ্ণ বায়ু বাইরে বের করে দেয় এবং বাইরে থেকে নতুন তাজা বায়ু নাক-মুখের মাধ্যমে ভেতরে টেনে নেয়। এই শ্বাস-নিঃশ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগের উপরই প্রতিটি প্রাণীর জীবন নির্ভরশীল। আর মহান আল্লাহ-ই প্রত্যেক

জীবের জন্য এ কাজটি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন যে, কোন ইচ্ছা বা পরিশ্রম ছাড়াই প্রতিটি প্রাণীর নাকের রক্ত দিয়ে ভেতরের হাওয়া বাইরে এবং বাইরের হাওয়া ভেতরে আসা-যাওয়া করছে। এতে না কোন শক্তিপ্রয়োগের দরকার হয় আর না ইচ্ছা করে করার প্রয়োজন পড়ে। বরং স্বাভাবিক ও স্বভাবগতভাবেই এ কাজটি ক্রমাগতভাবে সম্পন্ন হতে থাকে।

তবে জীব-জন্তুর মধ্যে কুকুর এর ব্যতিক্রম। কেবল কুকুরই এমন জীব, যাকে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য জিহ্বা বের করে জোর দিতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয়।

অন্যান্য জীব-জন্তুর বেলায় এমন অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন তাদের প্রতি কেউ চড়াও হয় কিংবা সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা আকস্মিক কোন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়। কিন্তু কুকুরের উপর এই অবস্থা সর্বক্ষণই থাকে, তার উপর চড়াও হলেও কিবা তাকে ছেড়ে দিলেও।

উল্লিখিত আয়াতে বালআম ইবনে বাউরাকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সে আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহের জ্ঞান ও পরিচয় লাভ করার পরও তার উপর নিজ প্রবৃত্তি ও দুনিয়ার লোভকে প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ অমান্য করেছিল। ফলে তাকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল যে, তার জিহ্বা কুকুরের জিহ্বার মতো বেরিয়ে গিয়ে বুকুর উপর ঝুলে পড়েছিল এবং তাতে সে অনবরত কুকুরের মতো হাঁপাতে থাকতো। তাকে কেউ তাড়া করুক বা না করুক, সর্বাবস্থায় সে শুধু কুকুরের মতো হাঁপাতেই থাকতো। সেই সাথে তার দু‘আ কবুলের মর্যাদা ও বুয়ুগীর মরতবা



উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সে চরম অধঃপতনের শিকার হয়েছিল।

বালআম বাউরার ঘটনা থেকে শিক্ষা

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ঘটনার বিবরণী থেকে আমরা এই শিক্ষা অর্জন করতে পারি।

১. কারো পক্ষেই নিজের জ্ঞান-গরিমা ও ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ, শয়তান সর্বদা মানুষের পেছনে লেগে আছে। যেকোনো সময় তাকে ধোঁকা দিয়ে পথচ্যুত করে দিতে পারে। যেমন ঘটেছে বালআম ইবনে বাউরার ক্ষেত্রে।

তাই শয়তানের ধোঁকা থেকে সর্বদা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং কোনক্রমেই শরী‘আতের নির্দেশ থেকে একচুলও সরে যাবে না। সেই সাথে আল্লাহ তা‘আলার শোকরগুয়ারি ও সিরাতে মুসতাকীমের উপর কায়েম ও দায়েম থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে দু‘আ করা এবং কেবল তারই উপর ভরসা করা একান্ত কর্তব্য।

২. এমন সব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে খুব সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকা জরুরী, যেগুলোতে দীনী ব্যাপারে কোনরূপ ক্ষতির আশংকা থাকে। বিশেষ করে স্ত্রী, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মায়া ও মোহে ফেলে কখনো যেন শরী‘আতের হুকুম থেকে কোনরূপ বিচ্যুতি না ঘটে, সে ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে। এর অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখতে হবে।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মুহাব্বত দোষের নয়; বরং শরী‘আতের গণ্ডির মধ্যে তা কাম্য, তবে তাদের কারণে যেন কখনো আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ করা না হয়। বিশেষ করে স্ত্রীর বৈধ-অবৈধ সকল দাবি রক্ষা করা। সুতরাং এ ব্যাপারে শরী‘আতের বিধি-বিধান জেনে তার প্রতি প্রাধান্য দেওয়া কর্তব্য। তা না হলে আল্লাহর নাফরমানীর কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

৩. অসৎ ও ভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের নিমন্ত্রণ বা হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করা থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যিক। নিজ সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্ট লোকদের উপটৌকন গ্রহণ করার কারণেই তো বালআম ইবনে বাউরা পথচ্যুত হয়ে পড়েছিল।

৪. অশ্লীলতা ও পাপাচার গোটা জাতির জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেই ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে হলে, দেশ ও সমাজকে যাবতীয় বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার পথ পরিহার করতে হবে এবং দেশ থেকে পাপাচার ও এর উপকরণাদি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে হবে। তা না হলে গোটা জাতির উপর আল্লাহর শাস্তি ও গজব নাযিল হবে, যেমন হয়েছিল বনী ইসরাইলের উপর। যিনা-ব্যভিচারের কারণে তাদের মধ্যে প্লেগ রোগের গজবের দ্বারা একদিনেই সত্তর হাজার লোককে আল্লাহ তা‘আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন।

তাই আমাদের দেশে অশ্লীল কর্মকান্ডের যতরকম পন্থা ও উপকরণ রয়েছে, যেমন, অশ্লীল গান-বাদ্য, অশ্লীল

মিডিয়া, পর্ন মুভি ও ম্যাগাজিন, রেডিও, টিভি চ্যানেল ও সিনেমা-থিয়েটার প্রভৃতির অশ্লীলতা ও মহিলাদের বেপর্দা চলাফেরা ও মোবাইল ফোনে ছেলেমেয়েদের ভ্রষ্টতা, প্রেমবিনিময়, নাজায়েয কথাবার্তা ও ক্যামেরা মোবাইলে নানান অশ্লীল ছবির প্রকোপ ইত্যাদি থেকে নিজেদেরও বাঁচতে হবে এবং দেশ ও সমাজকেও বাঁচাতে হবে। তা না হলে এর পরিণামে দুনিয়ায় ও আখিরাতে বিভিন্ন আযাব-গজবে পাকড়াও হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

পবিত্র কুরআনে পূর্বযুগের নসীহতমূলক সকল ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সতর্ক করছেন, যেন আমরা সেইযুগে নাফরমানদের মতো নাফরমানীতে লিপ্ত না হই। তা হলেই যাবতীয় গজব ও শাস্তি থেকে আমরা বাঁচতে পারবো এবং আমাদের সঠিক জীবনে আল্লাহ তা‘আলার বিধান পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার দিয়ে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারবো।

সমাপ্ত